ঈশ্বরীতলার রূপোকথা

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

ঈশ্বরীতলার রূপোকথা

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন—শ্রীঅজিত গুপ্ত

মুদ্রণ—ন্যাশনাল হাফটোন কোং

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

শিপ্রা গঙ্গোপাধ্যায়
তাপস গঙ্গোপাধ্যায়
স্নেহাস্পদেষু

এই লেখকের

বৃহন্নলা

অনিলের পুতুল

কুবেরের বিষয় আশয়

স্বর্গে তিন পাপী

সতী অসতী

সরমা ও নীলকান্ত

নির্বাচিত গল্প

পরস্ত্রী

ক্লাশ সেভেনের মিষ্টার ব্লেক

ফিরোজা

নির্বান্ধব

নতুন পৃথিবী

অগস্ত্যযাত্রা

অদ্য শেষ রজনী

পরবর্তী আকর্ষণ

রূপোকুঠির পরী

চন্দনেশ্বরের মাচানতলায়

আমার লেখা

কবে যে প্রথম অপমানিত হয়ে মনে মনে চুপ করে যেতে শিখেছিলাম তা এখন আর মনে নেই। তেমনি অনেক আশা করে একদম কিছু না পেতেও আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। আঠারো-উনিশ বছর বয়সেই আমার নিজের মুখ আমি নিজেই দেখতে পেতাম। কোন আয়না লাগত না। কারণ সে মুখ আমি জানি তখন।

সে সময়ে জেদ নামে একটি মদে আমার ভীষণ নেশা ছিল। জানতাম, লিখতে জানি না। বানান জানি না। ইতিহাস, ভূগোল জানি না। তবু নতুন নতুন অপমান এবং নতুন নতুন নৈরাশ্যের কারণ ঘটিয়ে একখানা কোদাল হাতে সে-অন্ধকারে ড্রেন কাটতে নেমে পড়তাম। অনেক খোঁড়াখুঁড়ির পর একটুখানি পথ পেতাম কি পেতাম না।

স্কুলে পড়ার সময় মিত্রপক্ষ, শত্রুপক্ষ দুটো কথা শিখেছিলাম। আর সৈন্য বোঝাই দশ-চাকার লরি দেখেছিলাম। দশ আনায় যুদ্ধের গ্যাস মুখোশ নীলামে বিক্রি হতো। দেশ বিভাগ এলো ক্লাস টেনে।

তারপর ট্রেনে একদিন কলকাতা। মিছিল। গুলি। ছাত্র রাজনীতি। কলেজ থেকে বিতাড়িত। কোনোটাই মনে বিশেষ দাগ কাটলো না। দাগ কাটলো ইস্পাত কারখানায় কাজ করতে গিয়ে সেখানকার শীতের রাতের শীত, মজুরি এবং মুনাফা। কারখানাটি যাঁর তাঁর নামে বাংলা ভাষায় সাহিত্যে একটি পুরস্কার আছে।

এই সময় সেনেট হলে একটি কবি সম্মেলন হয়। তাতে আমাদের বয়সী অনেকে কবিতা পড়ল। তারা ধুতি-পাঞ্জাবি বা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে। একে অন্যকে আপনি—বাবু বলে ডাকে। একসঙ্গে কথা বলতে হলে চায়ের দোকানে গিয়ে বসে। সিগারেট ধরায়। পকেট থেকে কবিতা বের করে।

এদের দেখা পাবার জন্যে মর্নিং শিফটের পর হাওড়া লাইনের সেই কারখানা থেকে কলেজ স্ট্রীটে যেতাম। ওদের সঙ্গে বসে আত্মীয়তা বোধ করতাম। যদিও এখন জানি—কোন কারণেই আত্মীয়তা বোধ করে পুলকিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তবু হতাম। যদিও কোনদিন একটি কবিতাও লিখিনি।

দেশ বিভাগের মুখে মুখে কলকাতায় এসে অনেক জিনিস দেখেছিলাম। যেমন : পুকুর, যৌথ পরিবার, পাড়াতুতো দাদা, শবযাত্রী (এখনকার মত তারা এত মদ খেত না) এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি। মানে বলতে চাই, একজনকে না দেখলে আরেকজনের ঘুম হতো না।

এই সময় একটা দুটো লেখা ছাপা হতে থাকে। তার চেয়ে বেশি অমনোনীত হতে থাকে। তারও চেয়ে বেশি হারাতে থাকে। তখন কিন্তু সেগুলো সবই নয়নের মণি। এখন জানি আজ যা মণি, কাল তা ঘুঁটে। কেননা সাহিত্যে রথী এবং মহারথী—দুটিই আসলে বিজ্ঞাপনের ভাষা মাত্র। কলকাতার একটি বিখ্যাত মিষ্টির দোকান একদা তাদের বিজ্ঞাপনে সাহিত্যিকদের 'মনীষী' করেছিল।

ট্রাম লাইনের ওপর দোতলায় ফ্ল্যাটবাড়ি। পূব পশ্চিম খোলা। বেলা দুটো-আড়াইটেয় লিখতে বসলে গরমকালে এক রকমের রাগী রোদ্দুর পিঠে এসে পড়ত। তাতে জেদ আরও বাড়ত। আরও লিখতাম। লিখে সারাদিন পরে বুঝতাম—কিছুই হয়নি। তবু লিখতাম। জেদে দুই চোয়ালের নিচে কষ জমছে টের পেতাম। কার ওপর রাগ! কার জন্যে ক্ষমা! কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

দু-একখানা বই ভীষণ ভাল লাগতে লাগল। দু-একটা গল্প। একটি দুটি ঘটনা। দুটি একটি মানুষ। একবার জ্বর থেকে উঠে আন্দাজে খাতায় কাটাকুটি করতে করতে লিখতে লাগলাম। খানিক পরে দেখি—আমি জানি না—এমন সব জিনিস লিখছি। কতকগুলো চরিত্র নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে কথাও বলছে। খেলাটা মন্দ না তো!

এরকম ভাবে শেষ করা প্রথম লেখাটি পরে ছাপা হয়েছিল। খুবই সাধারণ লেখা। কিন্তু লিখে ফেলে অবাক হয়েছিলাম। জানতে পেরেছিলাম—ও, তাহলে এইভাবে লেখে!

দেশ বিভাগের দিনেও বুঝতে পারিনি—আমাদের সাজানো বাড়ি, সুন্দর সম্পর্কগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রথম দর্শনে কলকাতাকে বড় নিষ্ঠুর লেগেছিল। ভাবতেই পারিনি—পরে এমনভাবে কলকাতার প্রেমে পড়ব। এখন জানি—যদি কোথাও কিছু হয়ে থাকি—তার মূলে কলকাতা। এত বড় শিক্ষয়িত্রী খুব কম দেখা যায়।

একজন লোক তখনই লেখে—যখন লিখতে বসে তার বিশ্বাস হয়—এমন

জিনিসটি আগে আর কেউ লেখেনি। পরে হয়ত সে-বিশ্বাস ভুলও প্রমাণিত হয়। কিন্তু লেখার সময় ওই বিশ্বাসটুকু চাই-ই চাই। নয়ত লেখা যায় না।

কিন্তু আমার তো তেমন কোন বিশ্বাস ছিল না। থাকবার কথাও নয়। কারণ সত্যিই দাবি করবার মত আমি তো তেমন কোন জিনিসই জানি না।

সেই সময় একটি জিনিস আমাকে সাহায্য করেছিল। সব দিক থেকে অপমানের ঝাপটা। সব দিক থেকে ব্যর্থতার বাতাস। বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ছাত্র-রাজনীতির জন্য আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে স্বচ্ছন্দে ফোর্থ ইয়ারের শেষে ডিসকলেজিয়েট করলেন। তখন আর কিছুই করার নেই। এর কিছু আগে আমার এক সহোদরকে পটাসিয়াম সায়ানাইডে শেষ হতে দেখলাম। নিম্নবিত্ত পরিবারে একটি গ্রাজুয়েট মানে কিছু আশা। তা হওয়া গেল না। কলকাতা তখনো কলকাতা। খালাসীর চেয়ে কিছু ওপরে—ফারনেস-হেলপার হয়ে তিরিশ টনের ওপেন হার্থ ফারনেসে ঢুকলাম। সে-কারখানায় সেদিন যিনি টেকনিকাল ম্যানেজার ছিলেন এখন তিনি দুর্গাপুর ইস্পাতের জি এম।

অনেক পরে একবার গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলাম। জিনিসটা এত বাজে তার আগে জানতাম না। গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেলাম—অথচ গায়ে একটা ঘামাচিও বেরোলো না!

কারখানায় এক রকমের হিন্দি শিখলাম। হিন্দি ছবি দেখে আরেক রকমের হিন্দি শিখেছিলাম তার আগে। এখানে আমার সহকর্মী—ফৌজদার সিং, অযোধ্যা সিং, গুণ্ডু রাও, সুব্বা রাও, মায়ারস্। ফারনেস বেড থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে বিলিতি ছবির মত। শেডের নিচে ম্যাগনেটিক ক্রেন এসে ঝুপ করে স্ক্র্যাপ দাঁতে কামড়ে তুলে নিয়ে যায়। সেই ক্রেনকে নামতে বলার সময় বলতে হয়—আড়িয়া, আড়িয়া। তুলবার সময় বলতে হয়—হাফেজ, হাফেজ।

একখানা উপন্যাসই লিখে ফেললাম। নাম দিলাম: আড়িয়া হাফেজ। ছাপানো হয়নি। এক রকম ইচ্ছে করেই হারাই। এখানে আমার কাজ ছিল বিচিত্র। ফারনেস যখন চালু তখন বেলচায় করে চুন, ডলোমাইট, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি চোখে নীল চশমা পরে গলন্ত ইস্পাতের ওপর ছুঁড়ে দিতাম। ফারনেস ডোর তুললে দেখা যেত—গলন্ত ইস্পাতের ওপর স্ল্যাগের সর। ৮।১০ হাত লম্বা চামচে করে এক চামচ গলন্ত ইস্পাত এনে সিলিকা প্লেটের ওপর ঢালতে হতো। এ-কাজ যখন পেলাম তখন আমি স্যাম্পেল পাসার। এভাবে অভিজ্ঞ হতে হতে একদিন আমি ৩০ টন গলন্ত ইস্পাত ট্যাপ করে উপযুক্ত তাপে, ক্রেন

থেকে জ্বলন্ত ল্যাডেলে ঢেলেছিলাম—সে-ইস্পাত ছাঁচে পড়ে 'ইনগট' হয়েছিল। আমারও মনের ছাঁচ পাল্টাচ্ছিল। কোথায় ছাত্র-রাজনীতি! অবশ্য তখনকার পলিটিকস্ মানে এত খুনোখুনি ছিল না। আর কোথায় ইস্পাত ঢালাই! একদিন ঢালাইঘরে গিয়ে দেখি ইলেকট্রিক ফারনেস থেকে ১২ টন ইস্পাতের একটি ল্যাডেল ক্রেনে চড়ে আসছে। কি হবে? তাকিয়ে দেখি—চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানার ইঞ্জিনের কয়েকটি বড় চাকার ছাঁচ। পর পর ঢালাই হবে।

ফারনেসের ভেতরের ইঁট পাল্টাবার জন্যে ফারনেস নেভানো হত। তখন আরেক রূপ। মাটির নিচে সিলিকার ইঁট এমন কায়দায় সাজানো যে তার ভেতর দিয়ে কয়লা পোড়া গ্যাস যত যাবে তত গরম হয়ে উঠবে। এসব পরে 'নির্বান্ধব' উপন্যাসে এসে গেছে।

এই কারখানায় ওয়াটসন নামে একজন অ্যাংলো জেনারেল ম্যানেজার ছিল। বেহারীবাবু নামে একজন পিটসাইড ফোরম্যানও ছিল। ছিল রোলিং ডিপার্টমেণ্ট। যার ফোরম্যান শর্মা পেঙ্গুইনের বই হাতে কারখানায় আসতেন।

আর এখানেই একটি সস্তার খাবারের দোকান ছিল। নামটি অদ্ভুত। মহাকাল কেবিন। মাটির মেঝে। সেখান থেকে একটি নারকেল গাছ ক্যানেস্তারা টিনের ছাদ ফুটো করে আকাশে উঠে গেছে। নারকেল গাছটির গায়ে পেরেক মেরে তাতে কাপ ঝোলানো থাকতো। দোকানদার অনিল মালখণ্ডী খদ্দেরের অর্ডার অনুযায়ী স্লেটে লিখে যেত—আলুর দম দু' আনা, চা এক আনা। তখন তাই ছিল।

ওই নামে একটি গল্প লিখে ফেললাম। মহাকাল কেবিন।

ইতিপূর্বে সেই জ্বরের ভেতর লেখা একটি গল্পের কথা বলেছি। সেই গল্পটির নাম: চর। পরে ছাপা হয়েছিল অগ্রণী কাগজে।

এই দুটি গল্পের ভেতর সময়ের ব্যবধান বছর দুই অন্তত। গল্প হিসাবে হয়ত এমন কিছুই না। কিন্তু অন্য কারণে কিছু।

'চর' গল্পটি এক জায়গায় হাতে করে পড়তে নিয়ে গিয়েছিলাম। সভাপতি তখনকার যুবক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। সেখানে পড়বার পর রোগামত বয়স্ক এক ভদ্রলোক বললেন, কাল সকালে গল্পটি আমার বাড়িতে নিয়ে যেও।

আপনার ঠিকানা?

ফোন গাইডে পাবে।

আপনার নাম? এ প্রশ্নে সবাই দেখলাম আমার দিকে তাকিয়ে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরদিন অনেক সময় নিয়ে তারাশঙ্কর সে গল্প কাটাকুটি করেছিলেন। আমার প্রথম গল্প। তারাশঙ্কর তখন সঞ্জীবন ফার্মেসিকে আরোগ্যনিকেতন করেছেন। না-ও তো সময় দিতে পারতেন তিনি সেদিন। আমার মত অর্বাচীনকে তিনি অনেক কথা বলেছিলেন সেদিন।

'মহাকাল কেবিন' গল্পটি নিয়ে দুজনের মতান্তর হল। একজন তারাশঙ্কর, অন্যজন প্রেমেন্দ্র মিত্র। মতান্তরের কথা শুনেছিলাম সুনীল ধরের মুখে। পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রও বলেছিলেন। গল্পটি হারিয়ে গিয়েছে। ছাপা হয়েছিল তরুণের স্বপ্ন কাগজে। তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র দুজনেই সম্পাদকমণ্ডলীতে। সুনীল ধর ছিলেন অফিস সম্পাদক। গল্পটি ছাপা হওয়ায় দশ টাকা পেয়েছিলাম। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ইচ্ছায় গল্পটি ছাপা হয়েছিল।

কিন্তু এই গল্পই বৃত্তি পাল্টে দিল। মানে পাল্টে দেওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ছিলাম কারখানায়। আবার কলকাতায় এসে সিকরেটলি গ্র্যাজুয়েট হতে হল। অনেক ভালমন্দ লোকের সঙ্গে আলাপ হল। অনেকগুলো টিউশনি করতে হল।

এই সময়ে আমার পরের ভাই একজন চিত্র-পরিচালকের বাড়িতে পড়াতে যেত। তার দুটি ফুটফুটে মেয়ের ছোটজনের নাম ছিল রতন। আমিও সে-বাড়িতে যেতাম। চিত্র-পরিচালক ভদ্রলোক অন্তত একখানি বিখ্যাত বাংলা ছবি করেন—যা কিনা উত্তমকে উত্তম হতে ভীষণ সাহায্য করেছিল। তখন উত্তম যশোপ্রার্থী ছিলেন। সুমধুর হাসির অধিকারী। সব সময় চা হচ্ছে চিত্র-পরিচালকের বাড়িতে। স্ক্রিপ্ট শোনা হত। চিত্র-পরিচালক হোমিওপ্যাথি করতেন। আমার মাকেও কয়েকবার ওষুধ দেন। রতনের বসন্ত হল। স্মল-বসন্ত। বাবা হয়ে রতনকে চিকিৎসা করতে যাওয়া ঠিক হয়নি তাঁর। স্মল-বসন্ত খুব খারাপ টাইপের। রতন মারা গেল। এই রতন আমার কাছে গল্প শুনতো। বানিয়ে বানিয়ে বলতাম। রতন মারা গেছে। শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে। তখনো বাড়ির চাকর অভ্যাসবশত সবাইকে চা দিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করছে—চিনি হয়েছে তো! আরেকটু দেব? খানিক পরে রতনকে আমরা ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে যাব। প্রায় ভূতে পাওয়ার মত একটি গল্প লিখলাম। তারা গুনতির দেশে।

গল্পটি সবাই ফেরত দিলেন। এক জায়গায় ফেরত দেওয়ার সময় সন্তোষ-

কুমার ঘোষ বসেছিলেন। প্রত্যাখ্যাত লেখাটি পড়লেন। ওঁর লেখার সঙ্গে পরিচয় ছিল। মানুষ হিসাবে পরিচয় হল।

ফাইনাল পরীক্ষার মত লেখার দিকে কখনোই গম্ভীর হয়ে তাকাইনি। আবার একথাও সত্যি, কিছু লিখতে পারি না বুঝে প্রতিনিয়ত হাতড়ে বেড়াবার ব্যাপারটি সর্বদাই মনে মনে টের পাই। এক সময় ডেলি প্যাসেঞ্জারির জীবন, চাকরি খোঁজার জীবন গল্পে চলে আসতে লাগল। চাকুরে মেয়ের গল্পও দু-একটা লিখে ফেললাম। সন্ধ্যার মুখে মুখে আগাছা ঢাকা প্রাঙ্গণে সাপখোপ দেখা দিলে আমরা সিওর হওয়ার জন্যে থ্যাতা করে বাঁশের বাড়ি মারি। তাতে নিষ্ঠুরতা এবং নিশ্চয়তা থাকে।

এরকম বিষয় নিয়ে গল্প লিখে ফেললাম। বৃহন্নলা উপন্যাসে সুধা নামে একটি চাকুরে মেয়ে এসে গেল। সে ওরকম আহত অবস্থায় প্রত্যাখ্যাত হল। তার যন্ত্রণা আমি নিজে টের পেলাম।

মৃত্যু, দম্ভ, শোক, অসুখ এবং ওষুধ—এরা পাশাপাশি বাস করে। তা দেখতে পেয়েছিলাম কোন নিকটজনের দীর্ঘ: হাসপাতালবাসের সময়। বড় ডাক্তার অপারেশন করতে করতে বাইরে এসে ফোন করছে। গবেষণার জন্যে মানুষ আলু-পটলের মত কাটা পড়ছে শল্যচিকিৎসকের ছুরিতে। মৃত্যুর শক্র একটি সাদা বাড়িতে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে। বই লিখে ফেললাম। লেখার সময়টাও বিচিত্র ছিল। বেলা তিনটে নাগাদ। বউবাজারে ব্যোমকেশবাবুর প্রেসে। সকালের শিফটের পর ওখানে গিয়ে লিখতাম। প্রকাশক রবি রায় মশায় তা ছোট ট্রেডলে ছেপে বের করেছিলেন। অনিলের পুতুল।

দু'একখানা দশ ফর্মা বই। গোটা কয় গল্প। কেউ ভালো বলছে। কেউ কিছু বলছে না। কেউবা মন্দ বলছেন। এই সব নিয়েই বোধ হয় সাহিত্য। তাই শেষ না ভেবে যখন মনে যা এসেছে তাই লিখেছি। এখনো লিখি।

ঘুরেফিরে যার কথা লিখতে চেয়েছি সে আমারই জানাশুনো একজন লোক। তার নাম শ্যামল গাঙ্গুলী। তার মজা তার আনন্দ। কল্পনায় তার গুলি চালানো কিংবা স্বপ্নে তার ডানা মেলে ওড়া। এই লোকটিকে কখনো শস্তার ফার্নিচারের দোকানদার হিসাবে গাঁয়ের বুনো তেঁতুল গাছ কিনতে পাঠিয়েছি। এই লোকটিই খুনের বাড়ি ভাড়া নিচ্ছে। আবার এই লোকই গাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার হিসেবে অভাবী তাড়িখোর মাতালের বউকে সংসার থেকে ভেগে চলে

আসায় পরামর্শ দিচ্ছে। একবার অনেকদিন আগে জনসেবক অফিসে বসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিল, তুই নিজের কথা লিখে যা। আমি কিছু পড়িনি, কিছু জানি না। তাই সুনীল যা বলেছিল তাই করি।

এইভাবে খানকয়েক উপন্যাস ও ডজন কয়েক গল্প লিখবার পর শ্যামল গাঙ্গুলী সত্যিকার একটা ব্যাপারে জড়িয়ে গেল। ব্যাপারটা আর ভাড়াবাড়িতে থেকে গল্প লেখা নয়।

জমি। এর সঙ্গে জড়িত দখল। এর সঙ্গে জড়িত আশ্রয়। এর সঙ্গে জড়িত অঙ্কুর। কিংবা নবজন্ম। আর জড়িত লোভ।

সামান্য একটুখানি দিয়ে শুরু হয়েছিল। তা বাড়তে থাকল। সে কি নেশা! অফিসে যাই না। জমি দেখে বেড়াই। একবার মনে আছে—কোন এক বিখ্যাত চৌধুরীদের বড় কাছারিতে গেছি। সেখানে গেট লাগানো একটি বিশাল ঘরে শুধু দলিল থাকে। বাবুরা সাদা হাফ শার্ট আর ধুতি পরেন। ওঁরা স্টেটের দারোয়ান সঙ্গে দিলেন। এক লপ্তে আশি বিঘা বিক্রি করবেন। জলে ডোবা জমি। শস্তায় দেবেন।

বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে কোমরজল ভেঙে রেল লাইনের পাশে পৌঁছলাম। কয়েক মাইল জায়গা জলে সাদা হয়ে পড়ে আছে। বাতাস উঠলে সেখানে ঢেউ খেলে। স্টেটের দারোয়ান দূরের একটি ধ্যানস্থ মাছরাঙা দেখিয়ে বলল—পূবে চৌধুরীবাবুদের জমি ওই পর্যন্ত। পশ্চিমে আর মাছরাঙা পেল না বেচারা। জল ভাঙছি তো ভাঙছিই। এক রকম নেশা।

আকাশের নিচে নির্জনে কত মাঠ পড়ে থাকে। তাদের ওপর দিয়ে হাঁটবার সময় অদ্ভুত লাগে। প্রান্তরের সাতটা তালগাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। এরাই এই প্রান্তরের রক্ষক। ধানক্ষেত খুঁড়ে লোকে কচ্ছপ বের করছে। পুকুর কাটতে গিয়ে বারো হাত নিচে নৌকোর গলুই পাওয়া গেল। একদা তাহলে এখানে নদী ছিল! জমির অনন্ত রহস্য। তার সঙ্গে কোর্ট-কাছারি। দলিল-দস্তাবেজ। উকিল-মুহুরি। লোভ। শরিকানি। অন্তহীন।

আসলে পৃথিবীটা যেমন আছে তেমন থাকে। যুগে যুগে মানুষ এসে দখল দাবি করে। কখনো অর্থবলে। কখনো লোকবলে।

এই ব্যাপারগুলো লেখায় আসতে লাগল।

জমির সঙ্গে সঙ্গে আমার অজান্তেই আমি ফসলে চলে গিয়েছিলাম। একটি ধানচারা। তাকে বড় করে তার থেকে ধান তোলা। তার স্বভাব। সেই

ধানের সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষের কোন্ অতীত থেকে নাড়ির যোগ—সবই আমাকে ভাবাতে লাগল। সেই প্রথম দেখলাম—হাল দিতে দিতে চাষী বলদের সঙ্গে আপন মনেই জীবন, সংসার, বর্ষা, বউ, চাষবাস নিয়ে কথা বলে আর তার লেজ মোচড়ায়। চাষী ও বলদ একসঙ্গে ডোবার জলে মুখের ছায়া দেখে। চাষী-বউয়ের হাতেগড়া রুটি গোহাটা থেকে ফেরার পথে চাষী খিদের চোটে নতুন কেনা বলদের সঙ্গে ভাগ করে খায়। এসব দেখে গল্প লিখলাম—'হাজরা নস্করের যাত্রাসঙ্গী' 'যুদ্ধ' ইত্যাদি। এর পাশে সোফিস্টিকেটেড ইস্পাত কারখানা, ফানুস, গড়িয়াহাটার মোড, এককালের ছাত্র রাজনীতি সবই তুচ্ছ লাগতে লাগল। পাগলা নদী দিয়ে জলপথে গিয়ে একদিন পরিত্যক্ত সুন্দরবনের দ্বীপে মেদনমল্লের দুর্গ দেখলাম দূর থেকে। ছাদ নেই। শ্যাওলামাথা দেওয়াল। বিশাল দীঘি দামে ঢাকা। বাঙালী নৌসেনাপতির নৌ-ঘাঁটি। কী করে যেন 'কুবেরের বিষয়-আশয়' উপন্যাসে এসব কথা এসে গেল। ফসলেরও একটা নেশা আছে। সে নেশা আসলে দখলের। আরও কত আমার করায়ত্ত করা যায়!

এক এক বিপদে জড়িয়ে সেই বিপদের ঢেউয়ের চূড়ায় পাক খেয়ে আরেক বিপদে গিয়ে আছড়ে পড়ছিলাম। যখন পডছিলাম তখন জানতামই না এসব আসলে বিপদ। তখন ওদের মনে হচ্ছিল স্রেফ খেলা। সেই সময়ে নদীর পাডে শনিবারের হাটবারে গোগাডিতে খডের বিছানা পেতে চলমান গণিকাকে আসতে দেখতাম। গল্প লিখলাম—'অন্নপূর্ণা।' মহম্মদ বাজিকর অবিবাহিত কুমার কেউটেকে হাতে তুলে বলত—হাঁসা কেউটে। বড ডাকাতির পর সন্তোষ টাকি হপ্তা দুয়েক ডাবওয়ালা হয়ে যেত। কলকাতার রাস্তায় নিরীহ মুখে ডাব কাটছিল—এই অবস্থায় পুলিস শেষবার সন্তোষকে ধরে।

শৈশব যার পকেটে নেই তার পক্ষে প্রতিভার নদীতে সাঁতরাতে যাওয়া অর্থহীন। আবার এই শৈশবই যদি শুধুই নস্টালজিয়া হয়ে ওঠে তবে তা সাহিত্যের পক্ষে বিড়ম্বনা। সুন্দর শৈশব পরবর্তী জীবনে শান্তির উৎস। মা যখন 'দুধারে সরিষা ক্ষেত' কবিতাটি আবৃত্তি করতেন তখন সত্যিই আমাদের ছোটবাড়ির সামনের মাঠে সর্ষের ক্ষেতে হলুদ ফুল বোঝাই হয়ে থাকত। পাড়ার দিদিদের সঙ্গে কালীপুজোর আগের দিন কোঁচড় ভরে চোদ্দ শাক সংগ্রহ করেছি। ভোররাতে তাদের সঙ্গে বকুল ফুল কুড়িয়ে বুনো লতায় মালা গেঁথেছি। বর-বউ খেলায় সঙ্গিনীরা একদিন বড় হয়ে শাড়ি ধরল। তাদের কিন্তু ভীষণ একটা

রহস্যময়ী মনে হয়নি কোনদিন। তাদের নিয়ে শরীরের রহস্য-মাখানো কোন কাহিনীও আমার কলমে আসেনি। তার কারণ তাদের চেয়ে রহস্যের জিনিস আরও ছিল। যেমন: বিশাল স্তব্ধ দীঘি, মাঠ-ছাপানো বৃষ্টি, নদীতে ডুব-সাঁতার দিয়ে উঠতে গিয়ে দেখছি ঘাটে দাঁড়ানো নৌকোগুলোর তলায় গিয়ে মাথা ঠেকে যাচ্ছে—ভেসে ওঠার জায়গা পাচ্ছি না—অথচ দম ফুরিয়ে যাচ্ছে।

মানুষকে বোধ হয় সেই সময় থেকেই চিনতে শুরু করি। ক্লাস ফোরে এক সহপাঠীর বিপত্নীক বাবার পুনর্বিবাহে আমরা সবান্ধবে সাইকেল-রিকশায় চড়ে মহানন্দে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম। বিয়ের সময়টায় আমাদের রসগোল্লা দিয়ে সরিয়ে রাখা হয়েছিল।

এক সময় ধারণা হয়েছিল, বেকার যৌবন নিয়েই বোধ হয় লিখে যাব। কেননা এ বিষয়ে অন্তত দুখানি উপন্যাস এবং অনেকগুলো গল্প লিখেছিলাম। এক সময় মনে হয়েছিল, সদ্যযৌবনের প্রেম-ভালবাসাই বুঝি আমার লেখার বিষয়। একদিন দেখলাম এসব লিখতে গিয়ে তো মেয়েটির চেহারা-স্বাস্থ্য কেমন তাও লিখতে হয়। এ জিনিস কতবার লেখা যায়! হঠাৎ দেখা হল সুজাতার সঙ্গে। তার পরনে বাসন্তী রঙের শাড়ি। মোটা বেণীটা বুকের ওপর এসে পড়েছে। তারপর? তারপর কি লিখব? রিডিকিউলাস!

আরও মুশকিলের কথা—আমার কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস নেই। কোনদিন মনে হয়নি—অমুকে ক্ষমতাচ্যুত হলে এবং সে-জায়গায় অমুক এলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি সর্বদাই জানি—রাষ্ট্র ও প্রশাসন মানে একটি অন্ধ, কবন্ধ দানব। সেজন্যে কেউ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নয়। এটা একটা ব্যবস্থা বা প্রথা। এক সময় ছিল, যখন আমেরিকা পরমাণু বোমা ফাটালেই খবরের কাগজের প্রতি-বাদপত্রে আমরা সই দিতাম। রাশিয়াও যখন ফাটালো তখন কোন কোন রাজনৈতিক-বিশ্বাসী সমসাময়িক সই দিলেন না। তারপর সময় যেতে বুঝলাম—লিখতে হলে এই সইসাবুদ সর্বৈব বাজে ব্যাপার।

বরং তার চেয়ে আরও বিরাট ব্যাপার আশেপাশেই আছে টের পেলাম। পাচ্ছিলাম। টের পাবার কারণও ছিল। ৩২-৩৩ বছর বয়সে এমন একটা গাঁয়ে গিয়ে বাসা বাঁধলাম—যেখানটায় বিদ্যাধরীর বন্দী জল প্রায় চল্লিশ বছর আটক থেকে সব রকম গতি রুদ্ধ করে রেখেছিল। জল নিকাশের পর সেখানে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হচ্ছিল।

এমন জায়গায় একদিন শীতের বিকেলে বোরো ধানের বীজতলা করা

হচ্ছিল। চাষী ফকিরচাঁদ ডুবন্ত সূর্যের দিকে মুখ করে তিন দিনের অঙ্কুরিত ধানবীজ হাতের বিশেষ প্রক্রিয়ায় পাক মাটিতে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। সেগুলিই পরে ধানচারা হয়ে দাঁড়াবে।

বললাম, এ-রকম শিখলি কোত্থেকে ফকিরদা?

ছোট্ ঠাকুদ্দার কাছ থেকে—

আমি সেই বিকেলে পরিষ্কার দেখতে পেলাম—আমাদের বীজতলার খানিক দূরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফকিরচাঁদের ছোট্ট ঠাকুদ্দা, তস্য ছোট্ ঠাকুদ্দা, তস্য ছোট্ ঠাকুদ্দা—। এরই নাম বোধ হয় সভ্যতা।

এসব জিনিস বোঝা এক জিনিস। আর ফুটিয়ে তোলা আরেক জিনিস। বিশেষ করে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করা।

তাই একটি একটি করে জিনিস ধরবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ধরা কি যায়। লিখতে গিয়ে দেখি গল্প অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। বাঘ সাঁতরে নদী পার হওয়ার সময় লাইন বেঁকে গেলে রাগে-রাগে তীরে ফিরে এসে আবার সোজা লাইনে এগোবার চেষ্টা করে। অন্য দিক থেকে ফিরে এসে আবার গল্পকে ধরতে হয়েছে। আসল গল্পকে। পথে অবশ্য ফাউ অন্য দু-একটা গল্প হয়ে গেছে।

এইভাবে লিখেছিলাম—'কন্দর্প', 'চন্দনেশ্বরের মাচানতলায়'।

অসীম রূপবান গণেশ। কিন্তু তোতলা এবং মিথ্যেবাদী। ঝোঁকের মাথায় গাইতেও পারে। বারম্বার বিবাহই একমাত্র নেশা। গাঁজা খেয়ে পঞ্চাননতলায় বৈশাখ মাস ভোর সংকীর্তন করে বাতাসা পায়।

এপ্রিল মাস। ফলন্ত বোরো ধান জলের অভাবে চুঁয়ে যাবে। পাম্পসেট খারাপ হয়ে গেছে। এক রিকশায় চড়িয়ে সারাতে নিয়ে গেলাম। সারিয়ে ফিরতে বেলা তিনটে। রিকশাওয়ালাকে এতক্ষণ আটকে রাখার জন্যে অতিরিক্ত পয়সা দিতে গেলাম। নিল না। অবাক কাণ্ড। লোকটির সঙ্গে পরিচয় হল। লোকটিকে টাকা দিয়ে কয়েকখানি রিকশা বানিয়ে দেবার প্রস্তাব দিলাম। প্রত্যাখ্যান করল। বলল, বানাতে জানি। অনেক ছিল। থাকলেই ঝামেলা। এই বেশ আছি। স্টেশন-প্লাটফর্মে থাকি। কলের জল খাই। ভগবানের কথা ভাবি। মাঝে মাঝে রিকশা চালিয়ে ভগবান দেখতে বেরোই।

ভাবতে অবাক লাগল। একটা লোক ভগবান দেখতে প্যাডেল করে রিকশা নিয়ে উত্তরে যায়, দক্ষিণে যায়। গল্প লিখলাম—চন্দনেশ্বরের মাচানতলায়।

আমার একটা দুঃখ আছে। আমি গালুডি যাইনি। যাবার সময় কেউ

ডাকেনি। চাইবাসা যাইনি। যাবার সময় কেউ ডাকেনি। সেদিকে নাকি পাহাড়ী ঝরনায় ৩০।৪০ জন সাঁওতালনী মাটি দিয়ে নিঃসংকোচে উরু মাজে এক সঙ্গে। গা পরিষ্কার করে। আমি দেখিনি। জানি সে ছবিও নিশ্চয় আদি এবং অকৃত্রিম।

আমি কিন্তু আরেকটি ছবি দেখেছি। অবস্থাপন্ন ভূস্বামী স্ত্রীর অসাক্ষাতে চাষী রমণীকে রক্ষিতা রাখে। তার স্বামী কোথাও জমি পায়নি বলে হা-ঘরে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারপর ইঁদুরের গর্ত থেকে ধান সংগ্রহের অনুমতি চায়। কিন্তু সেই গর্তের ভেতর থেকে সাপ ধরার জন্যে সাপুড়েও অনুমতিপ্রার্থী। অর্থাৎ ইঁদুর যে গর্তে ধান চুরি করে রাখে সে গর্তে সাপ ঢুকে ইঁদুরকে বাস্তুচ্যুত করে। সেই সাপকে ধরতে সাপুড়ে আসে। সেই গর্তের ধান চাইতে জলপাত্র চাষী রমণীর স্বামীও ঘুরে বেড়ায়। পাকা ধান খেতে এসে কাদাখোঁচা পাখি ধরা পড়েছে। চাষী রমণী শণের কাঠি পাখির এক চোখ দিয়ে ভরে অন্য চোখ থেকে বের করে এনে আধমরা অন্ধ পাখিকে জীইয়ে রাখে। কারণ তার ভাষায়— বাবু খাবে। এই নিয়ে লিখেছিলাম একটি গল্প—ধান কেউটে।

লেখার উদ্দেশ্য একটিই। তা হল উন্মোচন। অনুসন্ধানের পথে পথে এই উন্মোচন। বিনা মন্তব্যে সরল বাক্য সাজিয়ে এগিয়ে যাওয়াই আমার পদ্ধতি। আমি ব'লতে চাই সবচেয়ে কম। আর চাই আমার না-বলাটুকু পাঠকের মনে ক্রমিক পুনঃ সৃষ্টি করে চলুক : সে-ই পথ খুঁজে পাক। তাই সাধারণত আমার কোন রচনাতেই জটিল বাক্য থাকে না। কেউ বলেন বড় কাটা-কাটা লাগে। আমি এটা ইচ্ছে করেই করি। কেননা এটাই আমার পদ্ধতি। সেই পদ্ধতিতে আমি 'টেবিল' 'চেয়ারের' মতই অনায়াসে উপযুক্ত ইংরাজি কথা ব্যবহার করি। কারণ, জানি এই কথাগুলি আমরা অন্য সময়ে বাংলার মতই আমাদের বাক্যে ব্যবহার করে থাকি। নজর রাখি একটা হেভি শব্দের বদলে যেন আটপৌরে শব্দ খুজে পাই।

একদা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, হোয়াট ইজ লফটি ইন ইওর স্টেয়িং ইন এ ভিলেজ?

একজন কবি বলেছিলেন, হ্যাঁ। আপনি তো ওই লক্ষ্মীকান্তপুর লাইন নিয়ে গল্প লেখেন।

এর কোন কথারই জবাব হয় না। দিলেও বুঝবে না। কিছু দাবি করছি-না। কাউকে ছোট করছি না।

বাঙালীর জীবনে সবচেয়ে বড় দুর্গাপুজোর নাম আমন ধান চাষ। এক কোটি একরে ৭০ লক্ষ কৃষিজীবী পরিবারের ৫।৬ মাস ধরে কর্মব্যস্ত কাণ্ড। ধান কবে আবিষ্কৃত হয়েছিল জানি না। তবে নিশ্চয় অনেক দিনের। আমরা যারা জুতো পায়ে দিয়ে শহরে বাস করছি—তাদের ঘরের কিনার দিয়েই এই কর্মকাণ্ড সারা দেশের মানুষ ও মন জুড়ে ব্যাপ্ত। রাজনৈতিক নেতারা চাষীর কথা বলছেন। শিল্প কারখানা কৃষিভিত্তিক হওয়ার চেষ্টা করছে। কবি লিখছেন—ধান করো। ধান করো। ধান একদা গণ-নাট্যের গান হয়েছিল। ট্রেনের জানালায় বসলে এই দৃশ্যই দেখা যায়। ধান, গরু, জল, মানুষ—এসব তো একই সুতোয় গাঁথা। একজন লেখক এ-ব্যাপারটি কি এড়িয়ে চলতে পারেন? তাঁর শিক্ষায় এটা কি অবশ্য পাঠ্য নয়? এই তো তাঁর টেক্সট বুক। এ কথা কোন এক আড্ডায় বলাতে আমার খুবই প্রিয় একজন সমসাময়িক লেখক বলেছিলেন, না। ও সম্পর্কে লেখকের একটা রিমোট ধারণা থাকাই যথেষ্ট। আমি জানি, এই টেক্সট বইখানা পড়া থাকলে ওই লেখকের বিষয়বস্তু এবং কলমের জাদু অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়াত। আমরা কেউ তাঁর সামনে এগোতে পারতাম না। দুঃখের বিষয়, এই লেখক একখানি শারদীয়া উপন্যাসের শুরুতে লিখলেন—আমি 'গেমু' ইত্যাদি দিয়ে গাঁয়ের কথা লিখতে জানি না। তিনি বাঙালী এবং বাঙলায় লেখেন। তাঁর একটি কবিতায় নদী প্রতিবাদ হয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে আছড়ে আছড়ে পড়েছে। আমার খুব দুঃখ হয়। কারণ জানি, ওই কবিতা স্রেফ ভাবালুতা। ইহা শিল্প নহে।

সন্দীপন বলেছিলেন, তুই একদম বানাতে জানিস না। তোর কোন ইমাজিনেশন নেই।

এ কথারও কোন জবাব দিতে পারিনি। কারণ দিয়ে কোন লাভ নেই। কোথায় বানাই, কোথায় আসলের সঙ্গে মিশেল দিই—তা বাইরের লোক কি করে বুঝবে? সৃষ্টিতে আমি দ্বিতীয় ব্রহ্মা—এমন কোন গর্ব আমার নেই।

আমাদের সময় কয়েকজন বিশিষ্ট সম্পাদকে আলোকিত। যেমন: সাগরময় ঘোষ। যেমন: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এঁদের সাহস, এঁদের সুবিচার সুবিদিত। তবে এ কথাও ঠিক—সময়ের জিনিস সময়ে না হলে আর হয় না। পরে তার কোন সংশোধনও নেই। এমন অনেক লেখাই ভালো ছাত্রের মত ভালো স্কুলে পড়াতে পারিনি বলে স্বল্প প্রচারের খুদে স্কুলে পড়ে সেই ছাত্র বা লেখা বিস্মৃতিতে তলিয়ে গেছে। এক জীবন দিয়ে তার দাম দিতে হচ্ছে। আর ফিরে

আমার নয়। এখন চেষ্টা করলেও সে-রকম লেখা আর বেরোবে না। অবহেলা অনেক ক্ষতি করে। কোন সম্পাদকের সুবিচার যদি কারও প্রতি ওজন করে দেখা যায়—ওজনে দেড় মণ—সেই সম্পাদকের অবিচারের ওজন আমার বেলায় ঠিক ততখানিই—দেড় মণ। এর নাম প্রতিবন্ধকতা না বলে আমি বলব ভবিতব্য। এটাই কপালে ছিল।

প্রতিবন্ধক আরেকটি জিনিস আছে। আমি যাতে হাত দিই তা শেষ পর্যন্ত টাকা দিতে থাকে। টাকা শেষ পর্যন্ত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অন্তত আমার ক্ষেত্রে। তাই বাহুল্য বর্জন করে কী করে টাকা আয় না করা যায়—সে-পথ আলস্য এবং অন্যান্য জিনিস দিয়ে আমি গত ১৪।১৫ বছর খুঁজে আসছি। প্রায় পেয়ে গেছি। জীবনটাকে চুরুট করে পোড়ালে আগুনের মাথায় দেড় ইঞ্চি লম্বা ছাই লেখার অনুপান করা যায় কি? জানি না। তবে আন্দাজে চেষ্টা করে যাচ্ছি।

মানুষকে ভালোভাবে দেখতে জানলে—কঠিন দুঃখেও হাসি পায়। চিরন্তনতার মাপকাঠিতে শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তখন সব কিছু সম্পর্কেই একটা হাসির দৃষ্টিকোণ তৈরি হয়ে যায়। সে-হাসির ভেতর দুঃখের কণা ছিটানো থাকে। আলো পড়লে তা ঝিকঝিক করে ওঠে। তাই আমার অনেক গুরুগম্ভীর লেখাতেও হাসি এসে গেছে। আমি এমন একটি লেখা লিখতে চাই—যা কিনা তিরিশ বছর পরেও পড়তে গিয়ে নতুন মনে হবে।

লেখা বড় হয়ে গেল। একটি গরু এবং একটি ইঁটখোলা সম্পর্কে কিছু কথা বলে লেখা শেষ করতে চাই।

একবার একটি গরু পুষেছিলাম। আন্দাজে কেনা গাই। বাছুর সমেত। হরিয়ানা গাই। তার চোখে গাঢ় করে কাজল টানা। আমার বড় মেয়ের বয়সী। কুচো করে খড় কেটে দিতাম। মাসে চুনিভুষির সঙ্গে গুড় খেত আধ মণ। রাত দুটোয় বাড়ি ফিরলেও কান লটপট করে রিসিভ করত আমায়। এক অমাবস্যায় ডাক নিল। পাল খাওয়াবার ব্যবস্থা করলাম। কী কৃতজ্ঞ দৃষ্টি! বাচ্চা হল। দশ সের দুধ দিত। চার বছর আমার কাছে ছিল। বড় গম্ভীর ও অহংকারী গরু। অভাবে পড়ে গাভীন অবস্থায় তাকে বেচে দিতে হল। আমি যখন পথ দিয়ে যেতাম—তখন ও গলা বাড়িয়ে খালের ওপার থেকে ডাকত। হাম্বা। আমি শুনতাম—শ্যামলবাবু বাড়ি ফিরছো? ছায়া দিয়ে হাঁটো। বড় রোদ্দুর। এ কথা 'নৃপেনদের বাড়ি' গল্পে এসেছে। এসেছে

'সরমা ও নীলকান্ত' উপন্যাসে। ওরই সুবাদে নানা প্রকারের গোবদ্যির সঙ্গে আলাপ হয়। গরুর হাড়ের চিকিৎসকদের বলে হাড়ো খাঁ। গরুর কৃত্রিম প্রজননের জন্যে রোজ এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে আইস বক্সে করে ওহিও বাঁড়ের বীর্য আসে দমদমে। জগৎ বেঁধে রেখেছে গরু। ওর হাড় একদিন গুঁড়ো হয়ে সার হবে। ওর মাংস দিয়ে দামী ওষুধ হবে মানুষের। ওর চামড়া দিয়ে অনেকের কর্মসংস্থান হবে। ওর দুধ আর গোবরের কথা না-ই তুললাম। এসব আমায় ভাবায়।

একবার একটা ইটখোলা করেছিলাম। লক্ষ্মণ, পঞ্চানন হাজরা, শরৎ ইট কাটতে আসতো শেষরাতে। লথগঞ্জের ইট। হাজার চোদ্দ টাকা। পাঁজা বসালাম। হাজারে ৬ মণ কয়লা। মাসখানেক পরে পাঁজা ভেঙে ঝামা, ছাই, এক নম্বর ইট নীরেস ইট বেরোলো। ইটের গাছি দিলাম। ছাই ছেঁকে বস্তা-বন্দী করলাম। তাই দিয়ে বাড়ি গেঁথে তুললাম। দেখলাম ইটখোলার কিছুই ফেলা যায় না। ঝামা ভেঙে খোয়া। ছাই হল গাঁথুনির মশলা। পৃথিবীর খানিকটা কেটে নিয়ে তাই দিয়ে পৃথিবীর গায়ে বাড়ি। গরুর মত।

কত মায়া এর মধ্যে। কিছুই ফেলার নেই। এসব আমায় ভাবায়। বড বড় ইটখোলার গর্ত আমায় অন্ধকারে ডাকে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ এক ॥

ট্রেন থেকে নেমে স্টেশন বাজারের মুখে অক্রুরবাবুর সঙ্গে দেখা হল অনাথের। অনাথও একজন বাবু এখানে। কলকাতায় চাকরি করে। ডেলি প্যাসেঞ্জার। যাত্রার সিজন টিকিট কাটে। ইংরিজি খবরের কাগজ যায় ওর বাড়িতে। তা অক্রুরবাবু—মানে সবাই অক্রুর বলে ডাকে এখানে—তার মুদিখানার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বলল, আমার একটা গাই আছে অনাথবাবু। কিনবেন আপনি?

অনাথের হাতে অশোকতরুর লং প্লেয়িং রেকর্ড। বাড়ি ফিরে দুই মেয়ে আর তাদের মা শান্তাকে রেকর্ডখানা শোনাবে ঠিক করেছিল।

দাঁড়িয়ে গিয়ে অক্রুরবাবুকে ভালো করে দেখলো। পেনসিল স্কেচের কাঁপা কাঁপা লাইনে মুখখানা আঁকা। ডললেই বোধ হয় মুছে যাবে অক্রুরের মুখ। আস্তে বলল, দেখুন আমার বাড়িতে জীবজন্তু তো কম নেই। আর বাড়াতে সাহস হচ্ছে না।

অনাথবাবু, গরু খুব ভালো জন্তু খাঁটি হারয়ানা গাই। মোটে ছ'খানা দাঁত।

দাঁত?

দাঁত গুনে গাইয়ের বয়স ঠিক হয় অনাথবাবু।

তাই বুঝি। জানতাম না তো। কোন্ পাটির?

নীচের। বাড়ি গিয়ে খুকীদের মাকে বলুন না।

হাঁটতে হাঁটতেই অনাথ বলল, আচ্ছা বলে দেখবো। লেবেল ক্রসিং পেরিয়ে অনাথ পঞ্চাননতলায় এসে একটা প্রণাম ঠুকলো। বড় জাগ্রত থান। পাশেই উমাপতি সাইকেল স্টোর্স। দিনের বেলায় দোকানের বারান্দায় উমাপতির ভাই নিশাপতি খাসী কেটে ঝুলিয়ে দেয়। ভাগা দিয়ে মাংস বিক্রি করে। খাসীর একখানা পুরো চামড়ার দাম নেবে তের সিকে।

আর গাই দিয়ে কাজ নেই। মনে মনেই বললো অনাথ। গাঁয়ে এসে বাড়ি করেছে আজ আট বছর। এখানে আসার সময় ছোট খুকীর বয়স ছিল তিন মাস। বড় খুকীর চার বছর। এখন ওরা দুজন বড়টি হয়ে উঠছে। খোলা হাওয়া, টাটকা আনাজ, বড় সরপুঁটির অভাব নেই ঠিকই। কিন্তু পথেঘাটে যার সঙ্গেই দেখা হবে—শুধু ধানের দর, কুমড়োর সাইজ আর ইন্দিরা গান্ধী নিয়ে কথাবার্তা কাঁহাতক আর ভালো লাগে।

একেই কলকাতা থেকে কেউ এলে অনাথের বাড়িটাকে চিড়িয়াখানা বলে। পাতিহাঁস আটটা, রাজহাঁস দুটো (বড় খুকীর শখ), ছাগল পাঁঠাপাঁঠি নিয়ে এগারোটা, অ্যালসেসিয়ান একটা (মাদি), মুরগি একান্নটা (সবই হোয়াইট লেগহর্ন), শাস্তার তিনটি আশ্রিত বেড়াল (একটি হুলো), দুটি খুকী আর একটি বউ নিয়ে অনাথের এই চিড়িয়াখানা।

এ-ছাড়া বাড়ির গায়েই ঝোপেঝাড়ে গুটিকয় বিষধর এবং কয়েকটি নির্বিষ জিনিস আছে। সাপুড়েরা এসে কেউটে পেলে ধরে নিয়ে যায়। নির্বিষ দাঁড়াশ সাপ পেলে ছেড়ে দেয়। তারা কিশোর বালকের মতই ফন ফন করে আলের ওপর ফণা তুলে মৌজা ঈশ্বরীতলার এক দাগ থেকে আরেক দাগে চলে যায়। লম্বায় সাত-আট ফুট। এক বেলায় তিন-চারটে মৌজা পার হয়ে যাবে পাখির ডিমের লোভে ব্যাঙের লোভে। যখন যেমন পায় আর কি।

ফাল্গুন মাসের জ্যোৎস্না রাত। ইলেকট্রিক ট্রেন, স্টেশনবাজার, ধানের গোলা, ব্যাঙ্কবাড়ি, গম ভাঙানোর কল, আলুরচপের দোকান, ইরিগেশনের ক্যানাল-ব্রীজ পেরিয়ে এসে অনাথবন্ধু বসু তার বাড়ির রাস্তা ধরল। এখন এ জায়গায় সত্য-যুগ। ক্যানালের গা ধরে লাল সুরকির রাস্তা। এই আধা গাঁ-গঞ্জের সবেধন খেলার মাঠ এদিকেই। তারপর কলাগাছের জঙ্গলে ঘেরা এক-একখানা বসতবাড়ি। রাস্তায় মাঝে মাঝে ডালপালা ছড়ানো খিরিশ গাছের বিশাল ছাতা। তিনখানা গেরস্থ ঘর ছাড়িয়ে অনাথের নতুন বাড়ি। নতুন লাইনটানা ইলেকট্রিক আলোয় বাড়িটা এখন সন্ধ্যেরাতের স্টীমারের ডেক একদম। চারদিকে অন্ধকার। মাঝখানে উঁচু ভিতের বাড়িটা আলো-ঝলমলানো।

প্রথমে তীরবেগে ছুটে এসে বাঘা তাকে রিসিভ করল। বয়স দেড় বছর। এর ভেতরেই তিনজন চাষীকে কামড়েছে। প্রত্যেককে পনর টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে। গম্ভীর কালোয়াতি গলায় ডাকে। ভীষণ ভীতু। গাঁয়ের দিশী কুকুররা একজোট হয়ে তাড়া করলে লেজ তুলে পালাবে। উঠোনে শাস্তা একটা গর্ত করে ফ্যান ঢেলে দেয় রোজ। চুক চুক করে খায় ইদানীং বড়ি দিয়ে রান্না লাউশাকও ফেলে না। চেটে খেয়ে নেয়।

বাড়ির কম্পাউণ্ডে ঢুকতে ছাগলগুলো প্রথম কান লটপট করে অনাথকে বলল, এত দেরিতে ফিরলে?

অনাথ বলল, ব্যা। ব্যা। জায়গাটা নির্জন। সাক্ষী শুধু বাঘা। সে লেজ তুলে আর গলা তুলে অনাথের আদর চাইছিল। শাস্তা কিংবা খুকীরা

বাড়ির ভেতরে। তারা তখনো জানে না, তাদের সবচেয়ে বড় জন্তুটা এইমাত্র বাড়ি ফিরলো।

ছাগলরা শুনলো, সোনারপুরে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল অনেকক্ষণ। কৈফিয়ৎ শুনে তারা অনাথকে আর কিছু বলল না। এদের মধ্যে সবচেয়ে ধাড়ি ছাগলটির নাম শুক্লা। বড় খুকীর সর্দির ধাত সারানোর জন্যে তাকে আমদানি করা হয় সাড়ে চার বছর আগে। তারই সন্তান-সন্ততিতে ছাগলের ঘরটি এখন বোঝাই। শুক্লার নিজের হাঁপানি আছে। কাল সকালেই চার পা একজায়গা করে চ্যাং-দোলা অবস্থায় একটা ওষুধ খাওয়াবে অনাথ। আজই ট্রেনে শুনেছে। পুজো-বাড়ির রামদায়ের যেখানটায় চোখ আঁকা থাকে—সেখানে হুঁকোর জলে টিকে ঘষে কালচে কাই খাওয়ালে হাঁপানি সাফ। শুক্লাও আরাম পাবে।

বড় খুকীর নাম টুকু। ক্লাস সেভেনে পড়ে। মাদুরে ঘুমোচ্ছিল। বাপের গলা পেয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। এখুনি সারাদিন কী ঘটেছে বলবে, ক্লাসে।

শান্তা বলল, বাবুকে লুঙি এনে দাও। জল দাও।

খুকীদের সঙ্গে ওদের মা অনাথকে বাবু বলে ডাকে।

টুকুর আগেই তার ছোট বোন লিলি রবারের স্যাণ্ডেল নিয়ে এল গম্ভীর হয়ে। ভাবখানা, হেরে গেলি তো দিদি।

শান্তা রেকর্ডখানা হাতে নিয়ে বলল, এখন বাজাবো?

না। খাওয়াদাওয়ার পর শোনা যাবে।

ভাত দিতে দিতে শান্তা বলল, নন্দবাবুকে পালটাও। টুকুকে পড়াতে বসে মোটা মানুষটা কোঁচা ঘুরিয়ে হাওয়া খাবে—আর টুকুটা ঘুমিয়ে পড়ে মার খায় শুধু।

পালটাবো।

লিলি ডাল দিয়ে ভাত ভেঙে বলল, আজ দিদির দু-আঙুলে পেন্সিল গুঁজে দিয়ে চাপ দিচ্ছিল। আমি শেষে কামড়ে দিলাম বাবু।

শান্তার হাসি এলে থামতে চায় না। হাসির ভেতর কুলকুচো করে যে-কথাটা বলল, তা হল, আচমকা কামড় খেয়ে নন্দবাবুর সে কি চিৎকার!

ছেড়ে দিল টুকুকে?

দেবে না মানে! টেবিলের তলায় ঢুকে হাঁটুতে কামড় বসিয়ে দিলাম। দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল যে—

লিলির দিদিটা খুব ভালভাত খাচ্ছিল। হুমহাম করে। লাল ফ্রক নীল ইজের। ক'দিন পরেই পিটভর্তি ঘামাচি বেরোবে। সেভেনে পড়লেও পড়াশুনো কিছু জানে না। গোড়া থেকেই কাঁচা। পড়াতে বসে দু-এক বছর আগেও অনাথ এই মেয়েটাকে বাঁশ নিয়ে তাড়া করেছে। বাপ হয়ে ছুটে পারেনি। টুকু ধানক্ষেতের আল ধরে পাঁই পাঁই করে ছুটে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

সেখান থেকে অনাথকে চেঁচিয়ে ডেকেছে, এবার আসবো বাবু? এখন আর মারবে না তো?

অনাথ চেঁচিয়ে বলেছে, চলে আয় পাগল! শেষে কিছুতে কামড়াবে।

শাস্তা তখন তার বাবুর গোড়ালিতে জলপটি দিচ্ছে। ছোটাছুটিতে পা বিগড়ে এই নিগ্রহ। বাড়ির চৌহদ্দির বাইরেই ধানক্ষেত। পর পর সব মৌজা। খাড়ু পাতাল। দ্বারিকপোতা। চন্দনেশ্বর। তাদের পরেই আকাশের তিনখানা মেঘ রোজ বিকেলে একপাল তাল নারকেলের মাথায় খসে পড়ে।

একবার ধৈর্য রাখতে না পেরে অনাথ টুকুকে ট্রানজিস্টর ছুঁড়ে মেরেছিল।

টুকু মাথা সরিয়ে নিয়ে হেসে ফেলেছিল। লাগলো না তো। আবার মারো! নিজেই ট্রানজিস্টরটা এগিয়ে দিয়েছিল টুকু। জিনিসটা তখন চুরমার। মাঠের মধ্যে বাড়ি। চারদিক ফাঁকা। শব্দের জন্যেই কিনে এনেছিল অনাথ। অগত্যা! কি আর করে? রেকর্ড প্লেয়ার কিনে ফেলে একদিন। এখন তাই মাঝে মাঝেই রেকর্ড আনতে হয় তার। একগাদা টাকা গচ্চা। একখানা রেকর্ডের দামে এক মণ ধান কেনা যায় বদ্যিনাথের গোলায়। শুধু কি তাই রেকর্ড প্লেয়ার কিনেও হয়নি। টুকুর বায়না রাখতে একজোড়া রাজহাঁস কিনতে হয়েছে হগসাহেবের বাজার থেকে। রামবাবুর আড়তে। নগদ একশো দশ টাকা। ওরা এসে অব্দি চোর আসে না। একবার শেষরাতে চোরেরা পুকুরে জাল টানছিল। রাজহাঁস দুটো একসঙ্গে টানা বিউগিল বাজাতে লাগলো গলায়। একদম পুলিস প্যারেডে বাজে যে ব্যাগপাইপ—ঠিক সেরকম। ওরা জাল ফেলে পালালো।

খাওয়ার শেষে অনাথ বলল, বলাইকে দেখছি নে!

লিলি বলল, আজ বলাইদার গোষ্ঠ আছে।

গোষ্ঠপালার দিন আজ নাকি? এঃ! হেঃ! ভুল হয়ে গেল একটা। বলাইকে কথা দিয়েছিলাম দেখতে যাবো।

টুকু বলল, এখন চল বাবু।

না রে। এত রাতে আর যাব না।

শান্তা নিজের ভাত নিয়ে বসে বলল, বলাইয়ের তোমার অনেক গুণ। যা মাইনে দাও—তা থেকে আড়াই টাকা মাস্টারকে দিয়ে গোষ্ঠর গান তুলেছে গলায়।

অনাথ চুপ করে থাকলো। চোদ্দ পনর বছরের এই বালকটি তার কাছে কাজ করতে এসেছিল ছ-সাত বছর বয়সে। এখন গোঁফ উঠছে। আঁচিয়ে এসে লিলিকে বলল, রেকর্ডখানা বাজাও তো।

ফিরিয়ে ফিরিয়ে শুনতে শুনতে রাত গাঢ় হল। সুন্দর গলা। গানের জোরে জ্যোৎস্নার মানে বেরিয়ে আসছে। শান্তা ঘুমিয়ে পড়েছে। টুকু-লিলিরও এক দশা। বাঘা অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। মাঝখানে লোহার গ্রিল। সে কাঁপোযাতি গলায় অনাথকে বলল, ভালো রেকর্ড এনেছো তো!

অনাথ চারদিক তাকিয়ে নিল। তিন প্রাণীই ঘুমোচ্ছে। সে বাঘার দিকে তাকিয়ে আস্তে বলল, ঘেউ।

বাঘা শুনলো, ধন্যবাদ।

এখন ঈশ্বরীতলা গ্লোবের বাইরে। দূরে জ্যোৎস্নার ভেতরে একটা লাল দপদগে আগুনের ফুলকি। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের ওই স্মৃতিটাই শুধু পৃথিবীর সঙ্গে এখন ঈশ্বরীতলার একমাত্র যোগ।

জালে ঘেরা পোলট্রির খানিকটা লেগহর্নদের পায়চারির জায়গা। পাগলা জ্যোৎস্নাকে দিন ভেবে ওরা ক'জন সেখানে পায়চারি করছিল। অনাথকে দেখে একজন বলল, মর্নিং ওযাকে বেরিয়েছো?

অনাথ দেখল, এখন সারা পৃথিবী ঘুমোচ্ছে। সে অনায়াসে চেঁচিয়ে বলল, কঁ কঁ কঁ।

মুরগিরা শুনলো, দিন কোথায়! যাও শুয়ে পড়গে তোমরা। শুনেই ওরা ঘুমোতে চলে গেল ভেতরে।

এই ঈশ্বরীতলা ভূগোলের বাইরে হলেও এর নিজেরও একটা ভূগোল আছে, ইতিহাস আছে। শিয়ালদা থেকে ভাড়া পঁচাত্তর পয়সা। ক্রসিং না থাকলে চল্লিশ মিনিট সময় নেয় ট্রেন। একটা খাল আছে ঈশ্বরীতলায়। সেই খাল বাঁধের নাম কোম্পানি বাঁধ। তারই গায়ে অনাথবন্ধুর নতুন বাড়ি। অনাথ এখন মাঝরাতে সেই কোম্পানি বাঁধে পায়চারি করতে গিয়ে জ্যোৎস্নার চাপে থেঁতলে যাচ্ছিল। অনাথের কথাও কিছু বলা দরকার। তার আগে দরকার

ঈশ্বরীতলার ভূগোলের কথা। লেবেল ক্রসিং-এর ওপারে রেল স্টেশন, বাজার, ব্যাঙ্ক, কলেজ, ছায়াবাণী সিনেমা ঘর আর এম-এল-এর বাড়ি এবং এক ইঁটের গাঁথুনির একখানা ছিমছাম চার্চ আছে। সেখানে রবিবার সকাল থেকে ঘণ্টা বাজে। বর্ষাকালে রোয়ার ধান চারা কম পড়লে ইলেকট্রিক ট্রেনে করেই পরের স্টেশন থেকে বোঝা বেঁধে নিয়ে আসে চাষীরা।

লেবেল ক্রসিংএর এপারে আরেক রকমের ঈশ্বরীতলা। ধানের গোলা, গম কল, গুড়াকু তামাকের দোকান, স্যাঁকরার ঘর, বাসের টাইম অফিস, পঞ্চাননতলা, ধানক্ষেত। এদিকটাতেই জমি সস্তা বলে অনাথ বাড়ি করতে পেরেছে।

অনাথবন্ধু বসু কবি নয়। ইঞ্জিনীয়ার নয়। সাধু নয়। ক্রিমিনালও নয়। দয়ামায়া, রাগ-দুঃখে ভরা একজন উনচল্লিশ বছরের বাঙালী। সিগারেট খায়। গান শোনে। এখানে এসে কবিরাজের বাঁধা ভাঁড়ের তাড়ি খায় নিয়ম করে। সে ব্যাঙ্কে কাজ করে না। আঠারো বছর একনাগাড়ে একটা অফিসে কলম পিষে এখন সে মাঝারি বাবু। তার বউ শান্তা ত্রিশে পা দিয়েছে।

সেই অনাথ এখন কোম্পানি বাঁধ ধরে খালের তেমাথানির দিকে হাঁটছিল। কাঁচের পারা স্বচ্ছ জ্যোৎস্না তেমাথানিতে দাঁড়িয়ে দেখলো—দিনের বেলার সেই মেঘ তিনখানা জায়গা বদলায়নি। দিব্যি চন্দনেশ্বর মৌজার মাথার ওপর খসে পড়তে গিয়ে ঝুলে আছে। গায়ে তার ফুরফুরে বাতাস লাগছিল।

ঘুরে দাঁড়াল। খালের ওপারে ট্রেন লাইন পেরোলেই অক্রূরবাবুর জায়গা। তার চেয়ে অনেক আগে এদেশে এসেছে। হটখোলার বড় বড় দিঘির চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকায় কিনে নিয়ে একসঙ্গে জুড়ে ফেলে বাড়ির গায়েই ভেড়ি করেছে প্রায়। সেখানে সকাল সন্ধ্যে হাজার হাজার মাছ ডিগবাজি খায়, বুড়বুড়ি কাটে। স্টেশন বাজারে অক্রূরের মুদিখানা। মহুয়ার খোল বড়বাজার থেকে কিনে এনে মাছেদের খেতে দেয়। দুই ছেলে কলকাতায় গিয়ে চাকরি করে আসে। বাড়ির গায়ের ধানজমিতে ধান, গম, ছোলা, মুগ, মুসুরির চাষ আছে অক্রূরের।

সেই অক্রূর গাই বেচবে কেন? ভেবে পেল না অনাথ।

সকালে হেলথ্ সেণ্টার থেকে ডাক্তার কাগজ পড়ে অনাথকে পাঠিয়ে দেয়। শান্তা ঘুম থেকে উঠে দেখলো, তার আধা পুরনো স্বামীটি কাগজের অক্ষরগুলো চোখে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

কাল রাতেও পায়চারি করে বেড়িয়েছো?

না তো।

একবার দেখলাম যেন বিছানায় নেই তুমি।

একটু বেরিয়েছিলাম।

ভালো। সাধুটাধু হয়ে যাবে শেষে! আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে তো তুমি সুখী হওনি।

হঠাৎ একথা বলছো কেন শান্তা? আমার কোন কাজে কি ফাঁকি আছে?

নেই বলেই তো এত ভয়। তুমি কেন যে এত নিয়মে চলো বুঝি না।

আমি খেয়াল না রাখলে তো সংসারটা ভেসে যাবে শান্তা।

একটু ভাসতে দাও না। ভেসে দেখি একবার—কেমন লাগে সে জিনিসটা।

অনাথ এসব কথায় না গিয়ে বলল, মদন-বদন এসেছিল?

জানি না তো। দেখি—

শান্তা উঠে গিয়ে বারান্দায় বসবার লম্বা বেঞ্চের তলা থেকে বাঁধা ভাঁড় হাতে ঝুলিয়ে চলে এল। এসেছিল। ওরা দু ভাই না দিয়ে গেলে কে এখানে তোমার তাড়ি রেখে যাবে।

তারপর নিত্যকার মত শান্তা বড় গ্লাসে ন্যাকড়া দিয়ে সে তাড়ি ছেঁকে অনাথের হাতে দিল। এখানে এসে এটি অনাথের অভ্যেস হয়েছে। চোঁ চোঁ করে খেয়ে নিল তিন গ্রাস। তারপর বলল, রাখো এখন। বাকীটা পরে খাবো। কিংবা টুকুও খেতে পারে।

বড় খুকীকে আর ও অভ্যেস করিও না। পরে বিপদে পড়বে মেয়েটা।

বিপদ কিসের? কবিরাজী অনন্ত মূল দিয়ে গাছে বসানো বাঁধা ভাঁড়ের তাড়ি। যে খাবে তার শরীর ফিরবে।

শ্বশুরবাড়িতে যোগান দুধের মত এ তাড় পাঠাতে পারবে মেয়েকে?

সে-কথা আলাদা শান্তা। ভালো কথা। দুধের কথা বললে—একটা কথা বলা হয়নি তোমাকে। অক্রূরবাবু তার গাই বেচতে চায়।

আর জন্তু-জানোয়ার এনো না তো বাড়িতে। যার যা কিছু বেচার তোমায় বলে কেন?

কোথায় ছিল টুকু আর লিলি। ঘুম থেকে উঠেই কোম্পানি বাঁধে গিয়েছিল। রোজ যায়। মদন আর বদন ছিপ বসায় রোজ রাতে। পুঁটি মাছ, কেঁচো, চিংড়ি যা পায় বঁড়শিতে গেঁথে বসিয়ে রাখে। একবার রান্নাপুজোর রাতে একটা সাপ গেঁথেছিল শুধু। তা প্রায়ই ওরা দু ভাই পাঁকাল মাছ পায়। বান, শোল, মৃগেলও জোটে কোন কোন দিন। যাই গাঁথুক না কেন—টুকু আগ-

বাড়িয়ে ওদের ধরে আনবে বাড়িতে। বলবে, বাবু কেনো। এখুনি কিনতে হবে। সঙ্গে থাকে ছোট খুকী লিলি। সেও বলে, কিনতেই হবে।

আজও দুই ভাইকে ধরে এনেছে টুকু আর লিলি। মদনের হাতে ছিপ। বদনের হাতে মস্ত একটা শোল। এখন দরাদরি চলবে আধ ঘণ্টা ধরে। শাস্তা রাগারাগি করবে। তারপর নিজেই মাছ কুটে নিয়ে বলাইকে আঁচ ধরাতে বলবে। আসলে দরাদরির নাম করে অনাথ মদন-বদনের সঙ্গে গল্পগাছা চালায়। গল্পের জন্যে নতুন নতুন কাজ আবিষ্কার করে অনাথ ওদের দু ভাইকে মজুরি দিয়ে আটকে রাখে প্রায়ই। পুকুরের পানা পরিষ্কার করো। মাছ বাড়ছে না মোটে। নীচের পাঁক ঘেঁটে গ্যাস বের করে দাও মাটির। এই সব আর কি। তারই ফাঁকে ফাঁকে চলে নানান গল্প। কোন্ বর্ষায় ওরা দু ভাই মিলে ধানক্ষেতে একটা পুকুরভাসা কাতলা ধরেছিল চোদ্দ কে-জি-র। জবেদের খোটিতে বেচে আটা-নব্বই টাকা পেয়েছিল। ওদের বড়দা ভদ্রেশ্বর মাছটা প্রথম দেখতে পায় বলে তাকে দিয়েছিল নগদ সাত টাকা।

টুকু কথাটা ধরে নিয়েছে কানে। কোন গাইটা বাবু? অক্রুর জেঠর? সে তো বিরাট গাই। কী সুন্দর সিং। লেজে মাছি তাড়ায় সব সময়।

দাঁড়া। আগে মাছটার দর করি।

মাছটা মেঝেতে ফেলে দিতেই সেটা দাপাদাপি লাগাল। তার সঙ্গে সঙ্গে বাধাব লাফালাফি শুরু হয়ে গেল। পুকুর থেকে লিলির নাম দেওয়া দুই রাজহাঁস —অরুণ বরুণ বিউগিল বাজাতে শুরু করেছে। ছাগলরা ছাড়া পেয়েছ শুক্লার খবরদারিতে উহু উহু করতে করতে বাঁধে উঠে গেল। পাতিহাঁসের দল এতক্ষণে খালের জলে। লেগহর্নগুলো অত্যন্ত বিচক্ষণ ভঙ্গীতে পায়চারির ঘেরা জায়গাটাতে মেপে মেপে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। কৃষ্ণচূড়া গাছটা ডালে ডালে লাল ফুলের আগুন দিয়েছে সাতসকালে। ঘাস গাঢ় সবুজ। গাঁয়ের দূরের রাস্তা দিয়ে বাঁকে ডাবের কাঁদি ঝুলিয়ে দুলতে দুলতে তিনজন যাচ্ছে স্টেশনে। স' ছ'টার ট্রেন ধরবে। অনাথ কিছু না বলে মনে মনে দম বন্ধ করল এক সেকেণ্ড: তখনই নিজেকে বলে নিল, এরই নাম সুখের সংসার। বিশেষ করে এ কথাটা তার মনে এল, কারণ, বেড়ালদের হুলোটা ঘরের কোণে গ্যাঁট হয়ে বসে অনাথের দিকে তাকাচ্ছিল সেই মুহূর্তে—আর সামনের বাঁ পা তুলে নাকের সামনেটা চুলকে নিচ্ছিল। এত লোকের সামনে এমন সময় বেড়ালরা তার সঙ্গে কথা বলে না। নয়তো অনাথকে হুলো একটা কিছু বলতোই। শাস্তা ওকে বজ্জাত বলে ডাকে।

শান্তা বলল, যে-গরু লেজে মাছি তাড়ায়—তার মানে তার ঘাড়ে ঘা আছে। ওসব জিনিস বাড়িতে ঢুকিও না। যার যা-কিছু বেচার—সবার আগে তোমার কাছে তা আনে কেন?

মদন বলল, বাবু বড়লোক তো তাই আনে।

বদন মাথা নেড়ে দাদার কথায় সায় দিল। মাথা কামানো ওদের জাত-ব্যবসা। সেদিকে দু ভাই যায়নি। কিন্তু কোথায় ক্ষুর বিক্রি হয়, কোথায় নরুণ তৈরি হয় সে-সব ওদের নখদর্পণে। কারণ ওদের বড় ভাই ভদ্রেশ্বর এখনো নাপিতগিরিতে টিকে আছে। ওই করে যজমানির মত চক্কোত্তিদের এজমালি থেকে তিন বিঘে জমি পেয়েছে। তাই চাষ করে ভদ্রেশ্বর। তাতে বড় ভাইয়ের হাত থেকে মজুরি নিয়ে মদন-বদন ধান রুয়ে দেয়। ওরা দু'জন গাছের ফল, সুষনের গম, খালের মাছ, পুকুরপাড়ের ওল খেয়ে পেট ভরায়। তবু গাল, গোঁফ, বগল কামাবে না কিছুতেই। শুধু মাঝে-মধ্যে নখ কেটে দেয় অনাথের।

কি করে জানলি আমি বড়লোক?

মদন বলল, সে দেখেই বোঝা যায় বাবু। কাজকম্ম বিশেষ করো না। একটু আপিস যাও শুধু। আর নগদ পয়সায় সব কেনাকাটা করো। কিনতে গিয়ে সারাদিন ঠগে আসছো। তাতে হুস নেই কোন। বড়লোক ছাড়া এসব পারে?

ওঃ! আর কথা বাড়ালো না অনাথ। মাছটা কতোয় দিবি?

তোমার যা ইচ্ছে।

এই এক চালাকি তোদের। লজ্জায় পড়ে আমি বেশী দাম দিয়ে ফেলি।

তাহলে বাজার বরাবর ওজন করে হিসাব করে দাও।

বলাই না এলে তো দাঁড়িপাল্লা পাওয়া যাবে না। কোথায় রেখে গেছে।

এই যে আমি এসে গেছি বাবু।

শান্তা হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো, কি সেজেছিলে বলাইদা?

বলাই লজ্জায় হাফপ্যান্ট কষে বাঁধলো কোমরে। একটাও বোতাম নেই। সব জায়গায় সেফটিপিন। আর কোমরে নারকেলদাড়ি। স্যাণ্ডেল কিনে দিয়েছিল অনাথ। পরতে পারে না বলাই। পায়ের আঙুলগুলো বাঁকা। কোনরকম জুতো ফিট হয় না পায়ে।

কাল রাতে কেমন হলো?

অনাথের কথায় বলাই হেসে বলল, যশোমতি সেজেছিলাম।

তা তো বুঝতেই পারছি। গালের রঙ ধুয়ে আয়।

টুকু চেঁচিয়ে বলল, চোখের কাজল, টিপ ধুবি না বলাই। আমরা তোর পার্ট দেখবো একটু।

রঙ ধুতে যাবার আগে বলাই বলল, অক্রুর বাঙাল একটা গাইয়ের কথা তোমাকে বলতে বলল। ট্রেনের মুখে লেবেল ক্রসিংএ ধরেছিল আমায় এখন। আমায় না দেখিয়ে গাই কিনো না কিন্তু বাবু।

বলাইকে মদন-বদন দেখতে পারে না। রীতিমত হিংসে করে। অনাথকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, কত মাইনে দাও ওকে? শুধু ফাঁকি মারে—

মদনের বয়স বছর তেইশ। বদনের এখনো বোধ হয় কুড়ি হয়নি। দু ভাই মাছের লোভে ছিপ ফেলে শীতের রাতেও খালপাড়ে কাঁথামুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে। সেই মদন বলল, বলাইটার সবতাতে বাড়াবাড়ি। গরু চেনে কত তা তো জানি। চল না বাবু—বিকেলে দেখে আসি সবাই গিয়ে।

তা গেলে হয়।

শান্তা জ্যান্ত মাছটাকে কুটতে নিয়ে গেল অনেক কষ্টে। হাতের ভেতরে উঠেও সে কি দাপাদাপি। যাবার সময় শান্তা মদনের দিকে চোখ মটকে বলল, ওজনে আর কাজ নেই। এখন তো বাবুর তাড়িতে ভাগ বসাবে। সকালবেলা এখন বাড়ি যাও।

অনাথ বলল, দামটা দিই আগে।

সাত টাকার বেশী কিছুতে দিও না।

অনাথ মদনকে চোখের ইশারা করে হাসলো। অর্থাৎ যা বলছে বলুক গিয়ে। মুখে বলল, টেবিলের ওপর থেকে আমার মানিব্যাগটা আন তো।

শান্তা মাছ কুটতে রান্নাঘরে ঢুকেছে। এমন সময় হকার এসে অনাথের নিজের কাগজ দিয়ে গেল। অনাথ একখানা দশ টাকার নোট মদনের হাতে দিয়ে বলল, পালা এখন। গাই দেখতে যাব বিকেলে। আসিস কিন্তু।

পুকুরঘাটে মুখ ধুচ্ছিল বলাই। টুকু আর লিলি পেছনে দাঁড়িয়ে। লিলি বলছে, যশোদার গানটা একটু গা না বলাইদা।

শাড়ি না পরে তো গাইতে পারি নে আমি।

টুকু বললে, হাফপ্যান্ট পরেই গা বলাই।

তাহলে যে হেঁড়ে গলা বেরোবে। তোরা এখন পড়তে বোস গে। সন্ধ্যেবেলা নেচে নেচে গেয়ে শোনাবো। কথা দিলাম। তখন তোদের মায়ের শাড়ি পরে নেব। পায়ে ঘুঙুর বাঁধবো। দেখিস—

তাড়িতে অনাথের মাড়ি চিন চিন করছিল। নিজেই ছেঁকে নিয়ে আরও দু' গ্রাস খেল। তখন ফুরফুরে বাতাসে মাথাটা বেশ ভার হয়ে এল আর ভাল লাগতে লাগলো অনাথের। মনে মনে ঠিক করল, আজ আর অফিসে যাবে না। গরম গরম মাছভাত খেয়ে দোর বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে টানা ঘুমোবে। তার আগে সাঁতার কেটে স্নান করা দরকার। চেঁচিয়ে শান্তাকে বলল, কষা কষা করে মাছটা রাঁধবে কিন্তু।

শান্তা অন্য কথা বলল। অক্রুরের অত আঠা কেন? ও গাই নিশ্চয় খুঁতো।

॥ দুই ॥

স্কুলে গেল না টুকু আর লিলি। শান্তার রান্নার গুণে অন্যদিনের তুলনায় ওরা ভাত খেল ডবল। তারপর অনাথকে পরিষ্কার বলল, আমরা এখন হাঁটতে পারবো না বাবু। আমরা এখন শোব। তুমি কাল স্কুলে একটা চিঠি লিখে দিও।

প্রায়ই অনাথকে এরকম লিখতে হয়। সে চিঠির কথায় রাজী হল। কিন্তু নিজের জন্যে যেমন ভেবেছিল তা হল না। তাড়ির নেশাটা দিব্যি ধরেছে। ভাত খেলো অনেকটা। তারপর ভরপেটে নেশা লাগার ঘোরে ছুটতে ছুটতে গিয়ে সাড়ে দশটার ট্রেনটা ধরলো। রোজকার মত আজও মাঝের ভেণ্ডার কামরায় উঠলো। অমনি সবজিওয়ালারা তাকে প্রায় লুফে নিল। কী খবর বসুমশায়? আজ এত দেরি যে!

অনাথ কোন জবাব না দিয়ে জানলার ধারে বসে মাথাটা লোহার শিকে রাখলো। এখন ছুটন্ত ট্রেনের উলটোদিকের বাতাস এসে তার চুলের গোড়া অব্দি চুলকে দেবে আর অমনি সে এক স্টেশন না যেতেই বসে বসে ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুম ভাঙবে একদম শেয়ালদায়।

ভাঙলোও তাই। তবে অনেক পরে। ইলেকট্রিক ট্রেন দু মুখ দিয়েই চলতে পারে। তাই ট্রেনটা আবার শেয়ালদা ছেড়ে রওনা হওয়ার মুখে-মুখে অনাথ উঠে দাঁড়ালো। প্রায়ই এরকম হয়। ঘাড় দেখে বুঝলো প্রায় পঞ্চাশ মিনিট অঘোরে ঘুমিয়েছে। এখন স্টেশনের বাথরুমের আয়নায় তার দাড়িকামানো মুখখানা সৌম্য-সৌম্য দেখাবে।

সেই মুখ নিয়ে অনাথ অফিসে গিয়ে উঠলো। জায়গাটি বড় ভালো। সে কাজ জানে। তাই কেউ তাকে ঘাঁটায় না। তিনজনের কাজ এক ঘণ্টায় তুলে

দিয়ে আসছি বলে অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

দেড়টা বাজে। কলেজ-জীবনের বন্ধুরা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। পুরনো কলেজের সামনে দিয়ে হাঁটবার সময় পরিষ্কার টের পেল, কাল সব হরণ করে। ওই তো কলেজ-গেট। ওখানে বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কত আড্ডা দিয়েছে। সেই সময়টার ওপর এখন কত দিনের নতুন নতুন সময় এসে পুরনো সময়টাকে চাপা দিয়েছে। খুঁজে খুঁজেও সে সময়টাকে আর পাওয়া যাবে না।

এই কলেজের হলে সে ডিবেট করেছে। গেটে বক্তৃতা দিয়েছে। পিকেটিং করেছে একসময়। সবাইকে মনে হত—না জানি কতকালের বন্ধু। এখন তারা সবাই কোথায়? যে যার কাজে।

মর্নিংএর ভারতী এসে এই বকুলগাছটার নীচে দাঁড়াতো। প্রথম প্রথম তাকে অনাথবাবু বলে ডাকতো। শেষে শুধু বন্ধু বলতো। তার নামের শেষের বন্ধু কথাটা খুব লাগসই শোনাতো ভারতীর মুখে। তাদের ব্যাপারটা বাইরের কেউ ধরতেই পারতো না। অনাথ তো ভেবেছিল, বিয়েও হয়ে যাবে ওদের। কিন্তু তা হয়নি। সে অনেক কথা। এখন থাক।

কী জন্যে বেরিয়েছে মনে পড়তে সে ট্রামলাইন থেকে ফুটপাথে উঠলো। এ রাস্তায় রামদা, ছড়ি, মাছ ধরার পিঁপড়ের ডিম, কোদাল, কুকুরের চেন, বাগান করার খুরপি আর বড় গরু বাঁধার মোটা শেকল কিনতে পাওয়া যায়। একটা দর করে দেখলে হয়। এগোতে গিয়ে চকচকিয়ে গেল অনাথ।

তারই সামনে দিয়ে ভারতী যাচ্ছে। আগের চেয়ে মোটা হয়েছে। দামী শাড়ি। কপালে অনেক সিঁদুর। সঙ্গে কয়েকজন সুখী চেহারার মহিলা। ভারতী তাকে দেখেও চিনতে পারল না। অবিশ্যি অনেক দিনের কথা। অনাথের চেহারা অনেক পালটে গেছে। যতদূর সে শুনেছে—ভারতী একটা স্কুলে ভূগোল পড়াত। আবার গার্ল গাইডও হয়েছিল। তবে বিয়ের কথা কানে আসেনি। অনেকদিন আইবুড়ো থেকে সম্ভবত এতকাল পরে বিয়েতে বসেছে মেয়েটা। তাই অত সিঁদুর মাথায়। সঙ্গের মেয়ে ও মহিলারা হয়ত শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়। বেশী বয়সে ভারতী কোন বেশী বয়সের লোকের সঙ্গে মালা বদল করেছে। ওপরের পাটির সামনের দুটো দাঁতে সেই ফাঁকটুকু আছে। কথা বলতে বলতে ভারতী সামনের মিষ্টির দোকানটায় ঢুকল।

অনাথের খুব চেনা দেবার ইচ্ছে হল। ওকে চিনতে পেরে ভারতীর মুখের চেহারাটা কী দাঁড়ায়—তাই একবার দেখতে হবে। অনাথও মিষ্টির দোকানে

ঢুকে পড়ল। সামনেই প্রমাণ সাইজের আয়না। তাতে দুই প্রতিবিম্বের চোখা-চোখি হল। কিন্তু ভারতী একদম চিনতে পারল না অনাথকে। অনাথ চেনা দিতে চাইল। হাসল। কিন্তু ভারতী তাকে আদৌ চিনতে পারল না।

দোকানদার অনাথকে বলল, কি দেব?

কি আছে?

দেখুন। বসে খাবেন? না, সঙ্গে নিয়ে যাবেন?

সঙ্গে।

সস্তায় পাঁচটা মুগের লাড্ডু পেল এক টাকায়। ঠোঙায় সেগুলো নিয়ে রাস্তা দিয়ে খেতে খেতে এগোল অনাথ। খায় আর এগোয়। একসময় দেখল, জল না খেয়ে গলা আটকে যাচ্ছে। মোড়ে টিউবওয়েল দেখে পাম্প করল। সর্বনাশ। জল নেই। বিকল টিউবওয়েলের সামনে নিত্যানন্দ ভোজনালয়ে ছুটে গিয়ে জল খেয়ে তবে স্বস্তি। ভোজনালয়ের ছায়ামত পরিষ্কার সিঁড়িতে বসে পড়ল অনাথ। শেষে এতকাল পরে প্রেমের এই পরিণতি। ভাগ্যিস সে অডিনারী। যদি অসাধারণ কেউ হত—তাহলে তো নিজের স্মৃতি, সংস্কারের গর্বে ভীষণ কষ্ট পেতে হত অনাথকে। এই বেশ আছে সে। অনেক রকমের জীবন করে করে এখন সে এখানে এসে ঠেকেছে। এখন তার সবচেয়ে ভাল লাগে ঘাসে ঢাকা মাটিতে খালি পায়ে হাঁটতে। আরও ভাল লাগত গড়াগড়ি দিতে পারলে। ফাঁকা মাঠে বিকেলের দিকে চিৎ হয়ে শুয়ে সোজা আকাশে তাকিয়ে দেখেছে—পৃথিবীটা পিঠের নীচে স্লিপ করে করে ঘুরে যাচ্ছে এ ত অনিত্য। সে নিজে কোনদিন গীতা চণ্ডী পড়েনি। কোন গুরু নেই অনাথের। আমাশা আছে। উচ্চাশা উবে যাচ্ছে। রোজ সে সোজা সরল আনন্দে ডুবে যাচ্ছে।

তবু স্বীকার করা দরকার, এহেন অনাথবন্ধুরও একটা ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে। খুঁটিনাটি খুঁটতে সময় যাবে। তার চেয়ে দু'এক কথায় বলে দেওয়া ভালো। আমাদের অনাথ একদা ভীষণ ব্যস্ত জীবন কাটিয়ে দেখেছে। আড়াই বছর গেছে ইস্পাত কারখানার ওপেন হার্থ ফার্নেসে। দেড় বছর মথুরাপ্রসাদ বিদ্যা-পীঠে ইংরাজী র‍্যাপিড রিডার পড়িয়েছে। রেডিওতে খবর পড়েছে সাত মাস। তিনজন প্রেমিকার সঙ্গে তিন-তিনবার বিয়ে হতে হতে হয়নি। কলেজের গেট মিটিংয়ে সে ফায়ারি স্পিচ দিত। তার সময়কার একজন ছাত্র-নেত্রী—যাকে অনাথ দিদি বলে ডাকতো—এখন প্রধান মন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠদের একজন। একবার অনাথের অ্যাপেণ্ডিসাইটিস হয়েছে। দু'বার প্লাস্টার হয়েছে পা।

সে কত কী জানে! তবু চুপ করে থেকে নিভৃতে বাঘার বাংলা কথার জবাবে 'ঘেউ' বলতে অনেক ভাল লাগে তার এখন।

অনাথ বেলাবেলি বাড়ি ফিরে দেখে—দিনের বেলা এই লাল সুরকির পথ অন্য রকমের। এ সময় ঈশ্বরীতলার ওপর দিয়ে সম্ভবতঃ নিরক্ষরীয় বায়ু বয়ে যায়। ওই বায়ু বোধ হয় কোন লেখাপড়া শেখেনি। কেননা খাল-পাড়ের গাছগুলোর ডালপালা পাতাসুদ্ধ এই বাতাসে ওলটপালট খাচ্ছে। গুচ্ছের গাইবাছুর বাদা থেকে ঘরে ফিরছে। বাঘার পাহারায় পাতিহাঁস আটটি খালের জলে বিকেলের শেষ স্নান সারতে ব্যস্ত। কোথাও কোন নাগরিক জিনিসের ছায়া পর্যন্ত দেখতে পেল না অনাথ। আজ পূর্ণিমা হতে পারে। চন্দনেশ্বর মৌজা পেরিয়ে দূরের ধোঁয়াটে জায়গার ওপরকার আকাশে এরই ভেতর চাঁদের একটা আউটলাইন ফুটে উঠলো। ভালো জ্যোৎস্না পেলে ঈশ্বরী-তলার এদিকটা একদম বুনোপরী হয়ে যায়।

বাড়ির আবহাওয়া একটু থমথমে হলেও সবাই তৈরি।

থমথমে, কারণ, ওষুধের গুণে বড় সাইজের ডিম দিতে গিয়ে একান্ন নম্বর লেগহর্নটি খানিক আগে অক্কা পেয়েছে। তাতে ওদের কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। পায়চারির জায়গায় দিব্বি খেলছে সবাই। মোরগগুলোর ঠোঁট চেঁছে দিতে হবে। একান্ন নম্বরের সৎকারের আয়োজন করতে হয়নি। মদনের বয়স তেইশ হবে। বদন অন্তত উনিশ। ওরা আজই জীবনে প্রথম মুরগির মাংস খাবে। শান্তা খুকীদের কিছুতেই মরা মাংস খেতে দেবে না। অনাথকেও নয়। এর আগে শান্তার বয়স কত বলেছি কি? মনে নেই। শান্তার এখন বত্রিশ কিংবা তেত্রিশ। একান্ন নম্বরের মৃত্যুপ্রসঙ্গেই শান্তার বয়সের কথা এসে গেল।

আশ্চর্য! কোথায় মানুষ। আর কোথায় মুরগি। একটা ফিনফিনে জন্তু। আরেকটা জাঁদরেল জন্তু।

বারান্দায় বসে ছিল—মদন, বদন, নলাই, টুকু, লিলি। শান্তা এই সময়টায় দাঁতে ফিতে কামড়ে বেণী বাঁধে। অফিসের পোশাকেই অনাথও এসে বারান্দায় বসল। এই ভিড়ে দুটি খুকী তার নিজের মেয়ে। একটি কিশোর তার চাকর। গাঁয়ের দুটি নিরক্ষর যুবা তার আধা আশ্রিত। সবাই মিলে এখন অক্রূরবাবুর গরু দেখতে যেতে হবে।

টুকু একটা কথাই বলল, এই গাই আমাদের চাই-ই চাই। অন্য কোন কথা শুনতে চাই না বাবু।

বেশ। চলো।

সবার আগে মদন। তার হাতে গরু বাঁধার নতুন দড়ি। তারপর একে একে বাকিরা। চারটে উনত্রিশের ট্রেনের জন্যে প্ল্যাটফর্মে লোক গিজগিজ করছিল। অক্রুরবাবুর জায়গায় যেতে কোন রাস্তা নেই। প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছাকাছি তার বাড়ি। শেয়ালদার প্যাসেঞ্জাররা এই বিচিত্র দলটিকে যেতে দেখলো।

অক্রুরের উঠোনে পৌঁছে দেখে—জমি থেকে ডালসুদ্ধু গাছ তুলে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। শুকনো দিকটা অক্রুর লাঠিপেটা করছে। সেখানে ঝুর ঝুর করে ডাল পড়ছে। পেটানো গাছগুলো বাঁ হাতে পেছনে ছুঁড়ে দিচ্ছিল অক্রুর। একটা বাঁধা গাই কোনক্রমে গলা বাড়িয়ে তা মুখে তুলে নিচ্ছিল।

গাই দেখে টুকু চোখ ফেরাতে পারে না। তাদের রামায়ণে মুনিঋষির আশ্রমে এমন গাইয়ের কথা আছে। ভালো বাংলায় ওদের বলে—ধেনু। ওরা 'গোঠে' চরতে যায়। সে পরিষ্কার বলল, বাবু. এই গাই আমার চাই।

দাড়া পাগল। বিকেল অন্ধকার হয়ে গিয়ে জ্যোৎস্নার ভেতর আবার আলো হয়ে ফুটে উঠছিল। দরদাম করি আগে।

না বাবু। আমার চাই।

অক্রুর শুনতে পেল কি না বোঝা গেল না। গাই দেখাতে উঠে দাঁড়াল। মাটির গোয়াল। তার ভেতরে গরুটা যেন ধরে না। সঙ্গে তার ছেলে। ভয়ংকর হৃষ্টপুষ্ট। ক্যালেণ্ডারে এমন বাছুরের পিঠে হেলান দিয়ে কৃষ্ণ বাঁশী বাজায়। মা, ছেলে—দু'জনেরই চোখে কালো করে সুর্মা টানা।

গোয়াল থেকে একটা নালা অক্রুরের সই নিজস্ব সম্ভার ভেড়িতে গিয়ে পড়েছে। গোবর, চোনা, ভাতের ফেন, টুকিটাকি সবই ওপথে গিয়ে জলের ভেতর মাছের খাবার হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই এক-একটা বড় মাছ জলে লেজের ঘাই দিচ্ছিল।

অক্রুর দাম চাইলো চারশো টাকা। শেষে বললো, বছরখানেক পরে বাছুরটাই হালের জন্যে আড়াইশো টাকায় বিক্রি হয়ে যাবে।

ওই টাকার ভেতর বাছুর পাওয়া যাবে? তা তো জানতো না অনাথ। গরুর সঙ্গে বাছুর ফাও। মনের এ কথা অনাথ উচ্চারণ করল না। মদন-বদনের কথাবার্তায় বুঝলো, দুই-ই রেওয়াজ।

অক্রুরকে বলল, দুধ দেয় কতটা?

বাছুর তো বড় হয়ে গেছে এখন তা সের আড়াই দেবে। খুব ঘন আর মিষ্টি

মদন বলল, এত বড় বাছুর—অথচ গাই এখনো পাল খায়নি কেন ?

এত বড় গাইয়ের সঙ্গী পাই কোথায় এখানে ?

মদন সন্দেহের চোখে অক্রুরের মুখে তাকালো। সত্যি কথা বল তো ঘাঙালবাবু! গাই তোমার পাল ঝেড়ে ফেলে না তো ? তাহলে কিন্তু একদম বাঁজা গাই। বাঁট শুকিয়ে গিয়ে আর কোনদিন দুধ দেবে না।

অক্রুরের চোখে পলক পড়লো না। না, না। তা কেন মদন? দাঁত গুনে নাও। এ গাই এখন অনাথবাবুর ওই ছোট খুকীর বয়সী। একদম কচি। গাভিন হবার পর ছ'মাস অব্দি দুধ দেবে। এমন জিনিস আর পাবে না।

লিলি একথা শুনে খুব খুশী। তার বয়সী গাই। চেহারা যতই বডসড হোক—চাই কি বললে তার কথা রাখবে। বাবু, এ গাই তোমাকে কিনতেই হবে।

দাঁড়া দেখি।

সাড়ে তিনশো টাকায় রফা হল। বাছুর সুদ্ধ। অনাথ মনে মনে ভাবলো, শাস্তাকে গিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে। নিয়ে যাওয়ার কথা একটা জন্তু নিয়ে যাবে দুটো।

ইলেকট্রিক আসেনি। জ্যোৎস্নার ভেতর হেরিকেন জ্বেলে অক্রুরবাবু গাইয়ের ছাড়পত্র লিখলো। দোয়াতে কলম ডুবিয়ে। চোখে চশমা লাগিয়ে। অক্রুর-গিন্নী তখনো উঠোন থেকে ঝরে-পড়া ডাল তুলছিল।

৺শ্রীশ্রীকালী মা সহায়

আমার গরু হরিয়ানা—২ খানা উঁচু সিং। লম্বা গাই। গায়ের রঙ সাদা এবং একটু ২ কালো। গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে বাছুর হইয়াছে। সঙ্গে সেই ষাঁড় বাছুরটাও দেওয়া হইল। অদ্য নগদ তিনশত পঞ্চাশ টাকা বুঝিয়া পাইয়া শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু বসু বাবুকে দিয়া দিলাম।

ইতি—

শ্রীঅক্রুর বিক্রম মজুমদার

সাং ঈশ্বরীতলা

২৪ পরগণা

সাক্ষী হিসেবে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের টিপছাপ দিল বদন। জ্যোৎস্নার সঙ্গে হাওয়া এসে হেরিকেনটা নেভানোর চেষ্টা করছিল। এইটুকু লিখতে অক্রূরের হাত কেঁপে কেঁপে একাকার। ছাড়পত্রের লেখাও তেমনি কেঁপে কেঁপে গেছে।

মদন-বদনের সঙ্গে সঙ্গে গরু আর বাছুরের দড়ি ধরে অনাথ বাইরে এসে দেখলো—রেল লাইন, মাঠে সবে কচি পূর্ণিমা গুছিয়ে বসছে। হরেক আলো। হরেক ছায়া চারদিকে। কলকাতা যাওয়ার ছ'টা দশের গাড়ির নীল আলো দেখতে পেল অনাথ। ওরা ক'জনে লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটছিল।

এমন সময় হু হু করে ট্রেনটা এসে গেল। আর অমনি বাছুরসুদ্ধ গরুটা মদন বদনের হাত ছাড়িয়ে একদম ঘোড়ার রেসের স্পীডে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে লাগলো। ওদের পেছনে অনাথদের পুরো দলটাও ছুটলো। এখুনি বাছুর সমেত গরু না আটকালে লোক বোঝাই ভিড়ের প্ল্যাটফর্ম একদম থেঁতলে দিয়ে বেরিয়ে যাবে। অনেকে জখম হবে। গরুর ওজন অন্ততঃ দশ-বারো মণ তো বটেই। এখুনি আটকানো দরকার।

মদন বদন মরীয়া হয়ে পেছন পেছন দৌড়চ্ছে। তাদের পেছনে বলাই। একটু পরে অনাথ। ট্রেন ভারসাম গরুর দৌড় দেখে পিছিয়ে পড়া টুকু আর লিলি আনন্দে হাসতে হাসতে আসছিল। বিপদ কোথায় ওরা তা একদম বুঝতে পারেনি।

গরু বাছুর কাউকেই আটক না গেল না। সমান স্পীডে প্ল্যাটফর্ম মাড়িয়ে ওরা লেভেল ক্রসিংয়ে গিয়ে আটকে গেল। ভাগ্য ভাল। পায়ের আওয়াজ শুনে আগে থেকেই লোকজন সরে দাঁড়িয়েছিল। মা আর ছেলেকে ওরা লেভেল ক্রসিংয়ে গিয়ে ধরলো। মায়ের চেয়েও বাছুরটা তেজি। ঘাড়ে চমৎকার কুঁজ। সুঠাম শরীর। টুকু গায়ে একটু হাত বুলিয়ে নিল।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ শান্তাকে বলাই একখানা কাঁসার থালায় আমপাতা, সিঁদুর, কাঁচা হলুদ সাজিয়ে দিয়ে বলল, যাও বৌদি—এবারে বরণ করে নাও। গাই বাকি ছিল। গাই হয়ে গেল।

পুকুরপাড়ে বকফুল গাছটায় বাঁধা হয়েছে মাকে। ছেলেকে কদম গাছে। দু'জনেই পুকুরপাড়ের জোলো ঘাস খাচ্ছে আর মাথা তুলে সন্দেহে সন্দেহে সবাইকে দেখছে।

গাইয়ের কপালে সিঁদুর ছোঁয়াতে গিয়ে তিনবার পিছিয়ে এল শান্তা।

এগোলেই সিং তোলে। তখন বলাই আম্রপল্লবখানা ওর মুখে গুঁজে দিয়ে সিঁদুর ছুঁইয়ে দিল কপালে। শান্তা তক্ষুনি ওর নাম দিয়ে দিল—উমা। লিলি বলল, আমি তাহলে ওর ছেলেকে কানাই বলে ডাকি?

অনাথ বলল, ডাকো। তোমার যখন শখ!

উমা সিঁদুরের টিপ পরে গম্ভীর চালে নতুন জায়গার ঘাস খাচ্ছিল। একবার অন্যমনস্ক শান্তার কনুই চেটে দিতেই শান্তার ভয় ভেঙে গেল। টুকু এগিয়ে গিয়ে ওর গলকম্বলে মশা তাড়িয়ে হাত বুলোতেই উমা মুখ তুলে আকাশের তারা দেখতে লাগলো।

এখুনি ওদের জন্যে কোন খাবার নেই বাড়িতে। মদন আর বদন মিলে একটা বিরাট বিচে কলার গাছ ফালি ফালি করে কেটে ফেলল। তারপর ডালায় সাজিয়ে ছ'জনকে এগিয়ে দিল। মা আর ছেলে খায়—আর তৃপ্তিতে দু'জনের চোখ বুজে আসে। ওদের আশেপাশে শান্তা, বলাই, টুকু, মদন, বাঘা, লিলি, বদন ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়ানো। অনাথের মনে ঈশ্বরীতলার এই গ্রুপ ছবির জল-ছাপ পাকাপাকি পড়ে গেল।

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর পুকুরে আঁচাতে নেমে অনাথ দেখলো, আশ্চর্য কাণ্ড। বৃষ্টি এসে গেছে। মেঘ ছুটে এসে চারদিকের জ্যোৎস্না আকাশ থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছে। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও গায়ে লাগলো। তিরিশ মাইলের ভেতর নানা সাইজের নদী গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। তাহলে কি স্থানীয় সংবাদের সেই নিম্নচাপ আচমকা ঈশ্বরীতলায় বৃষ্টি এনে দিল।

মদন, বদন বাড়ি চলে গেছে। বাঘা অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূরের হেরিকেন দেখে তার কালোয়াতি গলা সাধছিল। টুকু আর লিলি আজ শুতে যায়নি। তারা জানলা দিয়ে বলল, উমা ভিজে যাবে বাবু। কানাইয়ের ঠাণ্ডা লাগবে।

বলাই এঁটো বাসনের গোছা নিয়ে পুকুরে এসে বলল, ও দাদাবাবু—এ যে বৃষ্টি এসে গেল। পূর্ণিমের বৃষ্টি তো এখন থামবে না—

শান্তা আঁচিয়ে নিয়ে বলল, তাহলে? কেন যে গোয়াল না বানিয়েই উমাকে আনলে। কানাই বেচারাও ভিজছে।

বলাই চল তো। ওদের দু'জনকে বৈঠকখানায় রাখি আজ রাতটা।

ও মেঝেতে পা হড়কাবে উমার। সে হয় না দাদাবাবু। তারপর বলাই বুঝিয়ে বলল, গরু খড়্‌খড়ে মেঝে ছাড়া থাকতে পারে না। পেছল মেঝেতে

থাকতে দিলে ওদের পা ভাঙবে।

কিন্তু তেড়েফুঁড়ে বৃষ্টি আসায় ওদের বৈঠকখানাতেই নিতে হল। চেয়ার টেবিল টুকু আর শান্তা মিলে সরিয়ে দিল। উমা কিংবা কানাই কখনো এরকম ঘরে থাকেনি। বলাই ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে নিয়ে তুললো। যেতে কি চায়। তাড়াতাড়িতে সব জিনিস সরানো যায়নি। ঘরে ঢুকেই উমা অনাথের চামড়া বাঁধাই ডিক্সনা রখানা টেস্ট করল। বলাই টানাটানি করেও ওর মুখ থেকে সবটা বের করতে পারলো না। প্রিফেস থেকে জি পর্যন্ত প্রায় সবটাই উমার পেটে চলে গেল।

বলাই বলল, খিদে লেগেছে।

খাবার তো যোগাড় নেই। তোমার কাছে কিছু আছে শান্তা?

কি থাকবে? জল দেওয়া ভাত আছে। কিন্তু তাতে তো ওদের কারও এক গ্রাসও হবে না।

বলাই রেগে গেল। তুমি কেমন লোক গো দাদাবাবু? খাবার ব্যবস্থা করোনি। থাকবার জায়গা করোনি। অথচ মা ব্যাটাকে কিনে নে এলে!

সব হয়ে যাবে দেখিস। আজকের রাতটা তো সামলাই আগে।

ঠিক তখনই কানাই পেছনের পায়ের লাথিতে ঘরের কোণের কুঁজোটা চুরমার করে দিল। তার জল গড়িয়ে সারা মেঝে কাই। ঠিক তখনই জ্যোৎস্না চাপা দিতে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। উমা আর কানাই তো আসলে গরু। তারা কোন বৈঠকখানা পরোয়া করার লোক নয়। কানাইকে বাঁধা হয়েছে জানলার গ্রিলে। উমাকে দরজার হুড়কোয়। দড়ি খানিকটা লম্বা দিয়ে বাঁধা —যাতে ওরা দরকারে হাঁটু মুড়ে বসতে শুতে পারে। কিন্তু সে-সব পরোয়া ওদের দুজনের কারোরই নেই।

গরম হাওয়া দিয়ে উমা অনেকটা শক্ত গোবর থাকে থাকে উঠে যাওয়া মন্দিরের চুড়ো করে মেঝেয় ফেলল। তার সঙ্গে গরম চোনা।

টুকু আনন্দে হাততালি দিয়ে ফেলল, মা তোমার আর ঘুঁটের অভাব হবে না দেখো।

হ্যাঁ। আমায় তোরা ঘুঁটেকুড়োনি পেয়েছিস তো। এখন এ ঘর পরিষ্কার করবে কে? পাশের ঘরেই তো শোবে। গন্ধে টিকতে পারবে তো?

অনাথ কোন জবাব দিল না। দুধের দেখা নেই এখনো—অথচ কত কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে। রমেনবাবুর [illegible] থেকে সাত টাকা পঞ্চাশের দড়ি এসেছে।

মদন-বদনকে ছ'টা টাকা দিতে হয়েছে। এখন বৈঠকখানা ঘরে মা-ব্যাটা অস্বস্তিতে ভুগছে। বিশেষ করে নিওনের আলোটা ওদের চোখে গিয়ে বিঁধছে। এখুনি নেভানো দরকার।

বলাই তুই এ ঘরে শুয়ে থাকতে পারবি ?

না দাদাবাবু। শেষে গাই চাপা পড়ে মরে যাই আর কি !

জেগে থাকবি।

আজ রাতটা তোমাদের সবাইকে জেগে থাকতে হবে দেখো।

না। কানাই আমায় একা পেলে অন্ধকারে ঢুসোবে।

অগত্যা আলো নিবিয়ে দিয়ে চিন্তিত মনে পাশের ঘরে সবাই শুতে গেল। বলাই থাকলো বারান্দায়। বাইরে অকাল বৃষ্টি। এ কাণ্ডটা না হলে ওরা মা ব্যাটা দিব্যি পুকুরপাড়ে একটা রাত কাটিয়ে দিতে পারতো।

শুয়েও কারও ঘুম আসছিল না। পাশেই বসবার ঘর। সে-ঘরে খুট করে একটা আওয়াজ হলেই অনাথ উঠে বসে। বাঘা জিনিসটা ভালো চোখে দেখেনি দুটো গরুকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি তার একদম অপছন্দ। ও কি ? একবার সে উমার কাছাকাছি গিয়ে গা শোঁকাশুঁকির চেষ্টা করে। কিন্তু সেখানে উমা আর কানাই মিলে তাকে চূড়ান্ত অপমান করেছে। উমা শিং ঘুরিয়ে তাকে গেঁথে তোলার চেষ্টা করেছিল। ভাগ্যিস সময়মত সে সরে আসে। আর ছেলেটি তো আরও গুণধর। পেছনের বাঁ পা ছটকে তাকে একটি লাথি কষাবার ব্যবস্থা করেছিল। সেখানেও বাঘা সময়মত সরে গিয়ে তবে জান মান বাঁচাতে পেরেছে। হাজার হোক ও দুটি তো আসলে গরু। এমনি কি সে ওদের কামড়ে দিতে পারে না ? কিন্তু লাভ কি ?

শান্তার সঙ্গে সঙ্গে টুকু আর লিলিও ঘুমিয়ে পড়েছে। ও ঘরে এবারে কানাই বোধ হয় চোনা ছড়ালো। ফোয়ারা থামতেই কানের লটপট আওয়াজ। অমন বিশাল চেহারা। মনোহর তাকানো। উমার শিং দুখানা খুবই বাহারের। আমপাতা, কলাগাছ, পুকুরপাড়ের ঘাস খেয়ে ওদের খিদে মেটেনি। বড় অস্বস্তি লাগছিল বিছানায় বসে। মশারির বাইরে এল অনাথ। পাশের ঘরে যাওয়ার দরজাটায় খিল লাগানো।

এমন তাড়াহুড়োয় ওদের আনা ঠিক হয়নি। গোয়ালের জিনিস এখন ড্রইংরুমে। অসুবিধে তো হবেই ওদের। খটমট আওয়াজ হচ্ছেই। তারপর লেজের ঝাপটানি গিয়ে দেওয়ালে লাগছে। ঠিক জল ছেটানোর আওয়াজ

থেকে থেকেই। ক'টা রাত হবে। বৃষ্টি নেই। কিন্তু মেঘ অনেক।

খড় কাটার বঁটি চাই একখানা।

মা-ব্যাটার জন্তে অন্ততঃ এক কাহন খড় এখনকার মত।

জাব দেওয়ার জন্তে দু'জনের দুটো মাটির গামলা।

চুনি, ভূষি, খোল, গুড়। জাবনা মাখার জন্তে জল বওয়ার একটি ছোট বালতি। গলার লোহার চেন দুটো। আর চাই দুধ দোয়ার একটা বালতি।

অবশ্য তার আগে চাই গোয়াল। কিন্তু কোন জায়গাটায় করবে—

আর ভাবতে পারল না অনাথ। পাশের ঘরেই উমা আর কানাই গুন্ত-দিশ স্বর লড়াই জুড়েছে। ওদের আড়মোড়া ভাঙার আওয়াজও আসছে। এই বুঝি ট্রেন চলে যাবে—এমন হুড়মুড় করে ওরা উঠে দাঁড়ালো।

তারপরেই মড় মড়—আর থপ্। থচাৎ।

উমা গোবর দিল। আর জায়গা পালটাতে পালটাতে পেটের চাপে বসবার ঘরের বেরোনোর দরজাটার একটা পাল্লা গজাং করে ভেঙে ফেলল। তারপরই ঘুমের ভেতর বলাই 'বাবাগো' বলে জেগে গেল। উঠে বসে কাঁদতে কাঁদতে বলল, এই গাই তুমি কাল সকালেই ফেরত দিয়ে এস দাদাবাবু।

আলোটা জ্বেলে ভেতরে তাকালো অনাথ। ঠিক তাই। একটা পাল্লা ভেঙে আধখানা মেঝেতে—আধখানা বারান্দায় পড়ে আছে। উমা সারা ঘর গোবর আর চোনায় লেই লেই করেছে। নিজের ডানদিকের পাছাখানাও তাতে মাখামাখি। তার মানে একবার হাঁটু মুড়ে বসতে চেষ্টা করেছিল। এখন পেছল মেঝেতে ঠিকমত দাড়াতে পারছে না। এই বুঝি পড়ে যায়—এমন বিপন্ন মুখে চিন্তিতভাবে জাবর কাটছে। কানাইয়ের অবস্থাও তাই। দু'জনের মুখো-মুখি লড়াই হবার উপায় ছিল না। কারণ আলাদা করে দূরে দূরে বাঁধা। তাই লড়াইটা হয়েছে—পেছনের পায়ে পায়ে। সেজন্তেই এই বিপত্তি।

বলাই বাবা, এখন তো বাইরে বৃষ্টি নেই। বড় কষ্ট পাচ্ছে, দু'জনকে পুকুরপাড়ে আলাদা করে বেঁধে দিবি?

ঘুম চোখে বলাই রাগে রাগে উঠে দাঁড়ালো। তারপর দু'জনের দাবনায় দুটি চড় মেরে বকতে বকতে বাইরে নিয়ে গেল। বসার ঘরটা তখন একদম বিধ্বস্ত অবস্থা। গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু—এসব কারা রাখতো আগে? উঃ!

নিজেই বালতি আর ঝাঁটা নিয়ে নেমে পড়ল। জল ঢালার আওয়াজে ঘুম

চোখে শান্তা উঠে এসেছে। তখনই তো বলেছিলাম তোমাকে—

বলাই জল ঢালছিল। অনাথ ঝাঁট দিচ্ছিল। কোমর ভেঙে কখনো ঝাঁটা দেয়নি এর আগে। সেই অবস্থাতেই অনাথ বলল, দেখো পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। যখন দুধ দেবে তখন।

বলাই গোবরের দলা করে বালতি বোঝাই করেছে। ফেলে দিচ্ছিল। শান্তা হা হা করে উঠলো। টিউবওয়েলের ওখানে ঢিবি করে রাখ্। কাল ঘুঁটে দিয়ে দিস।

ঝাঁটা হাতে উঠে দাঁড়ালো অনাথ। বলেছিলাম কিনা! গরু কত কাজে লাগে।

শান্তা একটুও হাসলো না। গম্ভীর মুখে বলল, শুতে যাও। কাল সকালে মিস্ত্রী ডেকে দরজাটা ঠিক করাবে। বলেই শান্তা শুতে চলে গেল।

মাঝরাত হবে। সারা ঘরে গোবর আর চোনার গন্ধ। অন্ধকার মাঠ থেকে খবর পেয়ে কিছু মাছি এসে পড়েছে। বাইরের দরজার একটি পাল্লা ভেঙে পড়ে আছে। তার ওপাশেই অন্ধকার মাঠে আবার একটু একটু করে জ্যোৎস্না ফুটে উঠছিল। বলাই শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ার আগে নিজে নিজেই বলল, উঃ কী গোন্ধ! ওরা কখনো গন্ধ বলবে না।

সকালবেলা সবার আগে উঠলো টুকু আর লিলি। তারা এসে শান্তাকে ডেকে নিয়ে গেল। মা দেখবে এসো। বকফুলে গাছতলা সাদা হয়ে আছে।

শান্তার তো দেখে চক্ষুস্থির। মাত্র বছর দুই ফুল দিচ্ছে গাছটা। আচমকা কেউ এসে গেলে সিঙাড়া আনতে হয় না। চায়ের সঙ্গে ব্যাসন মাখানো বকফুল ভাজা দেয় প্লেটে সাজিয়ে। গাছে একটাও ফুল নেই। সব মাটিতে।

ও বলাই, করেছিস কি? ওরকম বাছুর এই কচি গাছে বাঁধতে আছে?

অনাথও উঠে এসেছে। কানাই গলার দড়ি দিয়ে সারারাত গাছটাকে টানাটানি করেছে। ঝাঁকুনিতে গাছে আর একটিও ফুল নেই। সবুজ জোলো ঘাসের ওপর সাদা ফুলগুলো কানাই কিছু মাড়িয়েছে কিছু অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়েছে।

॥ তিন ॥

আজ আর অনাথের অফিস যাওয়া হল না। শ্লেষ্মাধরা আকাশটা দেখেই বুঝতে পারলো, বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি পড়বে। অথচ কোন ঘর হয়নি ওদের জন্যে। এখন কী করা যায়।

টুকু আর লিলি এমনিতেই পড়ে না। তার ওপর উমার আগমন। ওদের নিয়ে কাণ্ডকারখানা টুকুদের পড়াশুনো একদম ভুলিয়ে দিল। সকালের 'স্থানীয় সংবাদ' খবর দিল, ঘণ্টায় ছেচল্লিশ কিলোমিটার বেগে আজ ঝড় বইবে। উমার বাঁট দুধে ফুলে উঠেছে। বলাই দুইতে গিয়ে চাট খেয়ে ফিরে এল, দাদাবাবু তুমি দোহাল ডাকো। এ বড গাই দোয়া আমার কম্ম নয়।

পারবি না?

আমি তো ছোট ছেলে। দেখতে পাচ্ছো না?

গণেশের মা বড রাস্তার মিষ্টি জলের টিউবওয়েল পাম্প করে দুধে খাঁটি জল মেশায় প্রকাশ্যে। সে মাথা থেকে কেডেটা নামিয়ে হাসতে হাসতে বারান্দায় বসলো। অনাথ তখন তার নিত্যিকার তাডিটুকু ছেঁকে ছেঁকে খাচ্ছিল। সামনে অনেক কাজ গণেশের মা বলল, এক ঘটি দুধের জন্যে তুমি বাছা এত ঝামেলায় গেলে কেন? না হয় দুটো পয়সা কম দিতে। এখন সামলাও।

গণেশের মাকে কোন পাত্তা দিল না অনাথ। এখন সে যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছিল। রোজকার মত মদন বদন কোম্পানি বাঁধ থেকে হেঁটে এল। হাতে কয়েকটা কাঁকডা। ওরাই বলল, বাবু তুমি তাডির সঙ্গে ভেজে খাও। কোন পয়সা লাগবে না।

শান্তা ভাজতে রাজী হল না। বলাই ভেজে দিল। কাঁকডার সঙ্গে তাডি—সাতসকালে অনাথের মনে সাহস, শরীরে জোর এনে দিল। এক ফাঁকে টুকু এসে এক গ্রাস মেরে দিল। হাজার হোক নিজের বড মেয়ে। অনাথ বেছে বড কাঁকডাটাই টুকুর হাতে তুলে দিল।

খেতে খুব ভালো লাগছিল টুকুর। পরনে সেই নীল ইজেরটা। লম্বা বক হয়ে দাঁডিয়ে। ঠোটে কাঁকড়ার তেলটুকু মুছে বলল, বাবু, দুপুরবেলা ভাতের বদলে কাঁকডা আর তাডি করো না কেন? খুব ভালো লাগে খেতে।

এক সেকেণ্ড চোখ তুলে তাকালো অনাথ। এখন বাডতির বয়স। যা খায়—শরীর তা নেয়। রোজ একটু একটু লম্বা হচ্ছে। মুখে বলল, ভেতরে গিয়ে পডতে বোসো। মা শুনলে পেটাবে।

গণেশের মা বলল, বিয়ে হয়ে পরের বাড়ি যাবে। তাকে তুমি তাড়ি ধরাচ্ছো? কি ধারার বাবা তুমি? মাথার ভেতরে পাথর আছে তোমার!

অনাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো। এখানকার লোকজন এক-একজন বেশ পষ্টাপষ্টি কথা বলে দেয়। গণেশের মাকে বুঝিয়ে বলে লাভ নেই—বাঁধা

ভাঁড়ের এ তাড়ি কী জিনিস! সে বাপ হয়ে একা সুখ পাবে—মেয়েকে চেখে দেখার ভাগটুকুও দেবে না। এমন সুন্দর ছায়া করা সকাল। রাজহাঁস দুটো পাতিহাঁসদের সঙ্গে না মিশে পুকুরের একদিকে সরে গিয়ে কাগজের নৌকোর মত ভেসে বেড়াচ্ছে। বাঘা টুকুর মুখ থেকে কাঁকড়ার ছিবড়ে পাবার আশায় মুখ তুলে তাকিয়ে। গুল্লার নেতৃত্বে ছাগলরা এই সবে বেরোচ্ছে। বিচক্ষণ লেগহর্নের দল এখন মর্নিংওয়াকে ব্যস্ত। সবার ওপরে উমা আর কানাই। কাল সারাটা রাত তাদের অতখানি ব্যতিব্যস্ত করেও চোখেমুখে একদম নির্বিকার। অনায়াসে পুকুরপাড়ের ঘাস খেয়ে যাচ্ছে।

অনাথ বলল, কাল থেকে আর দুধ দিতে এসো না।

তা না হয় না আসবো। কিন্তু তোমার গাই দোয়ানো দরকার। ওলান ফুলে উঠেছে। দেখতে পাচ্ছো না?

তাই নাকি?

তবে কি। এখুনি দোয়া দরকার। নইলে বাঁট নষ্ট হয়ে যাবে।

তুমি দুয়ে দাও না গণেশের মা।

আমি কি পারি এত বড় গাই? খালের ওপার থেকে লালন ঝাঁকে ডাকো। চারটে মোষ আছে। পাঁচটা বাচ্চা রেখে লালনের বউ মারা গেছে ও-মাসে।

খাল সাঁতরে লালনকে ডাকতে বদন ওপারে চলে গেল। মদন গেল গুড়, চুনি, ভুষি, খোল আনতে। বলাই গেল মাটির গামলা আনতে আর কাঠের মিস্ত্রীকে খবর দিতে।

ঘণ্টা খানেকের ভেতর সারাটা বাড়ি ব্যস্ত হয়ে উঠলো। তিন কাহন খড়ের বরাত দেওয়ায় আড়ৎদার তিন তড়পা খড় স্যাম্পেল পাঠিয়েছে। নতুন কেনা বঁটিতে বলাই সে-খড় কুচোচ্ছিল। গামলায় গুড়, খোল, চুনি, ভুষির সঙ্গে কাটা খড় মিশিয়ে মদন জল ঢেলে জাবনা মেখে ফেলল। উমা আর কানাই খায় আর চবড় চবড় আওয়াজ ওঠে।

লালন ঝাঁ এলো প্রায় বেলা দশটায়। তখন মেঘলা আকাশ থেকে মিহি গুঁড়োর বৃষ্টি বাতাসে উড়ছিল। লালনের কাঁধে একটি বছর তিনেকের খোকা। উমার বাঁট টেনে কেজি দুই গাঢ় দুধ বের করল লালন। তারপর বলল, গাইটার মন ভাল নাই। ওর তরিবত চাই বাবু।

এত হুজ্জোতের পর দুধ পেয়ে অনাথ শাস্তার দিকে তাকাতে পারলো। একদম নিজেদের গরুর দুধ। চোখের সামনে দোয়া। শাস্তার হাতে তুলে

দিতে দিতে অনাথ উদাসীন ভাবে বলল, টুকু আর লিলিকে এক গ্লাস করে গরম দুধ দিও।

তখন কাঠের মিস্ত্রী ভাঙা পাল্লা জুড়তে বাটালি আর হাতুড়ি নিয়ে পড়েছে। মদন ত্রিপল পাঠাতে বলে এসেছে ডেকরেটরকে। আজ ভালো বৃষ্টি হবে। উমা, কানাই তো খোলা আকাশের নীচে থাকতে পারে না। দু'তিন দিনের ভেতর গোয়াল তুলে ফেলতে পারলে তখন ত্রিপল ফেরত দিয়ে দেওয়া যাবে।

লালন বলল, এ গাই আপনাকে বাবু আর তিন হপ্তা দুধ দেবে। তারপর একদম শুখো হয়ে যাবে।

কারণটাও নিজেই বলল। এটা হোল গিয়ে অক্রুরবাবুর সেই গাই। বার বার তিনবার পাল ঝেড়ে ফেলেছে। কোন ভারী বিমারি আছে।

গাভিন না হলে দুধ দেবে না?

হেসে ফেলল লালন। বাবু, এ দুধ যা পেলেন—তা ওই বাছুরটা হবার পর যেটুকু পড়ে আছে তাই। বাছুরও বড় হবে—দুধও মরে যাবে। আবার পাল ধরলে, গাভিন হলে, বাছুর হলে তবে দুধ দিতে শুরু করবে।

বিমারিটা কি লালন? সারানো যায় না?

মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে ওর।

কেন?

কেউ হয়তো বাবু অপমান করেছে। ঠিক মনে করে রেখে দিয়েছে বাবু। গরু সে জাতই নয়। মনে মনে ভেকে যাবে।

তা ওর মনটা ভালো করে দাও না। কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাব?

তাতে হোবে না বাবু। আপনাকে একটা সরবৎ খিলাতে হোবে।

আমি খাবো?

না বাবু। খাবে আপনার গাই।

বানিয়ে ফেল সরবৎ।

ঘণ্টাখানেকের ভেতর প্রায় বাইশ টাকা দামের সরবৎ লালন একটা বালতিতে করে উমা আর কানাইয়ের সামনে ধরলো। মিছরি, ঘি, আদা, দারচিনি মিশিয়ে তৈরি। পাগলা বাতাসে সে গন্ধ চারিয়ে যাচ্ছিল। উমা একবার মুখ দিয়ে সরিয়ে নিল। কানাই অনেক ঠেলাঠেলিতেও বালতির কাছেও গেল না।

শান্তা তখন ক্ষেপে লাল। অনাথকে বলল, এ সরবৎ এখন তোমায় খেতে হবে। কোত্থেকে একটা খুঁতো গরু কিনে এনে এখন গুচ্ছের টাকা জলে দেওয়া।

অতখানি ভালো ঘি—তাও জলে গেল !

এই সময় লালন উমার পিঠের চামড়া খানিক খামচে ধরে ছেড়ে দিচ্ছিল আর বলছিল, দেখুন বাবু। এ গাইয়ের এখনো আশা আছে। যেই মুঠো ছাড়ছি—অমনি আপনার গাইয়ের পিঠটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আশা আছে মানে কি লালন ?

পাল খাবে বাবু। সময় হলেই আবার খাবে।

শান্তা প্রায় ঝগড়া করে লালনকে তাড়ালো। মদন-বদন পুকুরঘাটের কয়েকটা গাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে ত্রিপলটাকে এখন তাঁবু করে ফেলেছে। বলাই তার নীচে গর্ত করে তুই গামলা বসিয়েছে। যাবার সময় লালন বলল, গাইটার মন আগে ভালো করে দিন বাবু।

বারান্দার নীচেই বালতি। অত ভাল সরবৎ। নষ্ট হবে ? টুকু বলল, আমরা একটু একটু খাবো ?

লালন তখন গিয়েও যায়নি। শান্তা বাড়ির ভেতরে গেছে দেখে লালন মুখ-খানা মধুর করে উমার চোখে চোখে তাকালো। অনাথের বয়সী হবে লালন। গায়ে খাকির হাফশার্ট। পরনে ছেঁড়া লুঙি। পায়ে ফিতে খোলা বুট। গালে অনেক রকমের কাটা দাগ। মেঘলা আকাশের নীচে ঈশ্বরীতলায় বাতাস চিরে ফেলে লালন গাইতে লাগলো—

রে কান্‌হু রে। তোরি বগয়ার কৈসে কাটে রাতিয়া—আ—আ—

কাঁধের ছেলেটা চমকে গিয়ে লালনের মাথার চুলগুলো খামচে ধরেছে। মিস্ত্রী থেকে শুরু করে বাঘা অব্দি যে যেখানে ছিল—সে সেখানেই স্তব্ধ হয়ে লালনের দিকে চাইলো।

টুকু তার বাবুর কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে চলে যাচ্ছিল। সেও দাঁড়িয়ে পড়েছে তার পাশে এখন শান্তা আর লিলি। সামনে বাঘা।

বড় উকিল যে-ভাবে জজের দিকে তাকিয়ে সওয়াল করে—ঠিক সেই ভঙ্গীতে লালন ঝাঁ উমার দিকে তাকিয়ে হাতখানা তুলে গাইতে লাগল। মুখে রসিক নাগরের হাসি। চোখে মিষ্টি বিনয়। মোষ যারা পোষে তাদের রাত থাকতে উঠতে হবেই। লালন নিজের হাতেই সব করে। এক মাসের মত বউ গত। চোখ দুটো কোটরে। সে চোখে লালন লাল পেনসিলে আণ্ডার লাইনের কায়দায় কাজল টেনেছে। এগারোটা কুড়ির ট্রেন এল শেয়ালদা থেকে। বোঝাই যাচ্ছে—লালন উমার হৃদয়ের কাছে অ্যাপিল রাখছে।

লালনের গান ঈশ্বরীতলার কোম্পানি বাঁধে গিয়ে আছড়ে পড়ছিল। মানুষের ভাষায় গাইতে গাইতে লালন গরুর ভাষায় চলে গেল। সুর একই থাকলো।—

উহু। উহু। হুহু। হ-ল-ল-ল—হু-উহু—আ—

উমা খাওয়া থামিয়ে লালনের দিকে মুখ তুলে তাকালো। চোখে একটা আকুল ভাব। কি করি। কি করি!

লালন গান থামিয়ে বিজয়ীর ভঙ্গীতে সবার দিকে তাকালো। বঙ্গালে আস বার আগে বাবু তিন মাস হামি সমস্তিপুরে গানে ট্রেনিং নিলম্।

শান্তা জানতে চাইলো, গরুদের গান?

না মাইজী। ভোজপুরী কীর্তন। রেওযাজটা ছাড়িনি মাইজী। শেষে মুখ হাসি-হাসি করে লালন বলল, হামি হপনার গাই দেখ ভাল করবো। দুয়ে দিব। আমায় এখানে থাকতে দিবেন? হপনার তো অনেক জাযগা। হামার ভৈসাগুলো থাকবে, চরবে, খাবে

শেষে জায়গাটা নরক হবে। দরকার নেই। তুমি যাও তো লালন।

যাবার সময় লালন অনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, হামি আবার আসবো বাবু।

তারপরই দেখা গেল, ছেলে কাঁধে লালন থট থট করে কোম্পানি বাঁধ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। একটুক্ষণের ভেতর যে যার কাজে লেগে গেল। বাড়ির ভেতর থেকে শান্তা ডাকছে—এই টুকু, গরম দুধ খেয়ে যা।

ফাঁকা দেখে অনাথ উমার দিকে তাকালো। উমাও তার দিকে। অনাথ আরেক গ্রাস ছেঁকে নিল। মুখে দিতেই মাড়ির ভেতরটা চিন্ চিন্ করে নেশা আসছে জানিয়ে দিল। অনাথ মাঝারি গলায় বলল, হাম্বা—

উমা মুখ তুলে পরিষ্কার গলায় বলল, আমি তোমার কাছেই থাকবো। আরেকটু যত্ন করো।

অনাথ বলল, হাম্বা—আ—অ—

উমা শুনলো, ধন্যবাদ।

অনাথ আবার বলল, হাম্বা—আ—অ—

উমা বললো, খাও না। আমি তো সরবতের বালতিতে মুখ দিয়েই তুলে নিয়েছি। অতটা জিনিস নষ্ট করতে নেই।

নীচু বারান্দায় বসে ছিল অনাথ। তার পাশেই মাটিতে সুগন্ধী সরবতের সেই বালতি। অনাথ চারদিকে তাকিয়ে বারান্দায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তার

পর গলাটা নামিয়ে সরবতের বালতিতে মুখ দিল। চমৎকার! ভারী সুন্দর তো খেতে।

টুকু একটা গ্লাস হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল। আমায় একটু দাও বাবু। সবটা তুমি খেয়ো না।

টুকুকে দিয়ে অনাথ আবার বালতিতে মুখ দিল।

বলাই ছুটে এসে বালতি সরিয়ে নিল। পেট ছাড়বে দাদাবাবু। গরম জিনিস। বৌদিকে বলে দেব?

তাহলে তোর চাকরি থাকবে না এ বাড়িতে।

চাকরি যায় যাক। তুমি টুকুদিদিকে এ জিনিস খাওয়াচ্ছো কি মনে করে? অ্যাঁ! বলতে বলতে টুকুর হাত থেকেও গ্লাসটা কেড়ে নিল বলাই। তারপর বালতি সুদ্ধ বাকী সরবৎটা উমা আর কানাইয়ের গামলায় মিশিয়ে দিল।

সন্ধ্যে থেকেই সাঁই সাঁই বাতাস। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো সারাদিন বড় হয়ে উঠেছে। অকালের বৃষ্টিতে আকাশটা ঘোলাটে করে দিল। নির্বিকার কানাই। নির্বিকার উমা। তারা জাবনা পেলেই খুশী। বাতাসের দাপট ওদের তাঁবুর ওপর দিয়ে স্লিপ খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

কাঠকুটো, কয়লার বড় ঘরটাই এখনকার মত গোয়াল করা হবে। অনাথ আলো জ্বেলে বসে টালির হিসেব করছিল। শোবার ঘর। সাইজে বেশ বড়। এক কোণে লেগহর্নদের খাবার বোঝাই বস্তা। সারাদিন ঘরে থাকতে থাকতে একঘেয়ে লাগছিল অনাথের। এখন স্টেশন বাজারে গেলে কারও না কারো সঙ্গে দেখা হবেই। টুকু সবার আগে ঘুমিয়ে কাদা হয়। এ বাড়িতে জেগে থাকা পাখির নাম—লিলি। ও নাকি রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পুকুরে মাছের লেজের ঘাইয়ের শব্দ শুনতে পায়। শান্তা গরম মসলা দিয়ে আলু-পটলের ডালনা রাঁধছিল।

ছন্ন দিয়ে বাতাস ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোম্পানি বাঁধ অন্ধকার। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো এলোমেলো হয়ে পড়ছিল। বিদ্যুতের ঝকমকিতে অনাথ দেখতে পেল ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ এসে আকাশে দল পাকাচ্ছে। এরা সাধারণতঃ সমুদ্রের আকাশে চরে বেড়ায়। বেশ খানিকটা অন্ধকার। আবার লেভেল ক্রসিংয়ের মুখে পঞ্চাননতলায় এসে ইলেকট্রিক পাওয়া গেল। যেখানটায় কীর্তন হয়, নাম-গান হয়—পঞ্চাননতলায় সেই চাতালে পঞ্চানন অপেরার নতুন পালার রিহা-র্সেল হচ্ছে। টিনের ছাদে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো স্টোনচিপের টুকরো হয়ে পড়ছে

আর শুধু খটাং খটাং। অপেরার অধিকারী—জুতোর দোকানদার জগেন।

অনাথকে দেখে সে ডিবে থেকে এক খিলি এগিয়ে দিল। অনাথ ভয়ে ভয়ে মুখে দিল। জানে, এক্ষুনি চুনে কিংবা পানের ঝাঁজে মুখটাই নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ভদ্রতা! কি করবে? ঈশ্বরীতলায় সব পাওয়া যায়। যায় না শুধু মিঠে পাতার পান।

অনাথদা একটা অভিযোগ আছে তোমার বিরুদ্ধে। তোমার ওই বাঘাকে সামলাও। রোজ সন্ধ্যেবেলা রিহার্সেল শুনতে আসে। আসলে অবিশ্যি ভোগের প্রসাদ পেতে আসে—

তাতে অসুবিধে কোথায়?

ওর জ্বালায় আমরা যুদ্ধের সিন মহলা দিতে পারি না। আলিঙ্গন, কোলা-কুলি, বাহুবন্ধন দেখলেই গজরাবে; আর কান-ফাটানো ঘেউ ঘেউ। এভাবে রিহার্সেল চলে? দূর থেকে যারা আসে তারা তো ভয়েই অস্থির। হিস্টো-রিকাল মিলিটারি পালা। সেনাপতি অর্বুদ সিংহ অট্টহাসি দিয়েছে কি বাঘা ঝাঁপিয়ে পড়বে—

বাড়িতে বেঁধে রাখলে কাঁদে। আর বাইরে বেরোলে সিংহ! কোথায় সে?

মেরো না। তোমায় দেখতে পেয়ে প্রম্পটারের পেছনে এখন ঘাপটি মেরে বসে আছে। কথা বলতে বলতে জগেন আবার রিহার্সেলে ভিড়ে গেল। সে রানী বিদ্যাময়ীর রোলে ডায়ালগ দিতে লাগলো। গলার স্বর পালটে গিয়ে তার মুখ দিয়ে—'নাথ' কথাটা বেরিয়ে এল। পঞ্চাননতলার মাথার ওপরে একটা বুনো তেঁতুলগাছ ডালপালা ছড়িয়ে অনেক জায়গা অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে আছে। দিনের বেলা দেখা যায়—তার মগডালে শিবের ধ্বজা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। এই জায়গাটা ঈশ্বরীতলার মানচিত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ। এখানকার যুবকরা মোজা দিয়ে পাম্পসু পরে বিয়ে করতে যাবার পথে এখানে ঢিপ করে মাথা ঠোকে। আর বউ নিয়ে ফিরলে এখানেই জোড়ে প্রণাম করে।

মিষ্টির দোকান থেকে দুখানা জিলাপি কিনে বাঘাকে দিল। আকাশের গতিক সুবিধের নয়। প্রায় দোকানই ঝাঁপ ফেলে সকাল সকাল তবিল মেলাচ্ছে। অভয় পেয়ে বাঘার চলাফেরা এখন একদম যেন—বাপের সঙ্গে হাটে এসেছে। এটায় মুখ দেয়। ওটায় লেজ ঘষে। কারো জামার ঝুল পকেটে মুখ লাগিয়ে বিষম চমকে দেয়। ভয় কি! বাবা আছে তো সঙ্গে। সে সামলাবে।

যা চেয়েছিল। অক্রুরকে দোকানে পেল অনাথ। গরুর কোন গণ্ডগোল আছে অক্রুরবাবু? সত্যি করে বলুন। আমি টাকা ফেরত চাওয়ার লোক নই।

নিখুঁত গাই অনাথবাবু। বাছুর দিলে দেখবেন কতটা দুধ হয়। আর এই দামে এমন গরু কোথাও পাবেনও না।

শুনলাম পাল ঝেড়ে ফেলে।

ফেলেছে ঠিক। কিন্তু ধরাতে পারলে নির্ঘাৎ দশ কেজি দুধ। বাছুর হবে অ্যাই মস্ত—

কিন্তু পাল যদি না রাখতে পারে—

চিন্তা করবেন না কোন। ও গাই আবার ডাক নেবে। আমরা বুড়ো-বুড়ী আর গাইয়ের যত্ন নিতে পারি না। তাই বেচলাম। নাহলে কে ছাড়ে এমন গাই।

ডাক নেবে মানে?

সময় হলে গাই ডাকে অনাথবাবু। পূর্ণিমা অমাবস্যায় ডাকে। তখন আপনাকে রেডি থাকতে হবে। উঠি। এবারে ঝাঁপ টানবো।

পরদিন সকালেও বৃষ্টি গেল না। বাতাসে ঠাণ্ডার ছাট। আকাশ ঘোরালো। পেটব্যথার ভান করে লিলি বিছানায় মটকা মেরে পড়ে আছে। স্কুলের টাইম পেরোলেই সিংহী হবে। টুকু বলাইয়ের পাশে পুকুরঘাটে বসে পাতিহাঁসদের ঝিনুক ভেঙে খাওয়ানো দেখছিল। বলাই এ কাজটা খুব ভালো পারে। এভাবে খাওয়ালে ওরা বয়স না হতেই ডিম দিতে শুরু করে। উমা কানাইকে নিয়ে পাশাপাশি বসে ঘুমোচ্ছিল। অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে ওরা। গোবর সরিয়ে নেওয়ায় জায়গাটা তকতক করছে। কারণ ঘাস চেঁচে দেওয়ায় গোবরের প্রলেপ একদম নিকানো লাগছে।

টুকু, স্কুলে যাবি না?

আজ কোন পড়াশুনো হবে না বাবু। শুধু গপ্প হয় ক্লাসে।

পড়া না জেনে কাল স্কুলে গিয়ে হয়ত শুধু শুধু মার খাবি। আজ বরং যা।

কোন কূট তর্কে না গিয়ে টুকু সরল সমাধান করে দিল। তাহলে কালকেও স্কুলে যাবো না বাবু। তাহলেই তো হোল। খুশী তুমি?

ব্যাপারটা তো তোর টুকু। পরশু যদি দিদিমণিরা মারে?

পরশুও না গেলেই হবে। তাহলে তো আর কোন অসুবিধা থাকবে না।

অনাথ তাকিয়ে দেখলো, টুকু আর বলাইয়ের মাঝখানে সমঝদারের ভঙ্গীতে দু'পা সামনে ছড়িয়ে বাঘা শুয়ে আছে। যে যখন কথা বলছে—তখন তার মুখের দিকে তাকায় আবার। শাস্তার বজ্জাত হুলোটা লম্বা ঘুম দিয়ে আবার ডানকাতে ফিরলো। চোখ বোজা। আরও খানিকক্ষণ ঘুবোবে। এখন ডাকলেও উঠবে না। বৃষ্টিটা ধরলে তবে গোয়ালের কাজে লোক লাগানো যেত। এখন শুরু করলে মজুরির টাকা বেরিয়ে যাবে। কাজ এগোবে না একটুও।

ঘুরে স্টেশন বাজারের ভেতর দিয়ে ঝাঁজর আর বড ড্রামের আওয়াজ বাসের টাইম অফিসের দিকে এগোচ্ছে। মাঝখানটায় বাঁশবাগান, বসতবাড়ি বলে কিছু দেখা যাচ্ছে না। সার্কাস এলে এরকম বাজে। সিনেমায় নতুন ছবি এলেও এই এক বাজনা। যাত্রার জন্যেও এই। আর বাজে বরের পার্টির সঙ্গে—রিকশা সাইকেলের মিছিলের আগে আগে। এই হল গিয়ে ঈশ্বরীতলার রেওয়াজ। পাঁচ সাত দশ মাইলের ভেতর যাত্রা বা সার্কাসের তাঁবু পড়লে এ রকম বাজনা মোটামুটি মাটির রাস্তা ধরেও গাঁযের ভেতরে ঢুকে যায়। সঙ্গে পাতলি কাগজে ছাপা হ্যাণ্ডবিল বিলোনো হয়।

ঈশ্বরীতলার এখন নিজের জিনিস বলতে অনেক কিছু। এই ব্যাণ্ডপার্টি। পঞ্চাননতলা। রেল স্টেশন। ব্যাঙ্ক। পঞ্চানন অপেরা পার্টি। একাম্নোটা গম কল। কলেজ। হেলথ্ সেণ্টার। সাঁইত্রিশখানা রিকশা সাইকেল। একটি ইরিগেশন ক্যানেল। তার ওপর আলকাতরা মাখানো কাঠের পুল। সেভেন সাইডেড্ খেলার গ্রাউণ্ড। ছায়াবাণী সিনেমা। সাদা গির্জে। ঈশ্বরীতলার আর আছে একজন এম এল এ

ভোরে লালন এসেছিল। এখানে সে মোষ নিয়ে থাকতে চায়। তার নিজের বাচ্চা পাঁচটি। অনাথ বলেছে, তার প্রস্তাব ভেবে দেখবে। তখনকার মত লালন তবে দুয়ে দিয়েছে গাই। আজ মেপে দেখা গেল, এখনো প্রায় পৌনে তিন কেজি দুধ দিচ্ছে উমা। বৈঠকখানার দরজার পাল্লাও ঠিক হয়ে গেছে। শুধু রং মেলানো বাকি।

তিন দিন ধরে এ কি আশ্চর্য আবহাওয়া যাচ্ছে। আকাশটা ধরে আছে অসময়ে। অনাথ অফিসে না গেলেও পৃথিবী থেমে নেই। ঈশ্বরীতলাও থেমে নেই। পুকুর থেকে ভাসন্ত অরুণ বরুণ পরিষ্কার গলায় জানতে চাইলো, বসে বসে সময় নষ্ট করছো কেন অনাথবাবু? নিজের কাজ করো। নিজের কাজ।

এ-ঘরের জানলা দিয়ে রাজহাঁস দুটোকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ওরা আবার বলল, নিজের কাজ করো।

অনাথ ফাঁকা ঘরে 'কোঁয়া-য়া—' বলে ডেকে উঠলো।

শান্তা মাটিতে বসে লাউ কুটছিল। বুড়ো লাউ। উমা আর কানাইকে লাউ আর খুদ দিয়ে জাউ রেঁধে দেবে। তাতে নাকি দুধ বাড়ে। সেখান থেকে অনাথকে বলল, ওরকম করছো কেন?

শ্লেষ্মা।

কাশি বুঝি ওভাবে বেরোয়?

গলা খাঁকারি দিয়ে দেখছিলাম শান্তা। যদি বেরোয়—

ও কি আওয়াজের ছিরি!

অরুণ বরুণ কিন্তু শুনতে পেয়েছে। তারা শুনেছে, অনাথ কখনো বসে থাকে না। অনাথ কখনো বসে থাকে না।

পুকুর থেকে জবাব এল, ধন্যবাদ! ধন্যবাদ অনাথ!!

সবাই শুনলো, কোঁয়া-যা-ক!

অনেকদিন পরে অনাথবন্ধু বসু কাঠের হাতবাক্স থেকে তার ডাইরি নিয়ে বসলো। প্রায় তিন সপ্তাহ একটা আঁচড়ও কাটেনি। ঠিক এখন ঈশ্বরীতলাও পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সে সূর্য অবশ্য মেঘের আড়ালে। একটু আগে রেডিও বলেছে, বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ সরতে সরতে চট্টগ্রামের দিকে যাচ্ছে। এ আবহাওয়া অচিরেই কেটে যাবে।

অনাথবন্ধু লিখলো—

আমার গৃহপালিত পশুদের মধ্যে পাতিহাঁসগুলিকেই আদৌ কোন যত্ন করি না। উহারা উপেক্ষিত। সন্তানদের মধ্যেও লিলির উপর কোন যত্ন নেওয়া হইতেছে না। লিলিও উপেক্ষিত। উহার মনে নিশ্চয় এই ভাবনাটি গাঁথিয়া বসিয়াছে।

আমি একদা ছিলাম এক নম্বরের শহুরে। সেই আমি ঈশ্বরীতলায় উঠিয়া আসিয়া পাড়াগাঁ, আধা-গঞ্জ এলাকার রস শুষিয়া নিতে শিখিতেছি। জীবন এখানে প্রত্যক্ষ। এখানেই চাঁদকে দেখিতে শিখিলাম। সূর্যকে চিনিতেছি। নির্জনতা বসিয়া বসিয়া অনুভব করার জিনিস। মানুষের হাসিতে আকাঙ্ক্ষা ফেনা হইয়া ভাসিয়া ওঠে। আমার সুবিধা, আমার স্ত্রী সেকথা জানে না।

মহাভারতের পর যে মহাকাব্যের পাতা উলটাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম

—তাহার নাম ঈশ্বরীতলা। এখানকার বাতাসে নুন আছে। প্রখর সূর্য অল্পদিনে তামাটে করিয়া দেয়। খেজুর নামক একটি রুক্ষ গাছের ভিতর দিয়া আমি ঈশ্বরীতলার পাতালের রস খাইতে শিখিতেছি।

বাঘা প্রভুভক্ত। উমা কৃতজ্ঞ। শুক্ক নম্র। লেগহর্নগুলি চপল। অরুণ বরুণ আমারই মত বাতাসে আলোর গন্ধ পায়। শাস্তা শাস্ত, থমথম করিতেছে। এত পুরস্ত। এত ভরস্ত। কখনো কখনো মনে হয়—বুঝিবা ও অন্য কোন বৃক্ষের বিষাক্ত কুঁড়ি।

কলম তুলে অনাথ ক্যানেলের ওপারে তাকালো।

টানা তিনদিন আচমকা বৃষ্টি পেয়ে বাঁশবাগানের গোড়াগুলো ঘন কালো হয়ে উঠেছে। সেখানে দু'জন বেওয়া মানুষ পরনের থান সামলাতে সামলাতে বাঁশের কোঁড় খুঁজছে। দু'জনের হাতেই ছোট দা। এই বিশাল ঈশ্বরীতলায় চারদিকের গাছপালাই সবুজ হতে হতে কালো হয়ে উঠছে। তার মাঝখানে ঐ দুই বিধবার অশক্ত দুখানি হাতে খাবারের জন্যে মরীয়া সন্ধানে দুখানি দা এত করুণভাবে উঠছে, পড়ছে—যে দেখলেই বোঝা যায় এই ঈশ্বরীতলা অতি নিকট ভবিষ্যতে ওদের গ্রাস করে নেবে

ঈশ্বরীতলায় আসিয়াছিলাম এই ভাবিয়া—নির্জনে খোলামেলায় বাসা বাঁধিব। নিজের সন্তানদের বৃক্ষজননী হইতে মানুষজননী পর্যন্ত অদৃশ্য কিন্তু সংযুক্ত রেখাটির সহিত পরিচয় করাইয়া দিব। যাহা ভাবি নাই—তাহাই ঘটিয়া গিয়াছে কিন্তু টুকু গাছপালাদের মতই ভ্রূক্ষেপহীন, নিষ্ঠুর, অবুঝ হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। সে যে কোন মুহূর্তে ঘুম হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে সাতটি সিংহকে চরিতে দেখিলেও নির্বিকার, নির্ভয় থাকিবে অন্যদিকে লিলি তাহার নিজের মনের উঠানে বসিয়া সব সময় ভাবিতেছে—বাবা আসলে কাহাকে বেশী ভালবাসে?

এখানে লেভেল ক্রসিংয়ের এই পাশে ঈশ্বরীতলার মাটিকে ঘাস ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মেঘ রোজ বিকালে ইহারই আকাশ দিয়া বেড়াইতে যায়। এই-খানে আমার স্ত্রী শাস্তা থাকে। ও নানা প্রকারের সুখ এবং নানা প্রকারের দুঃখ একটু একটু করিয়া পাইতে জানে। দুপুরে ঘুমাইলে ওর মুখ ভরিয়া যায়। আবার রাত আটটা নাগাদ নাকের দুই পাশ দিয়া সময়ের দুইটি দাগ পড়ে। গীতা চণ্ডীর মত শুনাইবে—কাল নিঃশব্দে সতত সব কিছু হরণ করিতেছে।

ঈশ্বরীতলায় অনাথদের বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। এ ক'বছরে সে অন্ততঃ

গুখানা এমন মোটা ডাইরিতে নানা কথা লিখে রেখেছে। একবার রথের মেলায় শান্তা তাকে একটি কাঠের হাতবাক্স কিনে দিয়েছিল। ডাইরিগুলো তাতে থাকে। একবার একখানা ডাইরির ওপর লিখে রেখেছিল—'জীবনের মানে'। এখানে সে বাতাসের ভেতর আলো দেখতে পায়। রোজ ভোরবেলা উঠে পরিষ্কার বুঝতে পারে—এখন তার খরচের জন্যে সামনে টাটকা, আনকোরা একটা পুরো দিন পড়ে আছে। রোজকার ভোরবেলার সূর্যের আলো তার নতুন লাগে। এইভাবে কত কোটি বছর ধরে দিন আসে সকালবেলা। তার মাঝখানে এই সংসার করা আসলে একটি নিরর্থক খেলা। ব্যাপারটার আলুনি দোষ যাতে ধরা না পড়ে সেজন্যে কটু কথায় মেশানো একজন বউ থাকে। তার ছেলেমেয়ে হলে দয়ামায়া জিনসটা পেঁপের আঠা হয়ে গড়াতে থাকে। তাই দিয়েই কোন-ক্রমে জোড়াতাড়া দিয়ে একটা সংসার। নয়তো ধাড়ি ছাগল গুল্লার জন্যেও তার মন খারাপ হয় কেন? কেনই বা অরুণ বরুণের ভবিষ্যৎ ভেবে অনাথ চিন্তিত হয়? একদিন বুড়ো হলে ওদের এই লাবণ্য আর থাকবে না। টুকু বুঝি এই জলে পড়লো—এই গাড়ি চাপা পড়লো—এমন ভয়ই বা হয় কেন তার?

অনাথবন্ধু বসু বুঝলো, তার জীবনটা এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। আর এগোচ্ছে না। উনচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত এতগুলো স্টেশনের সব জায়গার কথা মনে নেই তার। একটা জংশনের নাম—বাবা। একটা বড় স্টেশন ছিল —মা। এসব জায়গায় সে জল খেতে নেমেছে। চা খেয়েছে। চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়লে ওখানে নেমে স্টেশনের কল থেকে জলের ছিটে দিয়েছে।

॥ চার ॥

উমা ডাক দিল বিকেল সাড়ে তিনটেয়। ওটা যে ডাক—গোড়ায় অনাথ বুঝতে পারেনি। বাড়িসুদ্ধ সবাই ভাতঘুমে ঢুলছিল। টিপটিপ বৃষ্টি। তবে আকাশ পরিষ্কার হওয়ার লক্ষণ ফুটে উঠছিল। অনাথ পরিষ্কার শুনতে পেল, উমা বলছে, অনাথবাবু, ষাঁড় আসুন।

প্রথমে ভেবেছিল, অক্রুর বুঝি নিঃশব্দে এসে দরজা খোলা পেয়ে তাকে ডাকছে। তারপর যেন দৈববাণী হয়ে কথাটা তার কানে আবার এল। অনাথবাবু, ও অনাথবাবু, ষাঁড় আসুন।

ওড়াক করে উঠে বসলো অনাথ। অমনি উমার গলা পেল। অনাথবাবু,

ষাঁড় আনুন।

খাট থেকে নামতে নামতে অনাথ বেশ চেঁচিয়েই বলল, হাম্বা—আ—আ—

উমা শুনলো, যাচ্ছি—

ঘর থেকে বেরিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা হল। সেও অনাথকে ডাকতে এসেছিল। চোখটা অস্থির। পুকুরপাড়ে এসে দেখে, বৃষ্টি প্রায় নেই। তিনদিনের বাসি এক রকমের ফ্যাকাশে রোদ উঠেছে। কানাই তার মায়ের কাছ থেকে যতটা পারে দূরে সরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে ভয়। উমা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। যোগিনীর ভঙ্গী। শরীর একটুও নড়ছে না। চোখ থমথমে। অনাথকে দেখেই বললো, ষাঁড় আনুন।

মদন বদন মাঠের ভেতর দিয়ে এদিকেই আসছিল। উমার গলা শুনেই মদন ছুটতে ছুটতে এল। আজ দুধ দোয়া হয়েছিল বাবু?

সকালে এসে লালন দুয়ে দিয়ে গেছে। খুব ভোরে।

তোমার ভাগ্যি ভালো বাবু। গাই ডাক নিয়েছে।

তা তো বুঝলাম। এখন করা কি।

বদন বলল, অক্রুর বাঙালের কাছে যাও। গাইয়ের ইতিহাস ও জানে।

শব্দ পেয়ে শান্তাও উঠে এসেছে। বিকেলবেলার চা বানিয়ে অনাথের হাতে কাপ ধরিয়ে দিল। তারপর বিকেলের ঘুম ভাঙা গলায় চেপে বলল, এত হাঙ্গামা জানলে কেউ গরু পোষে।

অভ্যেস করতে হয় শান্তা। লিলি আর টুকু কোথায়?

ঘুমোচ্ছে।

আমি একটু অক্রুরের ওখান থেকে ঘুরে আসছি।

তাড়াতাড়ি আসবে। এত ঝামেলা আমার ভালো লাগছে না।

বলাই ঘুম ভেঙে উঠে এসে বলল, ও বাবু, তোমার গাই যে ডাকছে! সুখীর খবর!

হ্যাঁ। আর চেঁচাতে হবে না। বলে শান্তা নিজের চায়ের কাপ নিয়ে শোবার ঘরে চলে গেল।

অক্রুর তার নিজস্ব ভেড়ির তীরে বসে ঢেউ ও বুড়বুড়ি অনুযায়ী মাছেদের স্বভাব, বয়স, চরিত্রের নিরিখ নিচ্ছিল। সব শুনে বলল, নতুন জায়গা। বদহজম কিংবা অম্বল হয়নি তো?

তাহলে তো ছেলেটারও হোতো।

বাছুরটার পাকযন্ত্র অনেক স্ট্রং অনাথবাবু। আমি ওদের নাড়ীনক্ষত্র তো জানি। গোবরের গন্ধ শুঁকে দেখেছেন?

না তো।

যদি গন্ধে আপনার মাথা ঘুরে যায়—তবে বুঝবেন, পেটের গোলমাল। তাহলে তার ডাক্তার আলাদা। মুন্সীমশাই। রিটায়ার করে নতুন পুকুরের খালপোলের পাশে থাকেন। সাত-সাতটা আইবুড়ো মেয়ে। গিন্নী সব সময় বাসন মাজছে।

অনাথ মাঝখানে থামালো। গাইয়ের কি হবে?

কোন গন্ধ পাননি তো?

অনাথ আন্দাজে বলল, না।

তাহলে—বলে অক্রূর উঠে দাঁড়াল। চলুন বারান্দায় বসে কথা বলি। পূর্ণিমা কবে গেল?

যেদিন গাই নিয়ে গেলাম—সেদিন ছিল পূর্ণিমা।

আচ্ছা। তাহলে ডাকলেও ডাকতে পারে। কিন্তু এ গাইয়ের ষাঁড় পাবেন কোথায়? কাছাকাছি তো নেই। হয় সুভাষগ্রাম লেভেল ক্রসিং, না হয় বীরেন্দ্রপুর পল্লীমঙ্গল কেন্দ্র। দুটোই তো অনেক দূর। তাতে গরম কেটে যেতে পারে—

গরম?

হাঁটিয়ে এতটা পথ নিয়ে গেলে গাইয়ের পাল খাবার মন আর থাকবে না অনাথবাবু। এত যাতায়াত সব বেফয়দা হয়ে যাবে। আমি তো ভুক্তভুগী। শুধুই পয়সার জলাঞ্জলি হবে।

এমন পরিচিত দুটো কথার অমন উচ্চারণ শুনে অন্য সময় হলে অনাথ হাসি থামাতে পারতো না। কিন্তু এখন তার মাথায় বিপদ। সিদ্ধান্তের ভুলে উমার ভবিষ্যৎ পালটে যেতে পারে।

তাহলে আপনি শংকরপুর চলে যান। বিরজা ডাক্তারের চেম্বারে। বাস থেকে নেমে রিকশা নেবেন। বলবেন রাসবাড়ির মাঠে চল। সেখানে দীঘির গায়ে বিরজা ডাক্তারের চেম্বার। সন্ধ্যে অব্দি বসে। না পেলে বাড়ি চলে যাবেন। দীঘির পেছনেই। লাল ইঁটের দেওয়াল। লাল বালি। একটা বড় দেবদারু গাছ আছে উঠোনে। দু'টাকা ফি নেবে। এখুনি বাসে উঠে চলে যান।

ডাক্তার কি করবে ?

গিয়ে দেখুন না। বর্তমান বাছুরটি তো ওই ডাক্তারের হাতেই—

তাহলে বাড়ি গিয়ে বলে যাই।

দেরি হয়ে যাবে। এখুনি ট্রেনের মুখে বাস পেয়ে যাবেন।

বাসে তিন মাইল। রিকশাতেও মাইলখানেক। রিকশাওয়ালা রাসবাড়ির মাঠে শুনে বলল, গামা সার্কাসে যাবেন ?

না। বিরজা ডাক্তার।

ও:। চলুন। পাশেই তো।

রাসবাড়ির মাঠে তখন ধুন্দুমার কাণ্ড হচ্ছে। দি গ্রেট রয়াল গামা সার্কাসের নাম লেখা শালু পথে তিন জায়গায় ঝুলতে দেখলো অনাথ। বিরাট তাঁবু। তাহলে এরই হ্যাণ্ডবিল বিলি হচ্ছিল আজ ঈশ্বরীতলায়।

রিকশাওয়ালা বকবক করতে করতেই প্যাডেল করছিল। বিশাল পালোয়ান বাবু। এ হোল গিয়ে গামা পালোয়ানের সার্কাস।

আর খানিক পরেই সন্ধ্যে হবে। রাসবাড়ির মন্দিরের চূড়ো দূরে পেছনে দেখা যাচ্ছিল। সামনের মাঠে সার্কাসের তাঁবু। তার পাশেই বিরাট দীঘি। দীঘির গায়ে বিরজা ডাক্তারের টিনের চেম্বার।

রিকশা থেকে নেমে অনাথ দেখলো, বন্ধ। একখানা টিনের গায়ে সাদা রঙে লেখা—সরকারী কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র। তার নীচে লেখা—ডাঃ বিরজা দত্ত।

বাজার এলাকা। দোকানে দোকানে ভিড়। সবে আলো জ্বলে উঠছে। তিনদিনের টানা বৃষ্টির পর রোদ উঠেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। রবারের স্ট্রাপেণ্ডল পরে এসেছে অনাথ। সব সময় পা পিছলে যাবার ভয়।

রিকশাওয়ালাই বলল, দীঘির পাড় দিয়ে হেঁটে যান বাবু। ডাইনে সার্কাসের তাঁবু। পেছনেই ডাক্তারবাবু থাকেন।

সার্কাসের তাঁবুর ভেতর থেকে জগঝম্প বাজতে শুরু করেছে। খানিক বাদেই সন্ধ্যের ট্রিপ শুরু হবে। শান্তা এখন টুকু আর লিলিকে কীভাবে সামলাচ্ছে কে জানে! উমা নিশ্চয়ই ডাক থামায়নি। ডেকেই যাচ্ছে হয়ত। নিষ্কম্প পাথর হয়ে দাঁড়ানো গাইয়ের গলায় অমন স্তব্ধ ডাক যে শুনবে ফিরে তাকাবেই। তাকিয়ে দেখবে—গাঢ় করে কাজল টানা দুই থমথমে চোখ।

একটা অজানা ভয় আকাশ থেকে সোজা ছুটে এসে ওর দুই চোখে বিঁধে আছে।

দীঘির পাড় দিয়ে হাঁটতে গিয়ে অনাথের পা পিছলে যাচ্ছিল। বিশেষ করে রবারের স্যাণ্ডেল বলে। একবার তো দীঘিতেই পড়ছিল। বর্ষায় কাদা হয়ে এই কাণ্ড। সার্কাসও এমনভাবে তাঁবু ফেলেছে। পা ফেলার জায়গাটুকু রাখেনি। তাঁবুর খুঁটিগুলো মাটিতে গোঁজা। তাতে গুঁতো খেলে নির্ঘাত জলে গিয়ে পড়তে হবে। তাঁবুর ভেতরে জগঝম্প বেজেই চলেছে। হাতির ডাক, বাঘের গলার আওয়াজ সেই বাজনার সঙ্গে মিশে গিয়ে শব্দের এক আশ্চর্য সরবৎ গ্রামসুদ্ধ সন্ধ্যার বাতাসে চলকে পড়ছে। অনাথ ঠিক করল, এই ঝামেলা মিটলেই এক সন্ধ্যে টুকু আর লিলিকে সার্কাস দেখিয়ে নিয়ে যাবে। গণেশের মা ঠিকই বলেছিল। এক ঘটি দুধের জন্যে এত ঝামেলা। না হয় দু'পয়সা কমই দিতে।

• বাবা গো। বলে নিজেই চেঁচিয়ে উঠলো অনাথ। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনটে মেয়ে হেসে উঠলো হি হি করে

দীঘিতে পড়ে যেতে যেতে তাঁবুর খোঁটা ধরে উঠে এল অনাথ — বাঁচাও বাঁচাও।

আর আসবে উঁকি দিতে? ঢিল ছুঁড়তে?

আমি না। আমি না।

এখন মিথ্যে কথা হচ্ছে। গামাদা? ও গামাদা?

অনাথ থরথর করে কাঁপছিল। আগে বাঘটা সরাও—নইলে পড়ে যাব। সরাও বলছি—

জায়গাটা তাঁবুর প্রায় পেছন দিকে। দীঘির পাড় আর তাঁবুর কানাতের মধ্যে রাস্তা বলতে কিছুই নেই। অনাথ বিরজা ডাক্তারের খোঁজে অন্যমনস্ক হয়ে এগোচ্ছিল। কখন যে সার্কাসের গ্রিনরুমের সামনে এসে পড়েছে বুঝতে পারেনি।

ইলেকট্রিকের আলোয় তিনটি জাঙিয়া পরা মেয়ে দাঁড়ানো। ওপরের দিকে শুধু একটা করে কালো ব্রেসিয়ার গায়ে। সর্বাঙ্গে লাল মত রঙ মেখেছে। ওদের একজন বড় এক টুকরো কাঁচা মাংস বাছুর সাইজের একটা বাঘকে আদর করতে করতে খাওয়াচ্ছিল। এ দৃশ্য আচমকা যে দেখবে তারই বুকের ভেতরটা ধক করে উঠবে। ভরসন্ধ্যেবেলা। দীঘির কিনারায়। তিনটে সার্কাসের মেয়ে। একটা ছাড়া বাঘ। আর কে যেন বিশাল দুখানা পা দীঘির দিকে

ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে আছে। তার পরনেও জাঙিয়া। কালো রঙের। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠায় বাঘটা এক লাফে একদম অনাথের সামনে। তাঁবুর সে জায়গাটা আবার খোলা। এক হাতের ভেতর বাঘের মুখখানা। দুটো জ্বলন্ত মার্বেল দিয়ে অনাথের দিকে তাকিয়ে আছে।

অনাথ ঠকঠক করে কাঁপছিল। আর দেরি হলে সে নির্ঘাত পা হড়কে দীঘির জলে গিয়ে পড়বে। সরাও বলছি—। আর কথা বলতে পারলো না অনাথ।

গামাদা উঠে এল। স্বয়ং অরণ্যদেব। পায়ে হাঁটু অব্দি ঢাকা জুতো। কোমরে জাঙিয়ার ওপর লোহার বল্টু বসানো বেল্ট। এসেই বাঘের একটা কান ধরে সরিয়ে নিল খানিকটা। কি হয়েছে? এই কে তুই?

আমি অনাথ স্যার—বাঘ সরে যেতে অনাথ একটু উঠে এল।

মেয়েদের একজন এগিয়ে এসে বলল, এই লোকটাই রোজ পোড়া বিড়ি ছুঁড়ে দেয় রিংয়ের ভেতর। ঠিক এই লোকটাই।

তাই নাকি?

মিথ্যে কথা গামাদা। আমি কোনদিন এ সার্কাস দেখিনি।

বাঁ হাতে বাঘের কপালে একটা থাবড়া কষালো গামাদা। বাঘটা তার পেছনে সরে গিয়ে থাবা গেড়ে বসলো। গামাদা তখন ডান হাতে অনাথকে তুলে দীঘির শক্ত পাড়ে দাঁড় করিয়ে দিল। আমাদের সার্কাস দ্যাখোনি কেন?

সময় পাইনি। এবার ঠিক দেখবো গামাদা।

এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে? এদিকে তো কেউ থাকে না।

থাকে। গরুর ডাক্তার থাকে।

সন্ধ্যেবেলা গরুর ডাক্তার?

আমার গাই ডাক নিয়েছে—

গামাদা হাঃ হাঃ করে হাসিতে ভেঙে পড়ল। সেই দমকে উরুর দুই মাসেল্ থরথর করে কাঁপছে। হাসতে হাসতেই বলল, ওরে বিবি! শোন। শোন। গাই ডাক নিয়েছে—হঠাৎ ঝপ করে হাসি থামিয়ে অনাথকে বলল, যাও! আর কখনো এদিকে আসবে না।

সেই ধমকে বাঘটা চমকে গিয়ে একবার চোখ বুজে ফেলল।

অনাথ বলল, কিন্তু আমায় তো এ-পথ দিয়েই ফিরতে হবে। আমি তো আর কোন পথ চিনি নে।

মেলা বকবে না। এখুনি শো শুরু হচ্ছে। এই বিবি, সেকেণ্ড বেল পড়ে গেছে। যাও। আজকের মত যাও।

অনাথ তাঁবু পেরিয়ে যেখানে এসে দাঁড়াল— তার দশ হাতের ভেতর একটা দেবদারু গাছ। কিন্তু আশ্চর্য। অনেক উঁচু অব্দি গাছটার ডাল কেটে নেওয়া হয়েছে। গাছটা পেরিয়ে সরু মাটির রাস্তা। তার শেষে লাল ইট আর লাল টালির বাড়িটা অন্ধকারে কালো হয়ে আছে। বাড়ির বারান্দায় একটা আগুনের ফুলকি যাতায়াত করছে। বোঝাই যায় সিগারেট ধরিয়ে অন্ধকার বারান্দায় এখন কেউ খুব চিন্তিত মনে পায়চারি করছে। আর তার ঠিক উলটো দিকেই তাঁবু জুড়ে হাজার আওয়াজ, আলো, বাজনা।

অনাথ ঠিক করতে পারছিল না, ডাকবে কিনা। এখনো তার বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করছে। আস্ত বাঘের সামনে মুখোমুখি। এত কাছে—সেভিং স্টিক থাকলে বাঘটার দাড়ি কামিয়ে দেওয়া যেত।

বারান্দায় আগুনের ফুলকির যাতায়াত থেমে গেল। কে ওখানে?

আমি। আমি অনাথ। ঈশ্বরীতলা থেকে আসছি। বড় বিপন্ন হয়ে—

আমিও বিপন্ন।

আলো নেই কোন?

না। ওখান থেকেই বলুন।

আমার গাই ডাক নিয়েছে বিকেল থেকে—

যেতে পারবো না।

একবার বিরজাবাবুর সঙ্গে কথা বলব।

আমিই ডক্টর বিরজা। এখন কোন কথা বলব না।

আমি অনাথবন্ধু বসু। বড় বিপদে পড়ে এসেছি আপনার কাছে। একবার আলোটা জ্বালুন।

আমার বাড়িতে এখন আলো নেই। স্ত্রী নেই। কেউ নেই। আপনি যেতে পারেন।

অনাথের পেছন দিকে এখন আলো-ঝলমলানো আস্ত একটা সার্কাস। সামনে অন্ধকার বাড়ির দরজায় বিরজা ডাক্তার হাতের জ্বলন্ত বিড়ি বা সিগারেট মাটিতে ফেলে দিল।

আমি নিরুপায় ডাক্তারবাবু। গরু সম্পর্কে আমি একদম অনভিজ্ঞ।

আমিও নিরুপায়।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। দু'জনই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ বিরজা দত্ত জানতে চাইলো, কবে ডাক নিয়েছে? আজই?

হ্যাঁ।

এখন তো ডাকার কথা নয়। হয় পূর্ণিমা—নয় অমাবস্যায় ডাকবে। আপনি কোত্থেকে আসছেন বললেন?

বলছি। আমায় একটু বসতে দেবেন? এইমাত্র বাঘের মুখে পড়েছিলাম—

বাঘ? এখানে বাঘ কোথায়? যত্ত গাঁজাখুরি।

সার্কাসের বাঘ। আপনার বাড়িতে আসতে গিয়ে—পায়ে লেগেছে খুব।

বিরজা ডাক্তার অন্ধকারেই ছুটে এল। আসুন আসুন। দেখবেন—গর্ত আছে। ওরা বাঘ ছেড়ে রাখে? কী সর্বনাশ। জন্তুগুলোর শরীর স্বাস্থ্য কেমন আছে দেখাবার জন্যে আমায় ভিজিট দিয়ে ডেকেছিল। দাঁড়ান। বসুন আপনি এখানে। কালই গিয়ে ওদের তিনটে হাতীর ঘুম নষ্ট করে দেব।

অনাথ তখনো বাঘটার চোখ তুলে তাকানো ভুলতে পারছিল না। খাটিয়া থেকে শামাদা উঠে বসেছিল রবটের মত। বিবির হাসি। সব মিলিয়ে জাগ্রত অবস্থায় দুঃস্বপ্ন।

আমি ঈশ্বরীতলা থেকে আসছি।

ও। বুঝতে পেরেছি। আপনি অক্রূরের গাই কিনেছেন নিশ্চয়।

হ্যাঁ। বুঝলেন কি করে?

একটু গোলমেলে গাই। ও অসময়েই ডাক নেবে। ভাববেন না। ঠিক হয়ে যাবে।

গোলমালটা কোথায় ডাক্তারবাবু?

জরায়ুতে ঘা আছে। পেনিসিলিন দরকার—

আপনি একবার চলুন।

এখন তো যেতে পারবো না। আপনি বাড়ি গিয়ে একপো মুসুরির ডাল, সরষের খোল আর নুনের সঙ্গে মিশিয়ে আচ্ছা করে জলে গরম করে নিন। তার পর কুলোয় ধরে গাইকে দিন। গপাগপ করে খেয়ে নেবে এখন।

কেন?

খাওয়ালে চব্বিশ ঘণ্টা হিট্ থাকে। কাল দুপুরে আমি তৈরি হয়ে যাব। একখানা সাবান রাখবেন।

আপনি চলুন না এখন। আমি পৌঁছে দিয়ে যাব আপনাকে।

আমার যাবার উপায় নেই অনাথবাবু। ওই যে দেবদারু গাছটা দেখছেন —ওর ডালগুলো নেই কেন বলুন তো? বিরজা সিগারেট ধরালো।

সেই আলোয় মুখখানা দেখতে পেল অনাথ। দুই গাল থেকে দু'থাবলা মাংস তুলে নেওয়া হয়েছে। একখানা শুকনো মুখে দুখানা জলন্ত ক্লান্ত চোখ বসানো। বিরজা নিজেই বললো, আমার একমাত্র ছেলেকে পোড়াতে গাছটার ডাল কাটা হয়েছে -

কি হয়েছিল?

আত্মহত্যা করেছে। পরীক্ষায় বসে টুকতে গিয়ে ধরা পড়ে এই কাণ্ড। আমার স্ত্রী বাচ্চাদের নিয়ে আছেন আমার বড় মেয়ে আর জামাইয়ের কাছে। তিনি ঘন ঘন অজ্ঞান হচ্ছেন।

এই দেখুন, আপনাকে অনুরোধ করা আমার খুবই অন্যায় হয়েছে। কত বড় ছেলে?

সতেরো পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল সামনের মাসে। ভেবেছিলাম বাড়ির কাছে আপনাদের ঈশ্বরীতলার কলেজে পড়াবো। যাগিয়ে। কাল দুপুরে তাহলে যাচ্ছি। দু' ফাইল পেনিসিলিন কিনে রাখবেন

রাতে বাড়ি ফিরে মুসুরির ডালের সঙ্গে সরষের খোল আর নুন ডলে ঘসেছে গরম হয়ে গেল। হাতে ধরাই যায় না প্রায়। কুলোয় ঢেলে উমার সামনে রাখতেই গবগব করে খেয়ে নিল। পুকুরপাড়ে এক বিচিত্র দৃশ্য। ভাড়া করা ত্রিপলের তাঁবুতে গম্ভীর মুখে উমা খাচ্ছে। দূরে দাঁড়িয়ে কানাই পা টুকছে ঝিলি ঘুমে। শান্তা টুকু আর বাঘাকে নিয়ে দাঁড়ানো। বলাই উমাকে খবর এগিয়ে দিচ্ছে। তাকে সাহায্য করছে অনাথ। তখুনি তার মনে হচ্ছিল— উমার জন্যে পাকাপাকি গোয়াল দরকার। যে করেই হোক করে ফেলতে হবে। উমা গম্ভীর মুখে সব দেখছে। কিন্তু কথাটি বলছে না। অনাথ আলো নিভিয়ে দিয়ে পুকুরঘাটে বসলো। বৃষ্টি নেই। আকাশ সামান্য জ্যোৎস্না নিয়ে মুখ দেখাবার চেষ্টা করছিল।

•

আজ সন্ধেবেলা ছাড়া বাঘের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনাথ তার জলন্ত মার্বেল দুটো দেখতে পেয়েছে। কী নিষ্পাপ! কী উজ্জ্বল! কী হিংস্র! না দেখলে ভাবা যায় না। তার পাশে হাসি-পরিহাসে তিনটি সার্কাসের মেয়ে ভেঙে পড়ছিল। মাংস-বোঝাই গামাদা কেমন খাটিয়া থেকে উঠে এল সটান। আর বিরজা দত্ত বোধ হয় অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ন্যাড়া দেবদারু গাছটাকেই দেখছিল। •

বিরজা এল পরদিন বেলা একটা নাগাদ। হাতে আইস-বক্স। কাঁধের ঝোলায় যন্ত্রপাতি। খালপাড় দিয়ে লম্বা খাড়াই মানুষটা বিরাট বিরাট পা ফেলে এগিয়ে এল। চোখ দুটো সত্যিই কোটর থেকে খানিক বেরোনো। দু গালে দু চাকলা মাংস নেই। বায়ান্ন-চুয়ান্ন বয়স হবে। এসেই বলল, সাবান রেখে-ছেন তো ?

বাড়ির এদিকপার জানলা দরজা সব বন্ধ করে দেওয়া হল। অনাথ আর শান্তা আগে থেকেই পরামর্শ করে টুকু নিলিকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলেছে। বলাই উমাকে এনে সিমেন্টের খুঁটির সঙ্গে আচ্ছা করে বাঁধলো।

বিরজা ঝোলা থেকে বের করে রবারের গ্লাভস পরে নিল। তারপর হাতে সাবানের ফেনা মাখিয়ে লোকে যেভাবে বুকসেলফ্ থেকে বই পাড়ে তেমনিভাবে উমার পেছন থেকে গোবর যা ছিল সব বের করে ফেলে দিল। সেখানে একটা অ্যালুমিনিয়ামের যন্ত্র বসিয়ে তার ভেতরে বিরজা পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ ফেলে ফোকাশ দিল। দেখুন, জরায়ুতে ঘা দেখতে পাচ্ছেন ?

না দেখেও অনাথ বলল, হাঁ।

এই কারণেই গাই পাল ঝেড়ে ফেলছে।

এমনটি কেন হল ?

ডেলিভারীর সময় কোথাও কোন চোট লেগেছিল।

এখন উপায় ?

উপায় আছে অনাথবাবু। আপনি টর্চটা ধরে থাকুন। বলে বিরজা দু-ফাইল পেনিসিলিনের মুখ খুলে ফেলল। তারপর ফাউন্টেন পেনে কালি ভরার কায়দায় একটা কাচের পিচকিরিতে ওষুধটুকু তুলে নিল। সেটুকু উমার জরায়ুতে পাম্প করে পাঠিয়ে দিল। ব্যাস্। এবার আপনার ভাগ্য।

বলতে বলতে বিরজা কাঠের আইস-বাক্সটার ঢাকনা খুলে ভেতরে টর্চ ফেলল। গাঢ় ঘন ঠাণ্ডার ভেতর। কাচের পিচকিরি তাতে ভরতি করে দুবার উমার জরায়ুতে পাঠিয়ে দিল। আমেরিকায় ওহাইওর ষাঁড়ের জিনিস। রোজ ভারত সরকার এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে করে এনে গাঁয়ে গাঁয়ে পাঠান। বুঝলেন কিছু ?

অনাথ আন্দাজে মাথা নাড়লো।

বিরজা চারদিক ঘুরে উমার চার পায়ে হাত ছুঁইয়ে প্রণাম করল। কোন অপরাধ নিসনি মা। এবার আপনার গিন্নীকে এক কাপ চা দিতে বলুন।

সব হয়ে গেল এর ভেতর ?

আবার কি ! এখন আপনার ভাগ্য। পাল রাখলে রাখবে। ঝাড়লে ঝাড়বে।

এতক্ষণ শান্তা ভেতরেই ছিল। গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে বেরিয়ে এল। বিরজা তখন গল্প জুড়ে দিল। কত রকমের গাই। তাদের স্বভাবচরিত্র। মন মেজাজ। নানা বিষয়ে। শান্তা ছোট নমস্কার করে চা তৈরি করতে গেল ভেতরে।

বিরজা বলছিল, ইণ্ডিয়ায় ক্যাটেল পপুলেশন সব চেয়ে বেশী। কিন্তু অষণ্ডও সব চেয়ে বেশী। সারা মাঠে একটি অসুস্থ ষাঁড় বহু গাভীর সন্তানের জনক। এক সন্তান থেকে আরেক সন্তান এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। সেজন্যেই এই আর্টি-ফিসিয়াল ইনসেমিনেশন। সুস্থ বাচ্চা, সুস্থ মা চাই আমরা।

অনাথ একটা কথা মনে পড়ায় অবাক হল। একজন বাঙালীর ভাষা একজন আমেরিকান বোঝে না। কিন্তু এখানকার একটি গরুর ভাষা আমেরিকার গরু অবশ্যই বোঝে। কারণ মানুষের মত ওদের সভ্যতা বা ব্যাকরণ নেই। বিরজাকে বলবে কথাটা ?

কাকে বলবে ? বিরজা তখন নিজের কথাতেই মশগুল। আগে গিন্নীর কথা শোনিনি। শুনলে আরেকটা ছেলের জন্যে চেষ্টা করে দেখতাম। ছেলেটা আত্মঘাতী হল। আমাদেরও আর ছেলে হওয়ার পরীক্ষায় নামার বয়স নেই। এর নাম কপাল। পেনশন নিয়ে বুড়োবুড়ী কোথায় যে যাবো জানি না।

চা শেষ করে বিরজা উঠলো। অনাথ তার পাওনার চেয়ে বেশীই হাতে গুঁজে দিল।

এই সময়ে আপনার টাকাটা আমার কাজে লাগবে। গাইকে এ ক'টা দিন আর সরষের খোল দেবেন না। তাহলে পাল ঝেড়ে ফেলতে পারে।

বিরজা যখন খালপাড় ধরে ফিরে যাচ্ছিল, তখন অনাথের মনে পড়লো, এই লোকটিই কাল রাতে তার জন্যেসমবেদনায় ভিজে গিয়ে বলেছিল, সার্কাসের হাতী তিনটের ঘুম নষ্ট করে দেবে।

বলাই এসে উমাকে ছেড়ে দিল। গলার বাঁধন আলগা পেয়ে উমা আপন মনে ঘুরে ঘুরে ঘাস খেতে লাগল। কত সহজেই ও এ জায়গা নিজের করে নিল। নইলে ঘাসে মুখ দিত ?

স্নানটান সেরে খাওয়াদাওয়ার পর শুতে যাবে, এমন সময় শান্তা বলল,

আজ তিনদিন আফিস যাচ্ছো না, খেয়াল আছে?

আছে।

মেয়ে দুটোও স্কুলে যাচ্ছে না।

খেয়াল আছে।

তোমার না হয় যা হবার হয়ে গেছে। এভাবে চললে ওদের কি হবে ভেবেছো একবার?

ভেবেছি।

কি?

এমন কিছু না। এই খোলামেলা আকাশের নীচে একসঙ্গে এতগুলো জন্তু দেখছে। ঝড়-বৃষ্টি, রোদ-শীত—পরিষ্কার টের পাচ্ছে। এটাই কি ওদের বড় ইস্কুল নয় শাস্ত? সাঁতরায়। সর্দি হয় না। ন্যাকামি নেই। কাঁদে না। এটা কি সব চেয়ে বড় ট্রেনিং নয়?

ওরা কি তোমার মনোমত প্রকৃতির দুলালী হবে ভেবেছো?

এখনো কিছু ভাবিনি। ওদের ভাবনা ওরা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে পারে—আমি সেভাবেই ওদের তৈরি করতে চাই।

তার মানে তো তোমার সঙ্গে বসে সারারাত ধরে যাত্রা দেখবে। ভোর বেলা ভাগাভাগি করে বাঁধা ভাঁড়ের তাড়ি খাবে।

খেয়ে কি টুকুর শরীর ফেরেনি? কলকাতায় থাকতে তুতু-পুতু করে মানুষ করছিলে—চেহারাটা ছিল নড়বড়ে—কথায় কথায় আদুরে গলায় কাঁদতো। সে-সব রোগ টুকুর এখন আর আছে? লিলি কি চারদিক দেখে বয়স আন্দাজে অনেক রিজিনেবল্ হয়নি? বল?

অত কথায় কাজ নেই। আজ অফিসে যাবে না তুমি?

আজও দরজা আটকে ঘুমোবো। বিকেলে গোয়াল তৈরির ঘরামীরা এলে কথা বলতে হবে আমায় ডেকে দিও তো।

আমার বয়েই গেছে। ঘুম থেকে উঠলে আজ আমি মেয়ে দু'টোকে খুব পেটাবো।

পরে তুমিই মনে কষ্ট পাবে শাস্তা। আমি টুকুকে খুব মেরেছিলাম। মেয়ে বুঝেছি—কী অন্যায় করেছি! ওর বেড়ে ওঠার পথে আমি একটা কবন্ধ পাথরের মত বসেছিলাম এতদিন। আমি সরে যেতেই ছাখো ও কী সুন্দর বাড়ছে!

ওসব আমি বুঝি না। আমাদের মন এত নরম নয়। অত বুঝিও না।

অনাথ আর কিছু বলল না। খানিক বাদে শুয়ে শুয়ে দেখতে পেল—পৃথিবীর গায়ে আগাগোড়া মৌজা ম্যাপের লাইন টানা। ওই তো দেখা যাচ্ছে—মৌজা চন্দনেশ্বর। তারপর মৌজা দ্বারিকপোতা। এই যে মৌজা ঈশ্বরীতলা। সারা মৌজা জুড়ে উমা দাঁড়িয়ে আছে। সুঠাম শরীর। ওর ছেলে-মেয়েরা এদিক-ওদিক চরে বেড়াচ্ছে। তাদেরও বেশ তেজী গঠন।

হাঁটুর ওপর ধুতি। পায়ে কেডস্‌। গায়ে হাফশার্ট। বগলে কিছু কাগজ-পত্রের সঙ্গে ছাতা। লোকটা ঈশ্বরীতলা মৌজায় ঢোকার আগে অনুমতি চাইলো। আসতে পারি?

উমা বলল, আপনি কে?

আমি ভগবান।

উমা বলল, ইয়েস।

• এখন ঘুমের ভেতরেও উমার গান অনাথের গায়ে ঘাম দেখা দিল। এ ঘরের পাখায় ভালো হাওয়া হয় না।

পাঁচ ॥

অক্রুর বাঙালের মুদিখানায় সকাল থেকেই ভিড় । মঙ্গলবার ঈশ্বরীতলার দোকানীদের হয়ে দবিরুদ্দী গাজীর লরি যায় কলকাতায়। বড়বাজারে গন্ধ করে লরি ফেরে। মণ প্রতি এক টাকা ভাড়া। মাখনবাবুর মুদিখানার তেল আসে। বনমালী কয়ালের হার্ডওয়ারের দোকানের রঙ আসে। অক্রুরের আসে খোল, ডাল, নুন, মসলা, কাপড়কাচা সাবান, তামাক, কেরোসিন।

মদনদের বাড়ি আজ খাওয়াদাওয়া আছে। দু'ভাই মিলে সারারাত ধরে খাল ছেঁচে নানা রকমের মাছ ধরেছে। ওদের বোন ওষ্ঠকে আজ নুড়োগাছা থেকে দেখতে আসবে। বড় ভাই ভদ্রেশ্বরের বউ বলে দিয়েছে—আড়াইশো সরষের তেল এনো যেন। এত রান্না।

অক্রুর বাজারের চেয়ে দশ পয়সা কম দামে আড়াইশো তেল দিল। তার বদলে দু'মুঠো মৌরলা মাছ চেয়ে নিল ওদের কাছ থেকে। বেলা আটটা সাড়ে আটটায় স্টেশন বাজার। একদম গমগম করছে। মিষ্টির দোকানে জিলিপির বারকোশ ঘিরে শ'য়ে শ'য়ে মাছি।

রাসবাড়ির দিকে বাস যাচ্ছিল। তার ছাদে কুমড়োর পাহাড়। যাত্রাপাগল

জগেন এখন জুতোর দোকান খুলে বসে আছে। বেশির ভাগ লোকই মুগুর মার্কা রবারের স্যাণ্ডেল কেনে। বাজারে চালের পালি এখন সাড়ে চার টাকা।

লাউ শাকের সঙ্গে কাঁকড়ার মিশেল দিয়ে একটা লম্বা ঝোল। গাঠি কচু দিয়ে খেসারির ডাল। সরপুঁটির ঝোল। আর দুধের সঙ্গে ভালো গুড়। ভদ্রেশ্বর, মদন, বদন—তিন ভাইয়ের সঙ্গে ছেলের বড় ভাই খেতে বসেছে। এরা নুড়োগাছার কাপালি। সাই আর এইট চাষের তিন বিঘে ডাঙা জমি আছে। পুকুর সংলগ্ন। ছেলে এইট অব্দি পড়ে ঘটকপুকুরের বড় বাস স্টপে তেলেভাজার দোকান দিয়েছে। সঙ্গে মুড়িও বেচে। উঠতি বয়স। উঠতি অবস্থা। ভদ্রেশ্বর নিজের চোখে দেখে এসেছে।

সাইকেল, আংটি আর ঘড়ি—ছেলের জন্যে এই তিন দাবি। মেয়েকে যা ইচ্ছে দাও। ছেলের নাম বংশী কাপালি। তার দাদা হরিদাস কাপালি। বৈষ্ণব পরিবার। তিলক কেটে মেয়ে দেখতে এসেছে। আদি দেশ বাঁকাবিষ্টুপুর। কলকাতার সঙ্গে, রাসবাড়ির আদালতের সঙ্গে যা কিছু যোগাযোগ এই ঈশ্বরীতলা হয়েই করতে হয় ওদের।

মদন-বদনদের বোনটি সকাল থেকে বড়বৌদির সঙ্গে যোগাড় দিয়েছে। বিদ্যেধরীর স্রোত মুছে গেলেও ঈশ্বরীতলার বাইরে ট্রেন লাইনের ধারাধারি বিরাট বাওড় পড়ে আছে। চৈত্র মাসের ঠাটাপোড়া রোদেও সে জল ঠাণ্ডা থাকে। সকাল সকাল ওই সেখান থেকে চান করে এসেছে। চুল বেঁধেছে। তারপর বৌদির সঙ্গে রান্নায় বসেছে।

হরিদাসকে বড় রাস্তা অব্দি পৌঁছে দিয়ে ভদ্রেশ্বর ফিরে এল। আজ আর চুলদাড়ি কামানোর কাজ রাখেনি। দুপুরে অন্যদিনের তুলনায় খাওয়াদাওয়া বেশী হয়ে যাওয়ায় বাড়িশুদ্ধ লোক যা কোনদিন করে না তাই করলো। দিনে দিনে সবাই প্রায় গড়িয়ে নিল। শুধু ভদ্রেশ্বরদের বিধবা মা একখানা ছিপ নিয়ে গিয়ে ঘরের পেছনের বাঁশবাগানের গায়ে বড় ডোবাটায় বসে থাকলো। আজকাল আর মাছ না খেয়ে থাকতে পারে না বুড়ী। বড় অরুচি।

বিকেলবেলা উঠোনে তিন ভাইয়ের পরামর্শসভা বসলো। বাপকেলে ঘরের গোলপাতার ছাউনি পচে-ধচে একাকার। কড়া রোদ্দুরে তা এখন মুচমুচে। আগুন লাগলেই ছাই হবে। গোয়াল আছে—গরু নেই। এক সুবিধে—ভদ্রেশ্বরের বউটা আঁটকুড়ে। তাই সংসারে দুধ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

তিন ভাই মাথা ঘামিয়েও বের করতে পারলো না—কোত্থেকে সাইকেল,

ঘড়ি, আংটি আসবে। একবার কথা উঠলো, যজমানির জমিটা বেচে দিয়ে যদি টাকা আনা যায়। কিন্তু সারা বছরের চুলদাড়ি কাটার বিনিময়ে ওরা এ-জমি বাপের আমল থেকে ভোগ করে আসছে। এ জমি বিক্রি করা যাবে না।

একখানা সাইকেলের খোঁজ দিল বদন। রাসবাড়ির আদালত এলাকা থেকে চুরি করে আনা। নিশাপতিদের সাইকেলের দোকানে আছে ও জানে। সেখানা সারিয়ে-তারিয়ে রঙ করে নিলেই চলবে। কমের মধ্যেও হবে। কিন্তু ঘড়ি আর আংটি কোত্থেকে আসবে? খালে যদি একটা পুকুর-ভাসা আধমণি রুই কিংবা কাতলা ধরতে পারতো। তাহলে সব আসান হয়ে যেত।

সন্ধ্যের দিকে তিন ভাই তিন দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

গাল, মাথা, বগল কামানো ছাড়াও ভদ্রেশ্বরের আলাদা একটা কারবার আছে। চারদিকের খবরাখবর তাকে রাখতে হয়। ঈশ্বরীতলার কোন পুকুরে মাছ কত বড় হল। কাদের ভুঁইকুমড়ো সাইজে বেড়েছে। কোন্ বাড়ির বউঝি অসাবধানী হয়ে ঘাটলায় বাসন ভিজিয়ে তুলতে ভুলে যায়। কাদের গোলায় ধান মেপে তোলা হয়েছে এদানী। এসব বড় দামী খবর তার কাছে। জায়গা মত পৌঁছে দিলে কাজ হাসিলের পর সে ভাগা পায়। উপরি আয়। আগে এক সময় সে ডাকাতির সুলুকসন্ধানও দিত। একবার সঙ্গীন হয়েছিল সন্তোষ টাকির। বেচারা এখনো জেলে পচছে।

উমা কারো সাতেপাঁচে থাকে না। এখনো দেড় কেজির মত দুধ দিচ্ছে। গাভিন হওয়ার পর কোন গাই এতটা সদস হয় না সাধারণতঃ। কানাই তার মায়ের সঙ্গে বিকেলবেলার মাঠে ঘাস খাচ্ছিল খুঁটে খুঁটে। অফিসের কাজে শালিমার ইয়ার্ডে গিয়েছিল অনাথ। ভোর-ভোর। ফিরেছে বেলাবেলি। শান্তা তার স্বামীর স্বভাবটা এতদিনে জেনে ফেলেছে।

যত বেলাতেই ফিরুক অনাথ—বাঁধা ভাঁড়ের তাড়িটুকু সে খাবে। দু'একখান রেকর্ড শুনবে। ইদানীং বড়ে খানের ঠুমরি, দাদরার গানখানা ফিরিয়ে ফিরিয়ে শোনে। আজও শুনেছে। বেলা দেড়টা নাগাদ শান্তা খেয়েদেয়ে ভাতঘুম দেবে—এমন সময় অনাথ এল। টুকু আর লিলি ইস্কুলে। বলাই লেগহর্নদের ঘর পরিষ্কার করছিল। বাঘা সামনের লাল বারান্দায় একদম ছবির কুকুরটি হয়ে বসে। অনাথ কাপড় ছেড়ে তাড়ির ভাঁড়টা নিয়ে বসলো। ফাঁকা চারদিক। পাখিটাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। বড়ে খান আর বেঁচে নেই। তাঁর ভরাট গলা এখন

দিব্যি খাল পার হয়ে রতন ঘোষের ইটখোলার গর্তে গিয়ে পড়ল। বড় চমৎকার লাগছিল অনাথের। দু' গ্রাস খাবার পর তার বাঁ গালের চিবুকের কাছাকাছি একটা জায়গা কুঁচকে গিয়ে কাটা কচ্ছপের হৃৎপিণ্ড হয়ে দপদপ করে। এইটুকুই যা আরাম তাড়ির।

শান্তা বলল, যাও চান করে এসো। ছোট মাছের ঝোল করেছি। উমার দুধের পায়েস।

পায়েস মেয়েদের দিও। কি মাছ?

মদন বদন দিয়ে গেছে। ট্যাংরা, খলসে, চাবলি—সব রকমের মিশেল দেওয়া। ঝাল করেছি।

তাড়ির নিয়ম ওই। কখনো একগাদা খাবার খেতে নেই। শরীরটা আরামে ভারী হয়ে এলে পুকুরে নামতে হয়। চান করে মাথা আঁচড়ে ছোট মাছের ঝোল দিয়ে দুটি ভাত খাওয়া চাই। তারপর দোর আটকে একটি ঘুম। বিকেলে একদম ঝরঝরে লাগে।

গান শুনতে শুনতে অনাথ লাল বারান্দা থেকে সিঁড়িঘরে চৌকির নীচের পুরনো ট্রাঙ্কটা দেখতে পেল। কিছুই গোছানো নেই অনাথের। ইনসিওরেন্স, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কাগজপত্র কোথায় কে জানে?

ট্রাঙ্ক ঘাঁটতে ঘাটতে একখানা ছোট্ট চিরকুট পেল অনাথ।

বাবু,

উমা আজ অনেকবার ডেকেছে। তুমি পাল খাওয়াতে নিয়ে যাও।

ইতি—

বাবুকে লিলি।

সত্যি ঘটনা।

ঈশ্বরীতলা।

লিলি তাহলে শুনেছিল ব্যাপারটা। না বুঝেই লিখেছে। সম্ভবতঃ শুতে যাবার আগে লেখা। লিখে মাথার কাছে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। শান্তা তুলে রেখেছে। তারপর কখন পুরনো কাগজপত্রের ট্রাঙ্কে এসে গেছে। খাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া কাগজে পেনসিল দিয়ে লেখা।

কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে আরেকখানা চিঠি পাওয়া গেল। অনেকদিন আগের। কাপড়ের পুঁটলি করে বাঁধা ছিল। পুঁটলি উথলে অনেকগুলো চিঠি বেরিয়ে পড়েছে। আর ঘাঁটাঘাঁটি না করে পুকুরে গিয়ে পড়ল অনাথ।

ঘুম থেকে উঠে অনাথ নতুন একখানা বাঁধানো খাতা নিয়ে বসলো। অফিসের খাতা। কি কাজ তোলার জন্য এনেছিল বাড়িতে। টুকে তোলা হয়নি। খাতা-খানা সেই থেকে পড়ে আছে বাড়িতে।

সামনের মাঠে কানাইকে নিয়ে ঘাস খেতে খেতে উমা অনেকটা এগিয়ে গেছে। অনাথদের বাড়িটার ছায়া লম্বা হয়ে মাঠে শুয়ে। ট্রাঙ্ক ঘাঁটতে ঘাঁটতে আজ অনেক পুরনো সব চিঠির সঙ্গে দেখা হয়েছে অনাথের। কোনোটা পোস্ট-কার্ড। কোনোটা খামে।

একখানা চিঠি কলেজ-জীবনের ক্লাস-ফ্রেণ্ড ভারতীর লেখা। সুদূর ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিখেছিল। ভারতীর শেষ কথা ছিল : কলেজের দিনগুলো স্বপ্নের মত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। সেই চৌদ্দ নম্বর ঘরে টিউটোরিয়াল। দিলীপের তোতলামি (সেই দিলীপের সঙ্গে বিয়ে হয়েই ভারতী আমেরিকায়)। ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকসের ওপর ডঃ দত্তর নোটস্ ছিল অমোঘ। সে-সব দিন আর ফিরে আসবে না। এখানকার ক্যান্টিন, এখানকার নির্জনতা, এখানকার সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। কিন্তু আমরা সবাই মিলে আর কোনদিন শ্রীহরির দোকানে খুরির চা, সঙ্গে অমৃত খেতে পাবো না। ভারতীর শেষ কথা : যেখানে থাকো—সুখে থাকো

আরেকখানা চিঠি লিখেছিল বীরেন। ইনল্যাণ্ড খামে। অভিমানে বোঝাই চিঠি। তুই এখন অনেক বড হয়ে গেছিস। আমাদের কথা কি মনে থাকবে ? আমি জীবনে কিছুই করতে পারিনি। তুই যদি একটু সাহায্য করতিস।

বাড়িটার ছায়ার দিকে চোখ বন্ধ করে তাকালো অনাথ। বীরেনকে কেউ সাহায্য করতে পারবে না। যা হতে চায়—তার সমান পরিশ্রম ও কোনোদিন করেনি। আস্ত একটা অভিমানের ডিম। এতকাল পরে চিঠি দেখে বীরেনের কথা মনে পডায়—সেই সময়টা চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

তখন অনাথ ভাবতেও পারেনি—একদিন সে সপরিবারে প্রায় দশটা বছর ঈশ্বরীতলা নামে এক জায়গায় কাটিয়ে দেবে। তখন সে ছিল ছাত্র আন্দোলনের চাঁই। পোস্টার লেখা, বক্স কালেকশন, মিছিলের ভেতরকার স্লোগানদার। এখন সে বচ্ছরকার আলু কিনে এনে চৌকির নীচে বালি বিছিয়ে রেখে দেয়। এখন সে এমন একটা বয়সে এসে পৌঁছেছে—যেখান থেকে পেছনে তাকানো যায়। আবার সামনেও তাকানো যায়। এখন মনে হয়—কি করলাম জীবনে ? বউ ? ইনসিওরেন্স ? বাড়ি ? গরু ? আমার কি আরও অন্য কিছু করার কথা ছিল

না? এখন অনাথ নিকট অতীতকেও স্নেহের চোখে দেখে বাতিল করতে শিখেছে।

সে খাতাখানা খুলে লিখতে বসলো। লিখতে গিয়ে দেখলো—তার জীবনের প্রথম উনচল্লিশটি পৃষ্ঠায় বাঁধাই বড নরম। সব ঢিলেঢালা হয়ে আছে। পৃষ্ঠাগুলো সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে। নয়তো ছিঁড়ে যেতে পারে। এতদিনে সে সময় পেলে তার ডাইরীতে 'জীবনের মানে' লিখে রেখেছে।

এখন অনাথ জীবন লিখে রাখতে চায়। ধাতু—পৃথিবীর শরীর। পেট্রোল—চাপা-পড়া প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর শরীরের ফ্যাট অয়েল। কয়লা আসলে সুপ্রাচীন বৃক্ষ।

—সালে আমার জন্ম। ঠিক এই চৈত্রে। মায়ের মুখে শুনিয়াছি—মফঃস্বলের দাই আড়াই টাকা ফি লইয়াছিল। সেই দাইয়ের নাম ছিল ফ্যাকাশি। বড় হইয়া দেখিয়াছি—সেই ফ্যাকাশি সগু চালু রেশন আনিতে যাওয়ার সময় পাড়া মাতাইয়া বলিয়া যাইতেছে—রেশম আনতে চললুম।

ফ্যাকাশির দাদাদের নাম ছিল—কালা আর ফোতো। কালা ফোতো দুই ভাই একত্রে একখানি ঘোড়ার গাড়ি চালাইত। তাহাদের মা রুক্মিণী দাসী বয়সকালে স্থানীয় জমিদার শশী বিশ্বাসের রক্ষিতা ছিল। শশী অনেককাল মৃত। তাহার পুত্র মতি বি.এ. পাস। নাকের নীচে আশুতোষ গোঁফ। তাহার একমাত্র কন্যা সাধনা ফ্রক উড়াইয়া আমার সঙ্গে গোল্লাছুট খেলিত। ফোতোর পাশে চলন্ত ঘোড়ার গাড়িতে বসিয়া আমি অনেকবার তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি—এই মতি আসলে আমার ছোট ভাই। মতি কোনদিন ফোতোকে বা কালাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে নাই। অথচ ওরা দুইজন সহিসের বাক্সে বসিয়া নিত্যদিন ভাই ভাই করিয়া মরিত। শেষদিকে কালা কিছুদিন ছোট ভাইয়ের ওয়েলার ঘোড়ায় টানা ব্রুহামের সহিস হইয়াছিল।

লিখতে লিখতে অনাথ মাঠের দিকে তাকালো। কতকালের কথা। এখন বিকেল পড়ে এসেছে। নিত্য যাত্রীরা সেই পড়ন্ত আলো মেখে ট্রেন থেকে নামছে। পাঁচটা কুড়ির ডাউন ট্রেন হুইসেল দিল। ঈশ্বরীতলার সম্পন্ন নাগরিকরা এখন বাড়ি ফিরবে।

টিউনিশিয়া হিটলারের হাত হইতে ফেরত পাইয়া ইংরাজ সরকার আমাদের স্কুলে ফ্রিতে বালুসাই খাওয়াইয়াছিল। আমরা লাইন দিয়া তাহা খাই। পরদিন বাণী সিনেমায় বিনা পয়সায় রাঙাবউ ছবিটি দেখাইয়াছিল। আমার ছোট ভাই শ্রীনাথকে কোলে বসাইয়া দু'জনে ছবিটি দেখিয়াছিলাম। আমাদের বাবা

সাতক্ষীরার ওল, ক্ষীরের গজা, মায়ের জন্য আলতা আনিত।

লিখতে লিখতে অনাথ বুঝলো স্মৃতি পাতাবাহার গাছের পাতার মত। তাতে রাস্তার ধুলো পুরু হয়ে পড়ে থাকে। নাড়া দিলে তবে আসল রঙ বেরোবে। সে এখানে এখন এমন ভাবে জীবন সাজিয়ে বসেছে—চারদিকে এত শেকড় নেমে গেছে—তার পক্ষে এখন আর এই রসস্থ জমি থেকে তার নিজের গাছটা উপড়ে তোলা অসম্ভব।

খালপাড় থেকে দু'জন অচেনা লোক এদিকেই নেমে আসছে। একজনের ন্যাড়া মাথায় একখানা চাদর পাগড়ি করে বসানো। বয়স বোঝা যায় না। অন্যজনের ত্রিশও হয়নি। গোঁফজোড়া গালের দু'পাশে ঝুলে পড়েছে।

অনাথের দৃষ্টি ধরেই ওরা দু'জন বারান্দায় বসলো। বদন প্রামাণিক খবর পাঠালো বাবু। আপনার ষাঁড় নাকি বলদ ধরাবেন? আড়াই টাকা নিয়ে থাকি।

কে খবর দিয়েছে?

বদন প্রামাণিক।

ও। আমাদের বদন। অনাথ মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখলো। কানাই ঘাস খেতে খেতে মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কানাইকে কেনার জন্যে লোক হাঁটাহাঁটি করছে। দরও উঠেছে। এখন এইবেলা বলদ ধরিয়ে দিলে ভালো হাল টানবে বয়েসে। বদন অনাথের ভালোর জন্যেই ওদের পাঠিয়ে দিয়েছে।

থাক না কিছুকাল।

এখন বলদ না ধরালে ও ষাঁড় আপনার বলদ করতে বেগ পেতে হবে।

কি দিয়ে করবে?

এই যে চাকু।

হাতে নিয়ে দেখলো অনাথ। বাঁশের গা চেঁছে তৈরি। একটাও চোঁচ নেই। মসৃণ।

ষাঁড়ের তো ব্যথা লাগবে।

তা লাগবে বাবু। সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ দিয়ে বেঁধে দেব। সাতদিনে শুকিয়ে যাবে।

তোমার নাম?

আমি এমদাদ হোসেন। ওর নাম বালক দত্ত। আমরা গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে

এ-কাজ করে বেড়াই। আপনার দরকার হলে খবর দেবেন।

কোত্থেকে শিখলে এ কাজ?

আমাদের বাপ-ঠাকুদ্দার ব্যবসা। পেট থেকে পড়েই শিখেছি।

কেমন আয় হয়?

বর্ষার আগে অনেক কাজ পাই। কিন্তু শীতকালটা ঢিমে যায়। উঠি বাবু।

ওরা খালপাড় দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কানাই ডাকলো, হাম্বা—আ—আ—

অনাথ শুনলো, বড ব্যথা পেতাম আজ।

চারদিকে তাকিয়ে অনাথ জবাব দিল, হাম্বা—আ—

কানাই শুনলো, আমি থাকতে তোর কোন ভয় নেই।

এমন সময় খালপাড়ে ছবির মত রিকশা সাইকেল ভেসে উঠলো। টুকু আর লিলি বই খাতা হাতে হাসতে হাসতে আসছে। রিকশায় কেন?

কাছে এলে অনাথ বলল, রিকশায় এলি। ভাড়া দেবে কে এখন?

তুমি দিয়ে দাও। পা ব্যথা করছিল। মাকে বোলো না।

খানিকক্ষণের ভেতর বাড়িটা সরগরম হয়ে উঠলো। টুকু পুকুরপাড়ে গিয়ে অরুণ বরুণের পায়ে সুতুলির দড়ি বেঁধে টানাটানি শুরু করে দিল। রাজহাঁস দু'টো স্বাধীনভাবে ভাসতে না পেরে বর্ষা-ভেজা-গলায় চেঁচাতে লাগল। এত নবীন কণ্ঠস্বর। কী বা বয়স হাঁস দুটোর। টুকুর অনেকদিনের ইচ্ছে—রাজ-হাঁসের ডিমের ওমলেট খাবে। কিন্তু অরুণ বরুণদের ঘরে কোনদিন ও ডিম খুঁজে পায়নি।

শোয়ার বড় ঘরখানার পেছনেই ওদের ঘর-গেরস্থালি। বাঁশের ঘরে থাকে অরুণ বরুণ। তারপর কয়লার ঘর। তারপর টালির নীচু চালায় থাকে বাঘা। তার পাশের চালায় আটটি পাতিহাঁস। ঝিনুক খেয়ে খেয়ে ওদের ডিমের সাইজ বেশ বড়। তারপর নাতিপুতি নিয়ে শুক্লা থাকে। এখানে ষোল হাতের ব্যবধানে তিনটে নারকেল গাছ। ডাবের ফুল পড়ে জায়গাটা ভরে যায়। সেখানেই উমা কানাইয়ের পাকা ঘর। একদম শেষে থাকে লেগহর্নদের দল। জ্যোৎস্নার নির্জন রাতে এদিকটায় ওদের গলার আওয়াজে একটা ঐকতান ওঠে। তখন কোম্পানি বাঁধের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সব শুনতে পায় অনাথ। সে ভীষণভাবে এই ঈশ্বরীতলায় জড়িয়ে গেল।

সন্ধ্যের মুখে মুখে আকাশ ফেটে গিয়ে একটা লালচে আলো সারা ঈশ্বরী-তলায় ছড়িয়ে পড়ল। শান্তা ঘরের ভেতরে বসে এই সময়টায় নিশ্চয় দাঁতে

ফিতে কামড়ে চুল বাঁধছে। সারাটা বিকেল এখন শান্তার দাঁতে কামড়ানো ফিতের সঙ্গে সমান্তরালে কালো হয়ে যাচ্ছিল।

আজ হইতে প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে শীতকালের দুপুরে আমি একদিন টলস্টয়ের রেজারেকশন পড়িতেছিলাম। অশোক গুহের বঙ্গানুবাদ। বর্ধমান টাউন লাইব্রেরির বাঁধানো বই। প্রতিটি লাইনের শেষের হরফটি বার বার বাঁধাইয়ের দরুন কাটিং মেসিনে কাটা গিয়াছে। তাই আন্দাজে হরফ পূরণ করিয়া পড়িতে হইতেছিল। দোতলার ঘর। সামনে ঢাকা বারান্দা। ডিসেম্বরের বেলা তিনটা হইবে। সামনের জি টি রোড দিয়া মুহুর্মুহু লরী যাইতেছিল। আরেকটু দূরে ধান কাটা ন্যাড়া মাঠের ভিতর দিয়া রেল লাইন গিয়াছে। বই হইতে চোখ তুলিয়া দেখি—একটি কয়লার ইঞ্জিন হাঁফাইতে হাঁফাইতে সেই মাঠের ভিতর দিয়া সাঁতরাইতেছে। তাহার লেজে অনেকগুলি বগি। জানালায় জানালায় লোক বসিয়া। আমার চোখে জল আসিয়া গেল। কেন? তাহা জানি না।

জগেন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করে জুতোর ব্যবসা বড় করতে গিয়েছিল। ব্যবসা বড় হয়নি। সুদ বেড়ে যাচ্ছে। কারণ আসলের কিস্তি বাকি পড়ছে। পড়ারই কথা। পঞ্চানন অপেরা পার্টির কসটিউম এসেছে নতুন নতুন। জুতোর দোকানের ভেতর জগেনকে একটা সাইনবোর্ড টানাতে হয়েছে। তাতে লেখা—হাইপথিকেটেড্ টু···। তারপর ব্যাঙ্কের নাম লেখা। ঈশ্বরীতলা ব্রাঞ্চ। এই সাইনবোর্ড টানাতেই হবে। ব্যাঙ্কের তাই নিয়ম। জগেন করেছে কি—সেই সাইনবোর্ড একেবারে সিলিং-এর কাছে টানিয়েছে। ফলে খদ্দেরদের চোখেই পড়ে না। জগেনও আজকাল ব্যাঙ্কের ধারের কথা বেমালুম ভুলে গেছে।

সে মেতে আছে অপেরা পার্টি নিয়ে। ইদানীং জগেন খবরের কাগজে চালু অপেরা পার্টির কলশোয়ের বিজ্ঞাপন দেখলেই সারারাত ধরে অ্যাকটিং দেখে আসে। দেখে এসেই তার নিজের পালার ভাবভঙ্গী শুধরে ঘষে মেজে ফেলে।

সন্ধ্যেবেলায় ঈশ্বরীতলায় 'মিস্ত্রীদের মাঠে আজ জগেনের পালা নেমেছে। তহশীলদারের ঘরের পেছনে সাজঘর। পেইন্টের অভাব, উইগ গোনাগুণতি, সোর্ড বারোখানা আর জরির পোশাক। এই সম্বল করে জগেন হিস্টোরিকাল মিলিটারী পালা মঞ্চে নামিয়ে দিয়েছে। টিকিট তিরিশ পয়সা। তাতেও লটারী। লাকি নাম্বার উঠলে ফার্স্ট প্রাইজ একটা পেট্রোম্যাকস্। তা হাজার দুই লোক টিকিট কেটেছে। ভাড়া করা তিনজন মিউজিক ব্যাণ্ড সন্ধ্যে লাগতেই

বাজাতে শুরু করে দিয়েছিল। এখন ডায়ালগের মাঝখানে ওরা রেস্ট নিচ্ছে একটু।

সাজঘরের কেঠো চেয়ারটায় বসে রানী বিদ্যাময়ীর মেকআপ নিচ্ছিল জগেন। পঞ্চানন অপেরায় এখনো এমন টাকা হয়নি যাতে ফিমেল রোলে অভিনেত্রী আনতে পারে ভাড়ায়। রানীর বেশে সে যখন স্টেজে গিয়ে উঠলো—ঠিক তখনই চটের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে যে-লোকটি এইমাত্র ভিড়ের ভেতরে গিয়ে বসে পড়ল—তাকে এখানে সবাই চেনে। ভয় করে। আড়ালে নিন্দা করে। গালে চাপদাড়ি বলে কেউ চিনতে পারলো না তাকে।

জেলখানা থেকে সন্তোষ টাকি আজই খালাস পেয়েছে। কলকাতায় ঘোরাঘুরি করে ট্রেনে ঈশ্বরীতলায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে রাত কাবার। স্টেশনবাজার প্রায় ফাঁকা: কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখে—পঞ্চানন অপেরার যাত্রা। টিকিট কাটবে কে। সন্তোষ টাকি ভেতরে ঢুকে পড়ে একমনে যাত্রা দেখতে লাগলো। কে রানী সাজলো রে বাবা। ক্যান ক্যান করে কেঁদে কানের পোকা বের করে দেওয়ার যোগাড়। এমন সময় তলোয়ার কোমরে ষণ্ডামার্কা একটা লোক ঢুকলো। তার অট্টহাসি ফুরোতেই ক্ল্যারিওনেট বেজে উঠলো। সামিয়ানার নীচে সবাই একমনে শুনছে। অক্রুর বাঙাল একদম সামনের দিকে। মা-মাসীদের কোলের বাচ্চাগুলো ওরই ভেতর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঠিক এই সময় ষণ্ডামার্কা লোকটা তলোয়ার তুললো। আর কোত্থেকে একটা বড কুকুর 'ঘেউ' ডাক দিয়ে একদম স্টেজে। চারদিকে আলো। বাজনা। ঈশ্বরীতলার সব বাড়ি থেকে ঝেঁটিয়ে আসা লোকজনের মাথা। কালো, সাদা, কাঁচাপাকা। বাঘা ঘাবড়ে গেল। সে এক কামড়ে অর্বুদ সিংহের জামার ঝুল মুখে তুলে নিতেই লোকটা কেঁদে কঁকিয়ে উঠলো। বাঁচাও—

সবাই এত মন দিয়ে যাত্রা দেখছিল—কেউ বুঝতেই পারেনি কুকুরটা যাত্রার বাইরের কেউ। যখন বুঝলো, রানী বিদ্যাময়ী পার্ট ভুলে বসে আছে। হইহই কাণ্ড।

সন্তোষ টাকি আনন্দে দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিল। তখনো কেউ তাকে চিনতে পারেনি। কাছেই ভদ্রেশ্বর ছিল। সে ভিড় সামলে সাবধানে এগিয়ে এল। সন্তোষদা? কখন ফিরলে? বাইরে চল।

যাত্রার বাইরে বাকি জায়গাটা অন্ধকার।

লাস্ট ট্রেন বেরিয়ে গেল রাত ন'বারোটায়। তার খানিক বাদে ছুটো লোক

স্টেশনবাজারে জগেনের জুতোর দোকানের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘুমের ভেতর শান্তা প্রথম শুনলো। বুঝলো। একবার উঠে দেখবে নাকি? হাঁসের ঘরে খুব আওয়াজ হচ্ছে।

অনাথের ঘুম ভাঙাতে পারলো না। বলাইকে ডাকলো। সে এখন ঘুমের ভেতর নিশ্চিন্তপুরে আছে। হাজার ডাকলেও সাড়া দেবে না। গোয়াল ঝাড়ানো। হাঁসের ঘর, মুরগির ঘর, ছাগলের ঘর সাফাই। বাঘাকে চান করানো তারপর গরু বাঁধা। গরু ছাড়া। দোহালের সঙ্গে বালতি পেতে বসা। পনর-ষোল বছরের তাজা শরীরটা নিয়ে রোজ সকালে ঘুম থেকে ওঠে বলাই। এত কাজের পর যখন শুতে যায়—তখন শরীরে আর কিছু থাকে না। শুতেই ঘুমিয়ে পড়ে।

পাতিহাঁসদের ঘর থেকে ওদের এলোমেলো আওয়াজ ভেসে আসছিল। এত রাতে নিজের বেরোনো ঠিক হবে না বলেই শান্তা স্থির করলো। তারপর এক-সময় সে-ও ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরে সবার ঘুম ভাঙলো বলাইয়ের চিৎকারে।

দুটো পাতিহাঁস মরে পড়ে আছে হাঁসের ঘরে। একটা নড়ছে না চড়ছে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে। বাকী পাঁচটা পুকুরে। সন্তানবিয়োগেও মানুষ এতটা কাবু হয় না—মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে বলাই কাঁদছে। ও দুটো হাঁসই সবচেয়ে বড় ডিম দিত। কতবার বললাম তোমায় বাবু—হাঁসের ঘরে জালের দরজা লাগাও। সবাই নজর দিচ্ছে।

মুরগির ডাক্তার সদরে আমিন। ছুটিছাটার দিন পোলট্রিতে পোলট্রিতে ঘুরে রমেশ সান্যাল ওষুধ দেয়। ভিজিট দু টাকা। সে দেখে বলল, শেয়াল আসেনি। এলে একটা হাঁস অন্ততঃ মুখে তুলে নিয়ে যেত। ভাম কিংবা বনবিড়ালও আসেনি। ওরা এলে হাঁসেদের অন্ততঃ জখম করে রেখে যেত। কেউ জখম হয়নি।

রমেশ সান্যাল বড় চাকু দিয়ে একটা মরা হাঁস চিরে দেখলো। না। বিষেও মরেনি। তবে হার্ট জখম হয়েছে দেখা যাচ্ছে।

অনাথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। হাঁসের অ্যানাটমি এত সহজে বোঝা যায়।

শান্তা বলল, তবে কি হতে পারে?

রমেশ সান্যাল বলল, হার্টফেলের কেস।

একসঙ্গে দুটো হাঁসের হার্টফেল করল?

আরেকটারও করতো। দেখুন না। কেমন জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর এখুনি পুকুরে গিয়ে সাঁতরানো দরকার।

বলাই সঙ্গে সঙ্গে জড়ভরত হাঁসটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে মাঝপুকুরে ছুঁড়ে দিল। হাঁসটা গিয়ে মোচার খোলার মত ধপাস করে জলে পড়ল। তারপর একটু একটু করে ডানা খুললো। পায়ে জল কাটতে লাগলো।

রমেশ সান্যাল বলল, গভীর রাতে ওদের ঘরে এমন কিছু এসেছিল—যাকে দেখে ওদের এই অবস্থা। কি হতে পারে? সে কে?

বলাই বলল, নিশ্চয়ই সাপ।

হতে পারে। হতে পারে কেন? সাপই হবে। অনাথবাবু আজই আপনি জালের দরজার ব্যবস্থা করুন।

সকাল থেকেই মিস্ত্রী কাজে লেগে গেল। অফিসের জন্যে তৈরি হতে হতে সর্বক্ষণই অনাথ সেই দৃশ্যটা দেখতে লাগলো। একদম চোখের সামনে।

নিষুতি রাত। পাতিহাঁসদের ঘরে কোম্পানি বাঁধ থেকে একটি বড়সড় বিষধর বেড়াতে এসেছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে বাইরে। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। বিষধর তার বিক্রম দেখাবার জন্যে লেজের ওপর ভর দিয়ে ফণা তুলে দাঁড়াচ্ছে। আর ধপাস করে ঠাণ্ডা মাটির মেঝেতে বিষ ঢালছে। সাপ এক-একবার মাথা নামায়—আর আটজন পাতিহাঁস—যে যেদিকে পারে কোণের দিকে সরে যায়।

কতক্ষণ ঘরে এই কাণ্ড চলেছে কে জানে। বিষধর নিষুতি রাতে বিক্রম দেখাচ্ছে। আটটি নিরুপায় ভীতু প্রাণ—পাল্টা আঘাতের কোন পথ না পেয়ে ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে।

একবার নিশ্চয় ওই মৃত হাঁস দুটোর গা ঘেঁষে বিষধরের মাথা নেমে এসেছিল। ওরা অন্ধকারে বিষধরের বুকের সাদা দিকটা দেখতে পেয়েছিল নিশ্চয়। তারপর কি মনে হতে বিষধর ফিরে গেছে।

সকালবেলাকার ভাড়ি খেতে পারলো না অনাথ। বার বার মনে হল—আমারই জন্যে—আমারই জন্যে ওদের অকালে চলে যেতে হল। যদি একটু আগে থেকে সাবধান হতাম।

মদন বদন খাল থেকে পাঁকাল মাছ নিয়ে এসে লাল বারান্দায় বসেছিল। সব

শুনে মদন বলল, একটা বেজি পুষবে বাবু? খালের ওপারের জঙ্গল থেকে ধরে

তার আগে সাপগুলো ধর তো। কোম্পানি বাঁধে অনেক সাপ আছে।

মহম্মদ বাজীকরকে খবর দেব? দুর্দান্ত নজর। গর্ত দেখলেই হাত ঢুকিয়ে দেয়।

ডাক্ তাকে।

মদন বলল, তার চেয়ে বাবু তুমি একটা সর্পযজ্ঞ কর।

সেইটেই বাকী আছে। নে, ওই তাড়িটা খেয়ে ফেল্। আজ সকাল সকাল ট্রেন ধরতে হবে।

শান্তা বুঝলো, ওই কোম্পানি বাঁধের কোন একটি গর্তে বিষধরের বাসা। সে সেখান থেকে এই বসু পরিবারের গতিবিধি বসে বসে নির্বিঘ্নে দেখে। সে নিজে এগিয়ে না এলে তাকে কেউ ধরতে পারবে না।

॥ ছয় ॥

সন্ধ্যেবেলা রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট দক্ষিণা চক্রবর্তী অনাথের সঙ্গে দেখা করতে এল। কথা সামান্য। দক্ষিণা ভোটে দাঁড়াবে। কাল স্টেশন বাজারের ফাঁকা মাঠটায় সন্ধ্যেবেলা পয়লা মিটিং। চৌকির ওপর চেয়ার আর মাইক থাকবে। গণ্যমান্যদের মধ্যে অনাথকেও সেখানে বসতে হবে।

অনাথ বলল, না। মাফ করবেন। আমি শ্রোতা সেজে ভিড়ের ভেতর থাকতে পারি। কিন্তু স্টেজে বসবো না।

দক্ষিণা বি-এ, বি-এল। তিন বছর হল রিটায়ার হয়েছে। দেওয়াল ঘেরা দোতলা বাড়ি। বাবা ছিল রেলের বাবু। তাছাড়া বড় চাষ ছিল। দক্ষিণার ছেলেবেলায় এদিকটায় স্কুল ছিল না। সাত মাইল পায়ে হেঁটে গিয়ে স্কুল করেছে। তারপর কলকাতায় কলেজ। এজন্যে সে খুব গর্ববোধ করে। ধান বেচে বাবার অসমাপ্ত দোতলার ছাদ ঢালাই করেছে। ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক। পুকুরপাড়ের একটা সবেদা গাছ ফলে ভরে যায়। যাবার সময় দক্ষিণা ক্ষুন্ন হয়ে ফিরে গেল।

অনাথের কিছু করার ছিল না। সে এখানে দল করতে আসেনি। সে ভোটের মানুষ নয়। কেননা খালপোল পেরিয়ে নস্করদের জমিতে এক ধারে কিছু আখগাছ দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। রোজই দেখে অনাথ। রোজই

দেখে আনন্দ হয়। কেন হয়—তা জানে না অনাথ। ন্যাড়া মাঠের মধ্যে ওদের দাঁড়ানোর ভঙ্গীই এমন যে, না দেখে উপায় নেই কোন।

পাঁচটা কুড়ির ডাউন ট্রেন চলে গেল। দক্ষিণা চক্রবর্তী মাইক বাগিয়ে ধরলো। তার পাশে চেয়ারে বসেছে দক্ষিণারই বাল্যবন্ধু—এককালের অঞ্চল-প্রধান ধনদা রায়। আর বালি ব্যবসায়ী মুকুন্দ পালুই। সিঙ্গুরের বালি সাপ্লাই দিয়ে বলবে পাণ্ডুয়ার বালি। বাড়ি করার সময় বালি কিনতে গিয়ে জানতে পেরেছিল।

দক্ষিণা মাইক বাগিয়ে বলল, কে কে আমায় চায় না—তা আমি জানি। ওদের সিধে করতেই আমার বিধানসভায় যাওয়া দরকার। আমি এখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি—কে কে আমায় টিটকিরি দিচ্ছে। আমি জানি—কে কে আমার এগ্‌নেসটে। কিন্তু আমার এসব পরোয়া করলে চলবে না। আমি—জনতার লোক।

মাইক শিস দিয়ে উঠলো। অনাথ ভিড় থেকে বেরিয়ে এল।

টুকু আর লিলিকে নিয়ে আজই সন্ধ্যেবেলা শান্তা ছায়াবাণীতে গেছে। এই সময়টা স্টেশনবাজার এসপ্ল্যানেড্ হয়ে যায়। রিকশার প্যাঁক প্যাঁক। মিষ্টির দোকানে বড় কড়াইয়ে জিলিপি ভাজা হচ্ছে। হোলসেল দোকান থেকে লোকে লাইন দিয়ে দেশলাই, সাবান, হেরিকেনের ফিতে কেনে।

হলে ঢুকে বেশীক্ষণ সিনেমা দেখা কপালে ছিল না ওদের। দুষ্টুগ্রহ বাঘা এসে হাজির। দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছে। চাষীরা কেউ কেউ পা তুলে ছবি দেখছিল। বাঘা মুখ বাড়িয়ে টুকুদের খুঁজতে গিয়ে ওদের কাছাকাছি যেতেই ওরা পা নামিয়ে ফেলে চেঁচিয়ে উঠছিল। বাবা গো—

বাঘার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। উঃ। আঃ! ঘেউ! ইত্যাদি শব্দ করে টুকুদের ঠিক খুঁজে বের করলো। তারপর দু'পাশের রোয়ের মাঝামাঝি মেঝেতে থাবা দিয়ে বসে ছবি দেখতে লাগলো। কিন্তু বেশীক্ষণ এ অবস্থা চলল না। পর্দায় একটা মারামারি দেখে উঠে দাঁড়ালো। তারপর মেঝেতে পা আঁচড়ে নিয়ে পর পর তিনটে বিকট 'ঘেউ'।

গেটকিপার ছুটে এল। হলসুদ্ধ লোকের চিৎকার। ও আপদ বের করে দাও।

পাল্টা বাঘাও 'ঘেউ ঘেউ' জুড়ে দিল। এ অবস্থায় কে তাকে বের করে দেবে? কার সাহস আছে? কাছে এগোতে না পেরে ম্যানেজার এসে শান্তাকে

দূর থেকে বলল, ওকে বাইরে রেখে আসুন না। পাবলিক ক্ষেপে গিয়ে চেয়ার ভাঙবে।

ভাঙার আওয়াজও আসছিল। টুকু আর লিলি কিছুতেই ছবি না দেখে উঠবে না। শান্তা বলল, আপনারা দরজা খুলে রাখেন কেন?

ম্যানেজার কাঁচুমাচু হয়ে বলল, যা হয় কিছু করুন। পাবলিক চেয়ার ভাঙছে। এবার পরদা ছিঁড়বে।

অগত্যা তিনজনকেই উঠতে হল। বাঘা একা একা ফিরে যাওয়ার লোক নয়। বাইরে বেরিয়ে টুকু রাগে কান মলে দিতে বাঘা ভাবলো—আদর।

এই সুন্দর সন্ধ্যায় অনাথবন্ধু হাঁটতে হাঁটতে বিশ্বেশ্বরীর বাওড়ে এসে পড়েছে। নদী চলে গেছে অনেকদিন হল। মাইল তিন-চার জুড়ে বিরাট এক গর্তে জমা জল ফেলে রেখে গেছে। ফি বর্ষায় চারদিকের নতুন জল এসে এখানে পড়ে। শীতকালের শেষদিকে পাখিদের আড্ডা। গ্রীষ্মে জলজ ঘাসের বাড়ন্ত ডগাগুলো বাতাসের সঙ্গে দোলে। এখন দূরের ঝুলন্ত মেঘের সমানে বকের পাল আকাশ ক্রশ করছে।

বাওড়ের কাছাকাছি এক সময় সম্ভবতঃ বসতি ছিল। লোকালয় উঠে গেছে। কিন্তু বটতলা, জঙ্গলে ঢাকা ভাঙা মন্দির পড়ে আছে। অনাথ গিয়ে বটতলায় বসলো। জায়গাটা উঁচুমত। ঘাসে ঢাকা। দিনের বেলা কারা খেজুর ডাল চেঁছে পাতা ফেলে গেছে।

অনাথ মনস্থির করার চেষ্টা করতে লাগলো। পৃথিবীর কত জায়গায় কত কি ঘটে যাচ্ছে। এখানে সময় দম ধরে পড়ে আছে। ঈশ্বর সম্পর্কে তার কোন শিক্ষা নেই। এই স্তব্ধ নির্জনতাই সম্ভবতঃ ভগবানের পাঠশালা। কে বলে পৃথিবী বদলে গেছে। মুনিঋষিদের শান্ত স্থৈর্য এখনো তো পৃথিবীর বেশির ভাগ জায়গাই দখল করে আছে। কতটুকু বা শহর। কতটুকুই বা রেলগাড়ি। এখনো বেশির ভাগ জায়গা—গাছপালার, পাহাড়ের, নদীর।

অন্ধকার বাওড়ের বুকে হোগলা, জোলোঘাসের ডগায় জোনাকিরা আলো জেলে এসে বসছে। দূর থেকে অন্ধকার মাখানো দুই মূর্তি বাওড়ের পাড় ঘেঁষে এগিয়ে আসছিল। হাতে বড় বড় ছিপ। মূর্তি দুটি বটতলার কাছাকাছি এগিয়ে এল। ওরা লণ্ঠন জেলে বিড়ি ধরাতেই অনাথ চিনতে পারলো। মদন? কি করছিস মদন?

দু'জনই চমকে উঠে দাঁড়াল। কে?

বদনের হাতে ছোট শাবল। কে ওখানে? সাড়া দাও—

আমি রে আমি! বোকা! বলতে বলতে অনাথ উঠে এল।

ওঃ। আমরা ভাবি কে না কে? কি করছিলে বাবু এখানে?

ঘুরতে ঘুরতে এলাম। তোরা?

আর বোলো না বাবু। বুনির বে। সাইকেল, আংটি হয়ে গেছে। এখনো ঘড়ি যোগাড় হয়নি। হাতে আর দশটা দিন মোটে। যাই যদি ভাগ্য থাকে —বাওড়ের একটা মাছই ঘড়ি এনে দেবে।

বড় বড় মাছ আছে?

পেল্লাই সাইজের। সেই নদীর আমলের। বেরোতে না পেরে এখন বাওড় দাপিয়ে বেড়ায়।

এক একটার ওজন?

তা দেড় মণ ওজনের মহাশোল আছে। পেল্লাই ভেটকি আছে। ব্যাঙের গর্ত খুঁড়ে ব্যাঙ পাচ্ছিনে যে গেঁথে দিয়ে বঁড়শী বসাবো। তুমি এখানে বোসো না। সাপখোপ আছে। বাড়ি যাও।

তোরা তো মহম্মদ বাজিকরকে আনলিনে—

খবর দেওয়ার সময় পাইনে। কাল যাবো। এখন আমাদের কত কাজ বল দিকি। ঘ'ড় চাই। লোক খাওয়ানো আছে। নউগোদো আছে। তত্ত্ব আছে। ধুতিই লাগবে তিনজোড়'—

এই নে—

কি?

নে না। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে দিল অনাথ।

এ তো ঘড়ি। তোমার ঘড়ি। মা আমাদের ভূত ভাগাবে গালাগালি করে।

জানবেও না। বলবো—সারাতে দিয়েছি?

ট্রেন ধরতে হয় তোমার সময় দেখে। গাড়ি ফেল করবে শেষে। দরকার নেই।

মাছ পড়লে আমায় টাকা দিয়ে দিবি। তখন নতুন ঘড়ি কিনে নেব।

যদি না পড়ে বাবু?

তাহলে তোদের বোনের বিয়েই আটকে যাবে।

তাহলে দাও।

অনাথ কবজি থেকে ঘড়িটা খুলে মদনের হাতে দিল। নেমন্তন্ন করিস কিন্তু। আমরা তোদের ভগ্নীপোতকে আশীর্বাদ করে আসবো।

খুব খুশী হবে সবাই। তুমি বাবু এদেশের লোক নও। তুমি অন্য রকমের। এখানকার লোকের মনে শুধু হিংসে। কী করে বিপদে ফেলা যায়—তাই হল গিয়ে মতলব। আমরা সুধন্য নস্করের আটার দোকান থেকে আটা খাই। বেশী বেশী করে লিখে রাখে খাতায়। জন খেটে শুধতে হচ্ছে এখন।

রিকশা চালালে পারিস।

আমরা শিখিনি। আমরা ধান রুইতে পারি। মাছ ধরতে পারি। ঘর ছাইতে পারি। পুকুর কাটতে জানি। তা এদেশে তো অতো কাজ নেই।

ডাব ব্যবসা করিস না কেন? আমি টাকা দেব।

অত ডাব কোথায় দেশে! সবাই গাছ জমা নিয়ে বসে আছে।

সামনেই বাওড়ের বিশাল জল। অন্ধকারে অন্ধকার হয়ে মিশে আছে। আজ চাঁদ ওঠার অনেক দেরি।

একলা যেতে পারবে বাবু?

খুব পারবো।

সন্তোষ টাকি আজ তিন দিন বাজারে সব কিছু নগদ খাচ্ছে। আলুর চপ, ডিম ভাজা, সবেদা—সব নগদ। দোকানদাররা তো অবাক্। জেল থেকে সাধু হয়ে ফিরলো নাকি লোকটা! এমন অভ্যেস তো ছিল না।

অক্রূর মুদিখানার গদিতে বসে বলে, জেলে খাটাখাটুনির মজুরী মেলে তো। সে জমানো পয়সা ভাঙছে এখন। ফুরোলেই আবার ডাকাতি শুরু করবে—

সন্তোষ শালপাতায় ঘুগনি খাচ্ছিল। গরম। খাওয়ার শেষে হাসতে হাসতে দূর গাঁয়ের একজন বাসের প্যাসেঞ্জারের মাথায় হাত মুছে নিয়ে বলল, মানুষ পাল্টায় না অক্রূরদা?

সন্তোষ যে কাছাকাছি ছিল—তা দেখতে পায়নি অক্রূর। ভয়ে ভয়ে বলল, মানুষ পাল্টায়। তুমি কি পাল্টাবার জিনিস!

বিশ্বাস করে ভাখো না একবার।

আপত্তি নেই। কিন্তু কি দেখে করবো? বিয়ে করেছো?

মেয়ে দেবে কে? সবাই যে ডরায় আমায়!

চেষ্টা করেছো? করোনি।

নিয়মনীতিই জানি না।

কেন? খাটবে খাবে। মাথার ঘাম ফেলে ভাত যোগাবে। বউ রাঁধবে। ছেলেপিলে হবে।

কে আমায় কাজ দেবে বল?

কাজ না পাও ব্যবসা করো। কত লোক ব্যবসা করে খাচ্ছে।

ব্যবসার কড়ি অক্রূরদা।

কেন? এই যে গুচ্ছের পয়সা ছড়াচ্ছো ক'দিন। এটা কিনছো। ওটা খাচ্ছো। এ পয়সাগুলো কাজে লাগানো যেতো না? কথা বলতে বলতে অক্রূর বিক্রম মজুমদার তেল, মসলা, খোল বেচে যাচ্ছিল। ওজন করছিল। কাঁটা দেখে ঠোঙায় ভরে দিচ্ছিল জিনিস।

এ আর ক' পয়সা।

এবার একটা ঘর বেঁধে থিতু হও সন্তোষ। বয়স তো বসে নেই। মুখে আগুন দেওয়ার বংশধর তো চাই একটা—

কথাটা খচাং করে সন্তোষের ঘিলুতে বিঁধে গেল। বাজারে লোকজনের চলাফেরা থেমে নেই। তবু হাসতে হাসতে বলল, আমার আবার বংশধর! পুলিসের গুলি খেয়ে একদিন রেল লাইনে পড়ে থাকবো। শকুন উড়বে—

এখন থাকো কোথায়?

কেন? প্ল্যাটফর্মে। পাখার নীচে শুয়ে থাকি। রেলের কলের জল খাই। জেলে কলের জল খেয়ে খেয়ে এই এক বাজে অভ্যেস হয়ে গেল অক্রূরদা। আমি আর পুকুরের জল মুখে তুলতে পারি না। ঘিন্না লাগে।

আছো ভালো। সরকারী প্রজা।

নিশাপতি অনেকক্ষণ ধরে পালিশ করলো। তারপর নতুন রঙ করা সাইকেলখানা ভদ্রেশ্বরের হাতে তুলে দিয়ে বলল, চালাতে জানো তো?

না দাদা। বড় হয়ে তক মাথা কামিয়ে বেড়াই। সাইকেল শিখবো কখন?

তাহলে হাঁটিয়ে নে যাও।

প্যাডেলের কোন দোষ নেই তো?

না না। নিশ্চিন্তে নিয়ে যাও।

আলোর পথটুকু পার হয়ে ভদ্রেশ্বর চকচকে সাইকেলখানার বেল বাজাতে

বাজাতে এগোতে থাকলো।

বাদায় চরে উলটো দিক থেকে গরুর পাল ফিরছে। সাদাগুলোকে দেখা যায় শুধু। কালো গরুগুলো একদম সাইকেলের ওপর এসে পড়ল।

বাড়ি পৌঁছে অন্যদিন ভদ্রেশ্বর বোন ওষ্টকে ডেকে পাড়া মাথায় করে। তিন তিনখানা মাটির ঘর। লম্বা মাটির দাওয়ার ভেতর খোঁদল করে হাঁস রাখা হয়। ফলে শেয়ালের পেটে যাবার উপায় নেই। বড় ঘরের বারান্দায় ওদের মা শুয়ে থাকে ওষ্টকে নিয়ে। একটিই মেয়ে বুড়ীর। মদন বদন বিশেষ ঘরে থাকে না। সারাদিনই কোম্পানি বাঁধে—খালপাড়ে। নয়তো বাওড়ের ধারে ধারে কাটে ওদের। মাছের সন্ধানে। ব্যাঙের সন্ধানে। গোসাপের সন্ধানে।

আজ ভদ্রেশ্বর স্রেফ বেল বাজাতে লাগলো। ক্রিং ক্রিং। থামেই না।

ওমা! সত্যি যে! করেছো কি দিদি? ওষ্ট আর চোখ ফেরাতে পারছিল না। ঘুমিয়ে পড়েছিল সন্ধ্যেবেলা। দু'হাতে চোখ কচলে আবার তাকালো। এ যে একদম নতুন গাড়ি। ও বৌদি দ্যাখোসে—

মদন বদন বাড়ি নেই। বাকী যারা ছিল—ছুটে এল।

ভদ্রেশ্বর বলল, বংশীকে মানাবে এ গাড়ি।

এ নামটা ওষ্ট শুনেছে। যতক্ষণ না বিয়ে হয় বিশ্বাস নেই কোন। তাদের মত ঘরে ঘড়ি, সাইকেল, আংটি দিয়ে কে আর ছেলে আনে। বিয়ের কথাটা তার কাছে এতদিন একটা অলীক ব্যাপার হয়ে আছে।

সরো তো সবাই। দাওয়ায় তুলে রাখি। কাউকে হাত দিতে দেবে না।

ভদ্রেশ্বরের বউ বলল, দিনের বেলা ঘরে তুলে রাখতে হবে। চারদিকে দৃষ্টিদানের লোকের তো অভাব নেই কোন এদেশে।

ভদ্রেশ্বরের খাওয়াদাওয়ার পর ওষ্ট বড় সাইজের একটা পান বানিয়ে এনে দাঁড়ালো। আংটি হয়ে গেছে সে জানে। এখন ঘড়িটা হলেই হয়। নস্কর দাদুর দোকান থেকে আধ মণ চাল পাওয়া যাবে ধারে। হয়তো সত্যিই এবার তার বিয়ে হয়ে যাবে। এতদিনে তার বিয়ের ফুল ফুটলো। কাল মা ঘরের পেছনের ডোবায় একটা মৃগেল তুলেছিল ছিপে। বৌদি মাছের মুড়োটা ভাতের পাতে দিয়ে বলেছিল, এখন ক'দিন ভালোমন্দ খেয়ে শরীরটা ফিরিয়ে নে ওষ্ট। তার খুব লজ্জা হয়েছিল শুনে। একজন অন্য পুরুষ তাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে। এই উঠোন, পেছনের বাঁশবন, তিন ভাই, মা, বৌদি, বিত্তেধরীর বাওড়—সব ফেলে রেখে তাকে অন্য দেশে চলে যেতে হবে। চিরকালের জন্যে। বিয়ের দিন

থেকে সে যেশই তার যেশ হবে। খানিক আনন্দ, খানিক দুঃখ—একই সঙ্গে ওষ্টর মন ভরিয়ে দেয়।

বেশী রাতে বাঁশবনের মাথার ওপর দিয়ে জ্যোৎস্না উঠে এল উঠোনে। ছিপ বসিয়ে বদন মদন বাড়ি ঢুকে অবাক। এখনো ঘুমোওনি তোমরা?

ছাখ গিয়ে—ভদ্রা কী এনেছে—

মায়ের কথার পিঠে আর তর সইলো না ওষ্টর। সাইকেল। একদম নতুন।

সত্যি! দু ভাই একসঙ্গে দাওয়ায় উঠে সাইকেলটা দেখলো। অন্ধকারেও চকচক করছে। প্রায় নিষুতি রাত। গাঁয়ের ভেতর লোকজন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। চারদিকে কোন সাড়াশব্দ নেই। ওরা ভাইরা কোনদিন সাইকেল চড়েনি। চালাযনি। ভদ্রেশ্বর আর তার বউ মদন বদনের কাণ্ড দেখছিল।

ওরা দু ভাই সাইকেলখানা উঠোনে নামিয়ে খুব একচোট বেল বাজালো। তারপর কোমরের গামছা দিয়ে সাইকেলের সারা শরীর ভালো করে মুছলো।

আমরাও একটা জিনিস এনেছি। ছাখোসে—

জ্যোৎস্নার আলোয় মদন ট্যাঁক থেকে ঘড়িটা বের করল। কেমন আওয়াজ দিচ্ছে ছাখো। টিকটিক। বড় শক্ত জান।

ওষ্টর মূর্ছা যাবার দশা। তাহলে আর বিয়ের বাকী কি! সবই তো হয়ে গেল। কাল দুপুরে সঙ্গিনীদের সঙ্গে বাওড়ে চান করতে গিয়ে ব্যাসন দিয়ে মাথাটা ভালো করে ঘষবে। কলাপাতায় কাজল তুলে চোখে দেবে। বৌদি বলেছিল, পায়ের গোড়ালি দুটো ঝামা দিয়ে মাজিস একটু। মাজতে হবে।

ভদ্রেশ্বর হাতে নিয়ে বলল, কোথায় পেলি? এ যে দেখছি সোনার।

সোনার জল করা। ওষ্টর বিয়ে শুনে বাবু দিয়ে দিল। নিজের হাত থেকে খুলে। অনাথবাবু—

শেষে কোন বিপদ-আপদ হবে না তো? দেখিস কিন্তু—

না না। ও বাবু সে রকমের লোকই নয়। কোন চাল নেই। কোন গর্ব নেই। অথচ লোকটা তো মস্ত।

কেমন দেখতে বল তো ছোড়দা। বাওড়ের দিকে মাঝে মাঝে এক বাবু বেড়াতে আসে বিকেলে। কোঁচানো ধুতি। পায়ে জুতো। গায়ে হাফশার্ট নয়তো পাঞ্জাবি থাকে।

চোখে চশমা?

হ্যাঁ। তাহলে ওই বাবুকেই দেখেছি আমরা। বটতলায় গিয়ে আসন করে বসে থাকেন চুপচাপ। আকাশ দেখে। পাখি দেখে। আমরা ঘাট সেরে ফেরার পথে দেখি মাঝে মাঝে।

ওদের মা বলল, ওষ্টর বিয়েতে মনে করে বলিস লোকটাকে। আমাদের ভালো তো কেউ চায় না। তবু একটা লোক আছে—

আরো অনেক কথা বলতে লাগলো বুড়ী। ছেলেরা যে-যার ঘরে শুয়ে পড়ল খানিক পরে। মদন বদনকে খেতে দেয় ওষ্ট। দু ভাই দিব্যি অন্ধকারে খেতে পারে। ওষ্ট আলো জ্বালাতে চেয়েছিল। মদন দেয়নি। থাক না তেলটুকু। রাত্তিরে লাগবে।

রাত্তির আর বাকী কি রে মেজদা!

সে তুই বুঝবি কি করে?

ওষ্ট বোঝে। তার দুই দাদা রাত থাকতে বাওড়ে যাবে। মাছ পড়ল কি না দেখবে। হাতে আলো থাকা দরকার। কোম্পানি বাঁধে যাবে। মাছ পড়ল কি না। হাতে আলো থাকা দরকার তখন।

শুয়ে শুয়ে ঘুম আসছিল না ওষ্টর। বাবা সেই কোন্ ছোটবেলায় মারা গেছে তাদের। তার যে কোনদিন বিয়ে হবে—এমন মিথ্যে আশা সে কোনদিন মনে আসতে দেয়নি। কিন্তু এ যে সত্যি হতে চলল। বংশী নামে একটা ছেলে তাকে বিয়ে করে নিয়ে চলে যাবে। তবে তার ভাইরা তেতেপুড়ে এলে ভাত দেবে কে? এক রকমের অদ্ভুত আনন্দে তার চোখে জল এসে গেল। ওষ্ট চোখ মুছে পাশ ফিরলো। তারপর ঘুমন্ত মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোবার চেষ্টা দেখলো। ঘুম কি আসতে চায়! দিনের আলোর মত জ্যোৎস্না চারদিকে।

বাওড়ের তিনটে ছিপে কিছুই বাঁধেনি। বঁড়শী গাঁথা ল্যাটা মাছটাই তিন নম্বর ছিপের মাথা নাড়াচ্ছিল। বড় আশায় আশায় ছিপ বসিয়েছে দু ভাই। শেষ রাতের হেলে-পড়া চাঁদখানা. বাওড়ের জলে একখানা কাঁসার থালা হয়ে ভাসছিল। মদন বদনের হাতে আলোটা দিয়ে জায়গা বদলে আবার ছিপ বসালো।

তারপর দু ভাই হনহন করে কোম্পানি বাঁধের দিকে হাঁটা ধরলো। পথ ছেড়ে মাঠের ভেতর দিয়ে। অঘ্রাণ মাসের মাঠ। ন্যাড়া। আলের ওপর গত বর্ষার গেঁড়িগুগলি মাটির সঙ্গে মিশে আছে। সাবধানে পা ফেলতে হয়। তারপর

এ সময় ওনারা আবার আহারে বেরোন। সামনাসামনি পড়ে গেলে ফণা তোলার আগেই কতবার পিটিয়ে মেরেছে। কিন্তু কোন্ দিক থেকে আসবে বলা তো যায় না।

দূর থেকে দেখতে পেল—খালে একটা আলো নড়ছে।

মদন বদন ছুটতে লাগলো। এই সময়টাতেই গাঁথা মাছ চুরি যায়। আজ ঠিক ধরবে চোরকে। বাঁধে উঠে দেখতে পেল—বাবুর সাদা রঙের বাড়িটা জ্যোৎস্নায় ভিজে যাচ্ছে। নতুন গোয়ালের লাল টালি থাক থাক পাটালির মত সাজানো। ওরা ছুটতে ছুটতে জলের কিনারে এসে অবাক।

না। ছিপ তো ঠিক আছে। খাল এখন অন্ধকারের নদী। দু'ধারে খাড়াই পাড়। হাতের অতটুকু আলোতে সামান্যই দেখা যায়। জলের ওপর দিয়ে কুপি ভাসিয়ে কে আসছে? এত রাতে নৌকো চালিয়ে কে আবার মাছ ধরতে আসে? মদন বদন চুপচাপ ঘাপটি মেরে বসে থাকলো। আগে কাছে আসুক।

অবশ্য এই খালপথে মাঝে মাঝে নৌকো আসে। ক'ঘর বাঙাল বসেছে পরের স্টেশনের কাছাকাছি। তাদের ঘরবাড়ির টালি, নয় তো বালি, কিংবা ইট নিয়ে যায় নৌকো ভাসিয়ে। বাঁশের ভারাও ভাসিয়ে নিয়ে যায় ওরা। কিন্তু এত রাতে তো নয়।

কাছাকাছি আসতেই মদন হাঁক দিল। চাপা গম্ভীর গলায়। কে যায়?

তোদের বাপ!

চেনা গলা। তবু এমন ধমকে বলে কে। বদন হাতের কোচ রেডি করল। ছুঁড়বে ছুঁড়বে—এমন সময় মদন বাঁ হাত দিয়ে বদনকে থামালো। সন্তোষদা নাকি?

কে? মদনা? মাছ পেলি?

বদন কোচ নামালো। কোথায়! এভাবে আর চলছে না দাদা।

আমার সঙ্গে চলে আয়। কী ধারায় পুরুষমানুষ তোরা? বুকে সাহস নেই?

এবার পরিষ্কার সন্তোষকে দেখতে পেল ওরা। দেখে বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ছ'সাতখানা রেলের স্লিপার একসঙ্গে বেঁধে জলে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সন্তোষ টাকি। তার ওপর ছোট্ট হেরিকেন বসানো। নিজে বুকজলে দাঁড়িয়ে ঠেলতে ঠেলতে চলেছে। রেলের ছাপমারা সব কাঠের স্লিপার।

তোমার মত অত সাহস কোথায় পাবো সন্তোষদা! তুমি হলে গিয়ে

ডাকাবুকো লোক।

মাছ মেরে ক'পয়সা পাস? আমার সঙ্গে থাকবি ঘুরবি। পয়সার চিন্তা আমার। তোরা দু ভাই শুধু খেলে বেড়াবি। ভালো কথা। কাল দুপুরে ভদ্রাকে দেখা করতে বলিস তো।

মদনের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলো। যা ভেবেছে! সাইকেল আসে কোত্থেকে?

সন্তোষ টাকি ওদের পার হয়ে বেরিয়ে গেল। যাবে দুর্গার করাতকলে। খালপোলের ওদিকটায় ইলেকট্রিক নিয়ে কল বসিয়েছে। রাত ফরসা হবার আগেই চেরাই হয়ে স্লিপারগুলো নির্দোষ কাঠ হয়ে যাবে। আগেকার কোন চিহ্নই থাকবে না।

মদনের মনে পড়ল, তাদের দাদা ভদ্রেশ্বর ঘড়ি দেখে বলেছিল, কোন বিপদ আপদ হবে না তো? দেখিস কিন্তু—

এখন তো তার ঘরে ফিরে দাদাকে জাগিয়ে তোলার ইচ্ছে হচ্ছে। মুখের ওপর বলতে চায়—সাইকেল পেলে কোত্থেকে? কোন বিপদআপদ হবে না তো? দেখো কিন্তু—

মোট ছ'খানা ছিপের ভেতর দু'খানায় মাছ পেল। একটায় একটি কাতলা। সাতশো সাড়ে সাতশো হবে। আরেকটিতে একটি বড়সড় বান মাছ। এটা আজ বাড়ি গিয়ে খাবে ঠিক করল। কাতলাটা বাবুকে খেতে দেবে।

বাকী ছিপগুলো জায়গা বদলে বসিয়ে দিয়ে ওরা বাবুর মুরগি ঘরের কানাত থেকে কাঁথা বালিশ বের করে আনলো। ওখানেই রাখা থাকে। খিরিশ গাছের উঁচু গোড়ায় মুড়ি দিয়ে শোবার আগে আলোটা নিভিয়ে দিল। হাত জালের দড়ি খিরিশ গাছে বাঁধা। ছোট্ট জালের ভেতর কাতলা আর বান মাছটা জড়াজড়ি হবার যোগাড়। এভাবেই ওরা সকাল অব্দি থাকবে। শুতেই ঘুম ওদের দখল করে নিল। এখনো চারটে কুড়ির ফার্স্ট লোকালের ঘণ্টাখানেক বাকি।

শুধু জবেদের খোটি থেকে হইচই ভেসে আসছিল। ঈশ্বরীতলায় এই সময়টায় মাছের নীলাম বসে। চলে ফার্স্ট লোকাল অব্দি। চারদিকের ভেড়ি, দীঘি, খালের মাছ খোটিতে খোটিতে নীলাম হয় এখন। কুইন্টাল দরে। ডাক হতে থাকে। কলকাতার নানান বাজারের ব্যাপারীরা এখন কেনে। রাতের লাস্ট ট্রেনে এসে বসে থাকে।

খোটির সেই অস্পষ্ট কোলাহল ওদের দু'জনকে এই সময়ে রোজ ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আজও দিল। মুড়িসুড়ি মেরে দু'ভাই এখন একদম ছোটবেলায় চলে গেল। দু'জন দু'জনের ভীষণ কাছাকাছি। সেই ঘুমের ভেতর মদনের বুকের নীচের দিকটায় একটা ব্যথা টনটন করছিল। সে তার বুকের ভেতর উঠে বসে দেখতে পেলো, সাইকেলখানা একা একা ছুটে আসছে। কোম্পানি বাঁধের ওপর দিয়ে। সাইকেলে কোন লোক নেই। সামনের চাকার লোহার কাঠিগুলোয় আগুন ধরে গেছে। বাতাসে সে আগুনের মাথা থেঁতলে যাচ্ছে। এ অবস্থায় ছুটন্ত সাইকেলটাকে কেউ ধরতে পারছে না।

মদনের স্বপ্ন দেখার কোনরকম বাই নেই। এই ফিনফিনে পাতলা ঘুমের ভেতরেও সে বুঝতে পারছিল—জ্যোৎস্নার সঙ্গে এই সময় হিম ঝরে। যত চওড়াই হোক একখানা কাঁথায় দু ভাইয়ের হয় না। তার পা ঢাকা পড়েনি। সেখানটায় শীত এসে দাঁড়াচ্ছিল।

অনাথবন্ধুর সাদা রঙের বাড়ি এতক্ষণ এসব দেখছিল। সব দেখেও তাকে চুপচাপ থাকতে হয়। তার পাশ ফেরার উপায় নেই। জায়গা বদলাবারও উপায় নেই। সে শুধু দর্শক। ঈশ্বরীতলার এই ইতিহাস এবং ভূগোলে কয়েক বছর হল সেও জায়গা পেয়েছে।

এক জোড়া লক্ষ্মী পেঁচা উড়তে উড়তে জট পাকিয়ে থুপ করে বাড়িটার ছাদে পড়ল। বাড়ি তবু কিছু বলল না। সে সব কিছু দেখে যেতে লাগল শুধু। এখন এই তার কাজ।

॥ সাত ॥

সেদিন বাঘা সিনেমা দেখা ভণ্ডুল করে দেওয়ায় শান্তা চটেছিল। চটেনি টুকু আর লিলি। বাঘা ওদের ভাই। প্রথম এসে বাঘা শীতের রাতে বাড়ির বাইরে পাহারা দিতে চাইতো না। ভীষণ ভয়। অন্ধকার। শীত। ও দিব্যি টুকুর আর লিলির মাঝখানে লেপের ভেতর লুকিয়ে থাকতো। অনাথের চোখ থেকে এভাবে পালাতো।

সেদিন আধখানা ছবি দেখে ফেরার পথে স্টেশনবাজারে বাঘা একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গজরাতে লাগলো।

টুকু তাকিয়ে দেখে, ফটো তোলার নতুন দোকানটায় শো-কেসে প্রমাণ

পাইজের একটা কুকুরের ছবি। বাঘা তাই দেখে ক্ষেপেছে।

শান্তাও বুঝতে পারলো। বুঝে বাঘার কান ধরে টানলো। জ্যান্ত কুকুর দেখে পালাবে! আর এখন ছবির কুকুর দেখে যত সাহস! চল। বাড়ি চল।

লিলি বলল, মা বাঘার একটা ছবি তোলাও না।

কেন? ওর কি জন্মদিন?

যদি কোনদিন মরে যায়—

বালাই! মরবে কেন?

বুড়ো হয়েও তো মরতে পারে।

খুব পাকা কথা শেখা হয়েছে!

টুকু বলল, না মা—সত্যি ওর একটা ছবি তোলাও না।

তোলাতে গিয়ে অন্ধকার স্টুডিওর ভেতর বাঘা আরও ক্ষেপে গেল। ঈশ্বরীতলার দিলীপ শখের ছবি তুলতো। পার্ট টু ফেল করে দোকান দিয়েছে। তাকেই কামড়াতে গেল বাঘা।

দিলীপ বলল, ঠিক আছে বৌদি। আমি ক্যামেরা নিয়ে রোববার সকালে যাব। চা খাওয়াবেন। দাদাকে বলে রাখবেন। আমি ছবি তুলে নিয়ে আসবো।

রবিবার সকালে অনাথের বাড়িতে ঈশ্বরীতলার ইতিহাসে আরেকটি নজির স্থাপিত হল। শুধু বাঘা নয়—টুকুর বায়নায়—সবাইকে নিয়ে একখানা গ্রুপ ফটো তোলা হল। তোলা কি যায়! অরুণ বরুণকে সামলাতে না সামলাতে শুক্লা ফোকাসের বাইরে চলে যায়। বজ্জাতের গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে লিলি চেয়ারে বসেছে। টুকুর দুই পায়ের ভেতর অরুণ বরুণ দাঁড়িয়ে। বলাই মাটিতে বসেছে। পাতিহাঁসগুলো তার কোলে। মদন ধরেছে উমাকে। বদন কানাইকে। চেয়ারে শান্তা আর অনাথ। ব্যাকগ্রাউণ্ডে লেগহর্নগুলো পায়চারি করছে। সবার সামনে বাঘা।

ভোরবেলার ঈশ্বরীতলায় রোদ তখনো নরম। ফোকাসের ভেতরেই দিলীপ দেখতে পেল—দূরে দূরে এই আষাঢ়ের শুরুতেই হাল নেমেছে মাঠে। মাটি চষা থাকলে প্রথম বর্ষার জল বেঁধে রাখা যাবে। অপচয়ের ভয় থাকবে না। বাড়ির খানিকটাও লেন্সের ভেতর দেখতে পাচ্ছিল দিলীপ। সাটার টিপে তিনখানা ছবি নিল। থ্যাঙ্ক ইউ। ক'কপি করবো বৌদি?

ক'কপি আবার! এক কপি হলেই চলবে।

না না মা। চার কপি করাবেন। আমি স্কুলে নিয়ে দেখাবো সবাইকে।

টুকুর কথা অনাথ একটু একটু করে রেলিশ করছিল। এই গ্রুপ ফটোর জন্যে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে। দিলীপ ফোকাস ঠিক করে নিতে সময় নিয়েছে। এখন সাইকেলে ফিরে যাচ্ছে। অনাথ তার সাজানো জায়গায় নতুন বাড়ির উঠোনে সপরিবারে নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল। ভোরবেলার নতুন আলোয় সবই সুন্দর এখন। কোম্পানি বাঁধে তার হাতে বসানো গাছগুলো এখন ছায়া দেয়। ক্যাসিয়া গাছের হলুদগুঁড়ো ফুল দুপুরবেলার লাল সুরকিপথে আলাদা আলাদা হয়ে ছড়িয়ে থাকে।

শান্তা, আজ আমাদের এখানেই চা দাও।

ওরা চা খাবে কি !

না। সবাইকে দাও। মদন, বদন, বলাই—সবাইকে—

লিলির খুব ভাল লাগছিল। সকালবেলাতেই বনভোজনের ভাব। বাবু, আজ আমি তোমার সঙ্গে বাজারে যাবো।

আমি কি বাজারে যাবো ? শান্তার দিকে চাইলো অনাথ। বাজার করা একটা মজার জিনিস। লোকে বলে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। কাগজে লেখালেখি হয়। কিন্তু অনাথ একদম বুঝতে পারে না। বিশ পয়সার উচ্ছেতে তাদের তিনদিন হয়ে যায়। গৃহস্থ হওয়ার সুখের মধ্যে একটা বড় সুখ—ব্যাগ বোঝাই করে বাজার থেকে ফেরা। রান্নাঘরের সামনে ব্যাগ উলটে যখন অনাথ জিনিসপত্র ঢালে তখন বিজয়ীর ভাব এসে যায় তার। কিন্তু শান্তা তাকে বিশেষ বাজারে যেতে দেয় না। লিলি যখন একেবারে ছোটটি ছিল—তখন বলাই বাজার যাবার সময় ওকে মেয়েদের মতই কাঁখে বসিয়ে এক হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে বাজারে যেত।

চা শেষ হতে অনাথের নজরে পড়ল, খিরিশ গাছতলায় বিরাট সাইজের একটা লোক তার বাড়ির দিকে তাকিয়ে বসে আছে। চার মাসের গাভিন উমাকে খোটায় বেঁধে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে গেল বলাই। কানাইকে আজকাল ছাড়া হয় না। যাকে তাকে ঢুঁসিয়ে মেরে ফেলতে পারে। বজ্জাত, গুরু, অরুণ, বরুণ, পাতিহাঁসগুলো ছাড়া পেয়েই ছুটেছে। যায়নি শুধু বাবা। টুকু মুরগি ঘরে ডিম কুড়োতে ঢুকলো। বদন চায়ের কাপপ্লেট তুলে শান্তার পেছন পেছন রান্নাঘরে গেল। শান্তা ওকে এখনি কাল রাতের জল দেওয়া ভাত নয় তো বাসি রুটি দেবে। খেয়েদেয়ে বদন বাসনগুলো মেজে তুলে দিয়ে যাবে। নয়তো একা

বলাইয়ের ওপর ভীষণ চাপ পড়ে।

মদন ভাখ তো। কে একটা লোক এদিকে তাকিয়ে সেই থেকে বসে আছে—

কোথায় ?

ওই যে খিরিশতলায়—

মদন উঠে দাঁড়ালো। আরে ! ও তো মহম্মদ বাজিকর। খবর দিয়েছিলাম। মদন ছুটে গেল।

লিলি বুঝলো, আজ আর তার বাবু বাজারে যাবে না। একঝুড়ি ডিম নিয়ে টুকু বেরিয়ে এল মুরগি ঘর থেকে। বেরিয়েই ছুটলো রান্নাঘরে।

মদনকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে বাজিকর। কী পেল্লাই সাইজ। কোম্পানি বাঁধে দাঁড়িয়ে আছে চাহার দরবেশ গল্পের দরবেশের মত। পায়ে লাল কেডস্। গায়ে কালো আলখাল্লা—হাঁটু ছাড়িয়ে নেমে এসেছে। কাঁচাপাকা চুল ব্যাকব্রাস করেছে। কাছে আসতে দেখলো, চোখে সুরমা টানা। কাঁধে বাঁকানো লাঠির পেছনে পুঁটুলি ঝোলানো।

অনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বসতে দিল।

তলব করেছেন। তাই এলাম।

আপনার চেহারা তো এখানকার মত নয়। এদেশেরই নয়।

না। আমি বাঙালী। আপনিই তো অনাথবাবু। নাম প্রায়ই শুনি।

শান্তা বাইরে বেরিয়ে এসে ভ্রূ কোঁচকালো। কিন্তু চেহারার কী টান আছে। শান্তা নিজেও এসে অনাথের পাশে বসলো। মাথায় ঘোমটা তুলে দিল। তারপর খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো লোকটাকে। পঞ্চাশ-ষাটের ভেতর বয়স। কেডস্ জুতোয় পায়ের বড় পাতা আঁটেনি। ফুলে আছে। বড় বড় চোখ। মাথায় কাঁচাপাকা চুলের থাক থাক কোঁকড়া ঢেউ। চেয়ারের বাইরেও শরীরের অনেকটা বেরিয়ে আছে। খাড়াই নাকে সকালবেলার রোদ।

আপনার তো সুখের সংসার। ছবি তুলছিলেন দেখলাম।

কখন এসেছেন ? চলে আসেননি কেন ?

ভোর থেকে বসে আছি। আপনাদের ঘুম ভাঙলো। বাড়িটাকে দেখলাম বসে বসে। ফাঁকা মাঠের ভেতর আপনার শৌখিন বাড়ি ছবির মত দেখাচ্ছিল। আপনার বাড়িটার অবস্থা আমার মত।

কি রকম ?

আমার চেহারা কোথাও ঢাকতে পারিনে। বাজারে হুন কিনতে গেলেও লোকে তাকাবে। আপনার বাড়িও চোখে না পড়ে পারে না। আমাদের ভাগ্য!

এ কথায় মহম্মদ বাজিকরের চোখের দৃষ্টি উদাস হয়ে গেল।

কি জন্যে খবর করেছি—শুনেছেন নিশ্চয়।

হুঁ।

নিরপরাধ দুটো পাতিহাঁস হার্টফেল করে মারা গেল। একটা তো বেঁচে মরে আছে। আজও ভালো করে সাঁতার কাটে না। হয়তো ব্রেনে কিছু হয়েছে—

কিন্তু আপনি তো ওদের নির্বংশ করতে পারবেন না। ধরিত্রীর সঙ্গে সঙ্গে ওরা থাকবেই।

দরবেশের মত মানুষের মুখে ধরিত্রী কথাটা আশ্চর্য শোনালো।

ওরাও আছে। আমরাও আছি। অনাথবাবু—এদেশের মাঠেঘাটে আজ পঞ্চাশ বছর আমি ঘুরে বেড়াই। ওরাও আমায় চেনে। আমিও ওদের চিনি। মানুষ তো কত জিনিসের সঙ্গে পাশাপাশি থাকে। সন্ধ্যে হলে কান পেতে শুনবেন—আপনার বাড়ির ভিতের নীচ থেকে একনাগাড়ে শব্দ হচ্ছে—চিবি, চিবি, চিবি—। কিসের শব্দ বলুন তো?

ঝিঁ ঝিঁ?

উহুঁ। মা বসুমতীকে পুড়িয়ে ইট হয়। সেই ইটের গাঁথুনির নাম বাড়ি। তাতে আপনার আমার মত মানুষ যেমন আশ্রয় পায়—তেমনি প্রত্যেক বাড়ির নীচে একটি করে বাস্তুসাপ চিরকালের মত বসুমতী বন্দী করে রাখেন। সন্ধ্যে হলে সে ডাকবেই। জল দাও। জল দাও। বাতাস নেই একটুও। আমি আর পারছিনে। আমরা শুনি—চিবি, চিবি, চিবি—

বলার ভঙ্গীতে কিছু ছিল। অনাথ মাটির অন্ধকারে, বাড়ির বিশাল ওজনের নীচে বন্দী সাপের মাথাটা দেখতে পেল। জল-আর বাতাসের অভাবে একটি শীর্ণ জিভ। ফণার ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম। তীক্ষ্ণ চোখ জোড়া ঝিমিয়ে পড়েছে। শরীরের বাকিটা অন্ধ সুড়ঙ্গে আছাড় খাচ্ছে থেকে থেকে। আর একটানা আওয়াজ—চিবি, চিবি, চিব, চিব—। রোজ সন্ধ্যায় যে কোন বাড়ির মেঝে থেকে সে আওয়াজ বেরোয়। সঙ্গে সঙ্গে অনাথ স্থির করলো, লোকটা বানিয়ে বানিয়ে কথা বলছে।

খানিক পরে পুকুরের দিকের বারান্দায় মহম্মদ বাজিকরকে শাস্তা খেজুর পাতায় খোলপে পেতে দিল। তাতে বসে নমাজ সেরে নিয়ে বাজিকর বলল, আমি সূর্যপ্রণামও করি অনাথবাবু। মন্দির গীর্জে দেখলে আপনাআপনি হাত উঠে আসে কপালে। জোয়ান বয়সে নানা সাধনায় ছিলাম—

পড়াতে বসে নন্দবাবু বুঝি খাতা পাকিয়ে টুকুর মাথায় মারলো। বারান্দায় বসে শব্দ শুনে অনাথ আন্দাজ পেল।

অ্যানাসিন বা সেরিডন আছে বাড়িতে?

আছে। মাঠের মধ্যে থাকি বলে মাসকাবারি সব এনে রাখি। মাথা ধরেছে?

বাজিকর হেসে ফেলল। আমার নয়। একটা বড়ি দিন। দেখাচ্ছি।

শাস্তা এনে দিতে তার আধখানা ভেঙে নিয়ে বুড়ো আঙুলে মেঝেতে টিপে টিপে গুঁড়ো করে ফেলল বাজিকর। তারপর সেটুকু হোমিওপ্যাথির পুরিয়ার মত কাগজের টুকরোয় তুলে নিয়ে খোলপের ওপর রাখলো।

রেখে সঙ্গের পুঁটুলিটা খুলে ফেলতেই বেতের ছোট ঝাঁপি বেরোলো।

সাপ আছে নাকি? এখানে খুলবেন?

তবে কোথায় খুলবো! বলতে বলতে ঝাঁপির মুখ তুললো বাজিকর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বারো ইঞ্চি স্কেলের ধারায় মাথা নিয়ে ঠেলে উঠলো সাপটা। আলগোছে তার মাথাটি ধরে ফেলতেই সাপটা বাজিকরের হাতখানা জড়িয়ে ফেলল। বড় ন্যাওটা। এরই কৃপায় বেঁচে আছি।

হাতের কায়দায় মুখ ফাঁক করে তার ভেতরে পুরিয়ার সবটুকু গুঁড়ো ভরে দিল বাজিকর। মাথা ধরেছে বেচারার। বিষ ঢালা হয়নি তো। খানিক পরে ফোঁটা কয়েক জল খাওয়ালো সাপটাকে গণ্ডূষ করে। ততক্ষণে বাজিকরের হাতে লেজের প্যাঁচ আলগা হয়ে গেছে। ঝিমিয়ে পড়ছিল সাপটা। ঝাঁপিতে ভরে মহম্মদ বাজিকর খোলসা করে বলল, আজকাল তো ও জীব বিশেষ ধরিনে। তবে খাবো কি? তাই এই একটা রেখেছি—বিষ জমলে তবে বিক্রি করে চাল ডাল হয়। বিষ ঢালতে না পারায় ওর মাথা ধরেছে কাল থেকে। এখন ঘুমোবে খানিক।

আবার তো মাথা ধরবে।

নাঃ! কাল দুপুরের আগে নয়। ততক্ষণে খদ্দের এসে যাবে। বিষটা বের করে দিতে পারলেই আবার হালকা হয়ে যাবে বাছা। অমাবস্যা, পূর্ণিমা—যোগে

যোগে বিষ জমে। না ঢালতে পেরে ওরা বড় বেগ পায়। খুব সরল জীব।

কি কথা বললেন! সর্পের ন্যায় খল—আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি—

ওদের শিশুপাঠ থাকলে তাতেও আমাদের কথা ওভাবেই লেখা হোত। যাগ্ গিয়ে। আপনাকে আমি দু'চারটে শেকড় চেনাবো। তাতেই আপনার হয়ে যাবে। দেশসুদ্ধ সর্পনাশ তো কোন কাজের কথা নয়। আপনাকে বরং আমি অন্য জিনিসের স্বাদ দেব।

শান্তা ওমলেটের সঙ্গে চা দিতে এসে একথা শুনে চমকে উঠলো। এতক্ষণ সাপকে ওষুধ খাওয়ানো দেখেছে। শেষে কিসের স্বাদ দেবে? বিষের?

রোদ এখন ঝাঁ ঝাঁ করছে। বেলা ন'টাও বাজেনি। মহম্মদ বাজিকরের মাথার চুলগুলো উলটো বাতাসে ছন্ন হয়ে গেল। শ্যামাসঙ্গীত আমার বড় ভাল লাগে। নাথগানও দু'একখানা খুব ভাল আসে। আসলে কি জানেন—যে চিন্তা ঘাম দিয়ে আয় হয় না—তার কোন দাম নেই।

এ কথা বলছেন কেন?

এক একখানা গান শুনি আর ভাবি—এ গানের পদ কোত্থেকে মিললো? এ কি শুধু বসে থেকে থেকে আর পাঁচজনের মত সংসার করে পাওয়া? কক্ষনো না। কেউ পেয়েছে বেড়া বাঁধতে বসে। কেউ পেয়েছে নৌকোর বৈঠা বাইতে বাইতে। কেউ গুণ টানতে গিয়ে। প্রকৃতি সব সময় জানবেন—পরিশ্রমীর পাশ টেনে চলেন।

অনাথ অবাক্ হচ্ছিল। এ লোকের নাম বাজিকর কি করে হল? আজ আমাদের এখানে খাওয়াদাওয়া করে যান।

দিনে একবার খাই। খেয়েই বেরিয়েছি। শেষরাতে ঘুম ভেঙে গেল। বেশী রাতের জ্যোৎস্না। তাই বড় আদুরে। যেতেই চায় না। দিন ফোটার আগে সেই অন্ধকার সময়টায় হাঁড়ি থেকে জল দেওয়া ভাত তুলে নিলাম। আবার কাল খাবো। এখন উঠি।

আবার যে দেখা হওয়ার ইচ্ছে ছিল—

দেখা হয়ে যাবে।

আধচষা জমির আল ধরে ধরে মহম্মদ বাজিকর ঈশ্বরীতলার বড় দাগগুলো পেরিয়ে যাচ্ছিল। কাঁধের লাঠিতে ঝাঁপি সমেত পুঁটুলি ঝুলছে।

উমা একটি আছাড় খেল। এখন ভরা গর্ভ। এ সময়ে এ কাণ্ড চিন্তার বিষয়। অনেক কষ্টে উমাকে তিন-চারজন মিলে তুলে ধরলেও দাঁড়াতে পারে না। পেছনের পায়ে লেগেছে। সারাদিন শুয়ে বসে কাটায়। শেষে হাড়ো খাঁকে খবর দেওয়া হল।

চেক লুঙি, খালি গা, মাথাটা সাদা—এসে বলল, গাইয়ের পায়ের হাড় সরে গেছে। লোক ডাকুন।

দু'চারদিন বৃষ্টি হচ্ছে। মাঠের শুকনো ঘাসের চেহারা এখন তাজা। উমা ঘাসের দিকে তাকিয়ে থাকে। এগিয়ে গিয়ে খেতে পারে না।

হাড়ো খাঁ বলল, আমি হাড়ের ডাক্তারবাবু। তাই এদেশে আমার নাম হাড়ো খাঁ। নয়তো আমার আরেকটা নাম আছে।

মদন, বদন, বলাই মিলে উমাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছিল। হাড়ো খাঁ বাগানের দিকে এগিয়ে গিয়ে কলা গাছের গা থেকে একটা শুকনো বাসনা তুলে নিল। তারপর সেটাকেই ফিতে করে উমার হাঁটু থেকে দাবনা অব্দি মাপ নিল। আবার হাঁটু থেকে ক্ষুর অব্দিও মেপে দেখলো। চার পায়ের। উমাকে ওঠাতে বারণ করে আচমকা পেছনের ডান পায়ের সরু দিকটা ঠেলে ওপরে তুলে দিল। খচ্ করে আওয়াজ সবাই শুনতে পেল। আপনার গাই এবারে উঠে দাঁড়াবে। একটু পরেই—

সত্যি উমা উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়াতে গিয়ে থরথর করে কাঁপছিল।

হাড়ো খাঁ বলল, একটু সময় দিন। পা সেট হয়নি এখনো। আপনার গাইয়ের তো অ্যানিমিয়া হয়েছে। এ সময়ে রক্তাল্পতা খারাপ।

অনাথকে ঘাবড়ে যেতে দেখে সান্ত্বনা দিল হাড়ো খাঁ। কাউকে পাঠিয়ে 'বেলারমেল' ইঞ্জেকশন এনে দিন। সিরিঞ্জ আছে আমার সঙ্গে। দিয়ে দিচ্ছি।

ওষুধ এসে গেল বাজার থেকে। কিন্তু ইঞ্জেকশনের পদ্ধতি আশ্চর্য! হাড়ো খাঁর সিরিঞ্জ মানে ছোটখাটো একটি পিচকিরি। ছুঁচ না বল্লম! আগে দূর থেকে ছুঁচটা ছুঁড়ে দিয়ে উমার দাবনায় গেঁথে ফেলল। তারপর কাঁচের পিচকিরিতে অ্যামপুলের পুরো ওষুধটা ঢেলে নিল। উমার কাছে গিয়ে সাবধানে সেই পিচকিরি ছুঁচের সঙ্গে প্যাঁক দিয়ে বসালো হাড়ো খাঁ। তারপর ওষুধটুকু শরীরে পাঠিয়ে দিল। এভাবে করলে ছুঁচ ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকে না। আরও পাঁচটা ইঞ্জেকশন দিতে হবে।

অনাথ অবাক হচ্ছিল। এতদিন সে রেডিও, খবরের কাগজ, হেলথ্ সেন্টারের

কথা শুনে এসেছে। কিন্তু এসব জিনিস এখনো কত জায়গায় পৌঁছয়নি!' চন্দনেশ্বরের ওপাশে কাগজ যায় না। অনেক জায়গা সে দেখেছে—যেখানে ডাকঘর দূরের কথা—গরুর গাড়িও চলেনি কোনদিন। এসব জায়গায় কিন্তু হাড়ো খাঁ যায়। মহম্মদ বাজিকর যায়। চৈত্রসংক্রান্তির মেলা বসে। নানা রকমের গোবদ্যি সারা দেশে ছড়ানো। কেউ শেকড় জানে। কেউ ইঞ্জেকশন দেয়।

আমার আসল নাম অচিন্ত্য মালখণ্ডী। দরকার পড়লে খেয়াদায় লোক পাঠিয়ে দেবেন। গাঁয়ের ভেতরে ঢুকে বলতে হবে, মালখণ্ডীদের বাড়ি কোন্‌টা!

উমা হেঁটে বেড়াচ্ছিল। অনাথ বলল, বাকী ইঞ্জেকশনগুলো কে দেবে?

আনিয়ে রাখবেন। আমি এসে দিয়ে যাবো।

এক একজন লোক তার কাছে আসে। আর কোম্পানি বাঁধ ধরে ফিরে যায়। তাদের হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গী বারান্দায় বসে থাকা অনাথের বুকে ছাপ ফেলে যায়। হাড়ো খাঁ হেঁটে যাচ্ছিল। কারো গাই আছাড় খেলে—কারো গাই রক্তাল্পতায় ভুগলে—হাড়ো খাঁ সেখানে যাবে।

ওষ্ট বাওড়ের জলে ডুব দিল। আষাঢ়ের মাঝামাঝি। বৃষ্টি আসে। যায়। আবার আসে। কোন ঠিক নেই।

ডুব দিয়ে ওষ্ট কোন গোড়া খুঁজে পেল না। এতক্ষণ তার বৌদি সঙ্গে ছিল। দুপুরের আর বিশেষ বাকী ছিল না। ফাঁকা বাওড়। দূর দিয়ে রেলগাড়ি গেলে জলের বুকটা থিরথির করে কাঁপে। বৌদি যাবার আগে বলে গেছে—অ্যাত্‌খোন ধরে মুসুরিবাটা মাখালাম। কাদা ঘেঁটে আবার কালি হয়ে ফিরো না।

বৌদি আজ তার জন্যে অনেক কিছু করেছে। ঝামায় গোড়ালি ঘষে দিয়েছে। ব্যাসন দিয়ে মাথা ঘষেছে। 'আরেকটু সাঁতরে যাই' বলে এই ফাঁকা বাওড়ে ওষ্ট একা থেকে গিয়েছে। এ সময়টা রাখালরা মাঝে মাঝে গরু নিয়ে নামে। ওদিকটায়। সেখানে জল অনেক কম।

এখানে কিন্তু বেশী। শাপলার সঙ্গে ভ্যাট ফুলের ডাঁটির গোড়া খুঁজছিল ওষ্ট। ডুব দিয়ে দিয়ে। ভ্যাট ফুলের ভেতরটা ভেঙে ফেলে আতার মত খেতে লাগে। আবার ডুব দিল ওষ্ট। এবারে জলের নীচে ডুব দিয়ে মাথাটাকে ওষ্ট সোজা শাপলা ফুলের গোড়ার শেকড়ের কাছে নিয়ে গেল। বুক ভরে অনেকটা নিঃশ্বাস ভেতরে নিয়ে তবে ডুব দিয়েছে। শাপলার গোড়ার কাছে গিয়ে খুব লোভ হলো ওষ্টর। একদম কচি কোড়ের শাপলা। তুলে নিয়ে গেলে বৌদি

-বড় সুন্দর করে রাঁধে। ভ্যাট ফুলের কথা ভুলে গিয়ে দু'হাতে শাপলার কোড় ছিঁড়তে লাগল। একবার যেন মনে পড়ল, মা বলেছিল—শাপলার ভ্যাট খাবি নে। ওতে সাপের বিষ মেখে থাকে। কোন্ দিন মারা পড়বি!

এ কথা মনে পড়তে পড়তে ওষ্ট বুঝতে পারলো না—সে স্বপ্নে আছে—না বাওড়ের জলের নীচে আছে। সবই আলগা লাগছে। হাতের শাপলাগুলো আঙুল খুলে বেরিয়ে গেল। বুকের কাপড় গলায় জড়িয়ে যাচ্ছে। ও আর বংশী বেশী রাতে উঠোনে বসে আছে। দাওয়ায় হেলান দিয়ে রাখা সাইকেলখানা বাঁশবাগানের মাথার ওপর দিয়ে পাঠানো জ্যোৎস্নায় চিক চিক করে উঠলো। শুকনো মাটিতে সাদা উঠোন। তাতে বংশী উবু হয়ে বসেছে। তার দিকে তাকাতে এই প্রথম বংশীর মুখখানা দেখতে পেল ওষ্ট। কী সুন্দর! বাঁ গালে একটা লালচে জড়ুলের দাগ। মাগো—

চোখে জল ঢুকে যাচ্ছে ওষ্টর। অথচ কোন ব্যথা নেই।

শেষবেলায় ভাত চাপিয়েছে মহম্মদ বাজিকর। মাটি খুঁড়ে বসানো কাঠের আঁচে বাতাস মিশে গিয়ে আগুন জলে উঠছিল ধা ধা করে। বাওড়ের গায়ে বড় বড় গাছগুলোতে এখন কোন পাখি নেই। গাছতলায় শুকনো পাতাগুলো বাতাসের সঙ্গে খড়মড় করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সরা তুলে বাজিকর দেখলো, ভাত আরও ফুলবে। জল চাই।

নারকেলমালা হাতে নিয়ে বাওড়ে গেল মহম্মদ। কাছাকাছি গিয়ে দেখলো, পাড়ের খানিক দূরেই একখানা শাড়ির আঁচল একটু একটু ভেসে উঠছে—আবার তলিয়ে যাচ্ছে। হাতের মালাটা পাড়ে ছুঁড়ে দিল বাজিকর। গায়ের আলখাল্লা এক ঝটকায় খুলে ফেলল। এই সময় বাজিকরের চেহারা একদম অমানুষিক। পরনে শুধু রাসবাড়ির আদালত-হাটে কেনা একটা ইজের। এক ডুবে বাজিকর ভাসা শাড়ির আঁচল ধরে ধরে ওষ্টকে পেয়ে গেল। হাত দশেকও জল হবে না সেখানে। মেয়েটা ঠাণ্ডা পাঁক মাটিতে ভারী ইঁটের মত পড়ে আছে। ওপরে টেনে এনে একদম পাড়ে তুলে ফেলল বাজিকর। অনেকদিন ডুব-সাঁতারের অভ্যেস নেই। মেয়েটার পাশে বসে হাঁপাতে লাগলো। ভাতে ধরা গন্ধ দিয়েছে। আর খানিক থাকলে সন্ধ্যোনাগাদ মেয়েটা ভেসে উঠতো। কোন মতে উঠে দাঁড়িয়ে ওষ্টকে উপুড় করলো। তারপর ভিজে শাড়ি নিংড়ে নিয়ে গায়ে মেলে দিল। দিয়ে বাজিকরের মনে পড়লো, এখন তো তার বসে থাকার উপায় নেই কোন। শাপলার শিকড়ে পা আটকে কতক্ষণ পড়েছিল কে জানে!

গলায় শাড়ির ফাঁস!

মেয়েটাকে বসিয়ে দিয়ে মুখের ভেতর ঘাস লতাপাতা গুঁজে বমি করিয়ে ফেলল। মিনিট তিনেকের ভেতর। ওষ্ট চোখ মেলে তাকালো। সে দৃষ্টি জীবনের ওপারের। চোখের সাদা জমিটুকু ঘোলাটে। তাতে কালো গোল ছুটো ফিকে হয়ে এসেছে। বাজিকর দেখেই বুঝলো, জাতক এখনো তার জীবনের স্মৃতিতে ফিরে আসতে পারেনি।

এবারে ওষ্টকে শুইয়ে দিয়ে মহম্মদ বাজিকরের দীর্ঘ দেহখানা কুঁজো হয়ে প্রায় কুকুরের মত মাটি শুঁকতে শুঁকতে ছুটে গেল বটতলার দিকে। কোন পাখি, সাপ, কাঠবিড়ালি বা গরু—যদি তাকে এ অবস্থায় দেখতো তাহলে ভিরমি খেতো। একটা বেঢপ সাইজের ফ্যাকাশে রঙের মানুষ। তার ভরাট চাপদাড়ি ভিজে গিয়ে বুকে নেতিয়ে পড়েছে। পিশাচ কিংবা অপার্থিব কোন প্রাণী যেন খাবারের খোঁজে মাটি শুঁকে শুঁকে এগোচ্ছে। দরকারী বুনো গাছের মূল তুলে ফেললো মাটি থেকে। তারপর সেটা ওষ্টর কষের দাঁতে বসিয়ে দিয়ে বলল, এবারে চিবিয়ে ফেল্ মা। জোরে—

সে শক্তিটুকুও ছিল না ওষ্টর। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বেশ জোরেই চেঁচিয়ে বলতে হল বাজিকরকে। প্রাণায়নী মূল। জোরে চেপে ধরো দাঁতে।

বাজিকর বুঝলো, মেয়েটা এবারে ধাতস্থ হচ্ছে। স্মৃতিতে ফিরে এলে তাকে দেখেই হয়তো আবার জ্ঞান হারাবে। বাজিকর উঠে গিয়ে আলখাল্লাটা মাথায় গলিয়ে নিল। তারপর ঝাঁপির গায়ে গোঁজা কাঁকোইখানা দিয়ে প্রথমে মাথার চুল ঠিক করলো। তারপর দাড়ি। এতক্ষণে ভাতের হাঁড়িটা চোখে পড়ল। সরা তুলে দেখলো, আধো ফোলা ভাতগুলো আবার চাল হয়ে গেছে।

এত ছুটোছুটির ভেতরেও একটা আওয়াজ সেই থেকে পাচ্ছিল। স্টেশন বাজারের দিক থেকে ভেসে আসছে। ক'দিন থেকে চারদিকে এই আওয়াজ। যেখানেই যায়—শুনতে পায় মহম্মদ। কয়েক বছর অন্তর—বছরের একটা সময়ে ঢাকের বাজনার মত আওয়াজটা ভেসে বেড়ায় বাতাসে। ভোট দাও! ভোট দাও! ভোট দাও!

বুড়ো গাছের বাকলে কাঠ-ঠোকরা এরকম শব্দ করেই ঠোঁট বাজায়।

জায়গা কেনার সময় কোম্পানি বাঁধ ঘেঁষে একটা হরিতকি গাছ পেয়েছিল অনাথ। বাড়ি করার সময় শান্তা তাকে কাটতে দেয়নি। সারাটা বাড়ি ফাঁকা।

অবেলায় ঘুম ভেঙে গিয়ে শান্তা প্রথমে উঠতে পারলো না। সব স্মৃতি হারানো এ ঘুম বড় মনোরম। জানালার শিকের বাইরে বাঁধের ওপর দাঁড়ানো হরিতকি গাছ। তাতে পাখিদের আড্ডা। কিচিরমিচির লেগেই আছে। শুয়ে শুয়ে সব দেখছিল শান্তা। এ দেখা ভীষণ আরামের।

জানালায় গাছটার যেটুকু ধরা পড়েছে—তা-ই এখন পুরোদস্তুর একখানা ছবি। সেই ছবির ভেতর—শান্তা শুয়ে-শুয়েই দেখছিল—একটা সাদা জিনিস ঢুকলো। খুব সাবধানে ঢুকছে।

শান্তা উঠে বসে চেঁচিয়ে ডাকলো, এই বজ্জাত! নেমে আয় বলছি। নেমে আয়—

আসলে তো বজ্জাত একটা হুলো বেড়াল। সে কান দেবে কেন? অন্য সময় হলে মিয়াঁও বলে ফিরে তাকাতো। এখন তো খাওয়াদাওয়ার সময় নয় যে, ডাক শুনে পাতের পাশে এসে বসবে। তাছাড়া শান্তার ডাকে এখন বজ্জাত সাড়া দিতে পারবে না। তার গলার আওয়াজ পেলে পাখিরা পালাবে। ওদের একটা বাসা আজ অনেকদিন হল নীচে বসে বসে দেখে-টেকে রেখেছে বজ্জাত। তার সাড়া পেয়ে সব পাখি উড়ে পালালেও একটা-দুটো ছানা কি পাবে না ও বাসায়! হতেই পারে না।

বজ্জাত যেমন এগোচ্ছিল তেমন এগোতে লাগল। পেছল কাণ্ডের ওপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে। একটু এদিক ওদিক হলেই ধপাস।

এই বজ্জাত, নেমে আয়! উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলো শান্তা।

বজ্জাত তখন একটা উঁচু ডালের পাতার ঝুপসিতে ঢাকা পড়ে গেছে।

দশ গোনার সময়ও পেরোয়নি। ডালপালার ভেতর থেকে বজ্জাত ফ্যাঁস মত একটা আওয়াজ করল।

আহা রে। চোখ বুজে ফেলল শান্তা। কোন্ পাখির প্রাণ গেল।

এবার অনেক জোরে। ডালপালার ভেতরে গা ঘষটানোর আওয়াজ। শান্তা দেখতে দেখতে একেবারে স্ট্যাচু হয়ে গেল। বজ্জাত ঘুরতে ঘুরতে ধপাস করে নীচে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে একপাল ঘন কালো মাছি নেমে এল। সাদা বজ্জাতকে মাছিরা ঢেকে কালো করে ফেললো। তারই ভেতর একবার বোধ হয় একটু পাশ ফেরার চেষ্টা করলো বজ্জাত। সামান্য সময়।

বিকেলবেলার পাতলা রোদ। সবুজ ঘাসের ওপর কালো রঙের বজ্জাত পড়ে আছে। মাছিগুলো কালো উড়ন্ত একটা বলা হয়ে ঘুরতে ঘুরতে আবার হরি-

তকির উঁচু ডালে উঠে গেল। বজ্জাত তার আগেকার রঙ কিন্তু আর ফিরে পেল না। কেমন হলদে হয়ে পড়ে আছে ঘাসে। থিরথির করে কাঁপলো একটু। তারপর থেমে গেল। শান্তা জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। একটুও নড়তে পারলো না। একবার মনে হল—সন্ধ্যের ঠিক আগেকার রোদে বোধ হয় একটু হলুদ থাকে। তাই লেগে আছে বজ্জাতের গায়ে।

এই বজ্জাত—! বজ্জাত!

কোন সাড়া দিল না। বাড়িতে কেউ নেই। সদর দরজা খোলা। বলাই বোধ হয় আশেপাশেই আছে। উমা সেই দূরে ঘাস খাচ্ছে। শান্তা উঠোন দিয়ে হেঁটে গিয়ে বজ্জাতের সামনে দাঁড়াল। পাশ ফিরে শুয়ে আছে। হাত দিয়ে টানতেই ওর মুখখানা এদিকে ফিরে গেল। আকাশের মুখোমুখি। বাঁ চোখে উঠোনের মাটি ঢুকে গেছে। অন্যটা খোলা। সেখানে চোখ নেই কোন। চোখের মত একটা জিনিস ফেটে থেঁতলে আছে। তাতে রক্ত। বিকেল ঝলে কালচে লাগলো।

শান্তা ছেড়ে দিতেই বজ্জাতের মুখখানা আবার মাটির দিকে ঢলে পড়লো। ওপরে তাকিয়ে বুঝলো ডালপালা নিয়ে হরিতকি গাছটা এবার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। তার ওপরে নীল রঙের আকাশ। আজ সম্ভবতঃ চাঁদ ওঠার দিন নয়। নতুন বাড়িটায় কেউ নেই। আশেপাশেও কেউ নেই এখন। খানিক আগের বজ্জাতের মতই তার গা থিরথির করে কেঁপে গেল। তবু শান্তা সাহস করে হরিতকি গাছটার দিকে তাকালো। পাখিরা সবাই ফিরেছে। তাই কিচির-মিচির বাড়ছে। এখুনি অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে থামবে। শান্তা বুঝলো, ওখান থেকেই উড়ন্ত কালো দলটা নেমে এসেছিল। তার পায়ের কাছে বজ্জাত পড়ে আছে। এক্ষুনি কালো হয়ে যাবে অন্ধকারে। বলাই সেদিন বলেছিল বটে, চাক বাঁধছে মৌমাছিরা—হরিতকির মগডালে।

॥ আট ॥

দুধ দুইছিল বলাই। বড় দোহালের কায়দায় বালতি নিয়ে দুই হাঁটুর মাঝখানে। মুখে আওয়াজ। উমা তার খুব বাধ্য। সকাল বিকেল দু'বার দুইতে হয়। এখন দুধ একদম শুকিয়ে এসেছে। তবু দেড় কেজি মত হয়। ঘন ক্ষীর একেবারে। এক সেরে একপো টাইট ছানা। গোয়ালের দরজার দিকে উমা

পেছন ফিরে দুধ দিচ্ছিল। বলাই পিঠ দিয়ে সরে বললো। এক জ্বালা! সকাল বিকেল দোয়ার সময় যত হাটুরে লোক এসে হাজির হবে। কতদিনের গাভিন? কতটা দুধ দেবে? রোজ খাইখরচ কত? বয়স কত? হাজার প্রশ্ন। আর ফিরে ফিরে উমার ওলান দেখবে। নজর দেবে। আবার তিনজন এসে এই সকালবেলায় দাঁড়িয়েছে আজ।

দুধের বালতি ঘরে তুলে দিয়ে এসে বলাই বলল, বাবু ওঠেনি এখনো। ঘুমুচ্ছে।

ওদের একজন বলল, কানাই কোথায়?

বলাইয়ের মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি কাজ করলো। মনে মনে বলল, কানাই তোমার ইয়ার-বকসি? কানাইকে কেনা‌র লোভ হয়েছে? আচ্ছা! মুখে বলল, ডেকে দিচ্ছি।

গোয়ালের ভেতরে গিয়ে কানাইয়ের দড়ি আলগা দিয়ে বাইরে নিয়ে এলো বলাই। তারপর লোক তিনটের সামনে এনে বলল, আলাপ পরিচয় করে নাও।

বয়স কত?

বছর দুই হতে পারে।

ওরা তিনজন তো অবাক্। কানাইকে বলদ করে নিলে তো একাই ষোল বিঘে জায়গা চষবে এক মরসুমে। জমি ভাঙা থেকে শুরু করে একদম তৈরী করা পর্যন্ত সব একাই পারবে। জুড়িদার বলদের আর দরকার হবে না। অবশ্য কানাইয়ের জুড়িদার পাওয়াও কঠিন।

প্রায়ই এরকম খদ্দের আসে। কানাই তাদের দেখে। আজ তার গায়ে বলাইয়ের হাত বুলোনোর ভেতর কি ছিল। আচমকা কানাই সামনের পা তুলে লাফাতে লাগল। তিন-তিনজন খদ্দের—কিংবা খদ্দের একজন। সঙ্গী দু'জন। তারা কোম্পানি বাঁধের কানাৎ ঘেঁষে নীচে নেমে পড়ল। আর নামলেই জল। কানাই সে অব্দি তাড়া করে গেল।

ওদের তিনজনের একজন জলে পড়ে গিয়ে চেঁচাতে লাগলো। ও মাহিন্দির —বাছুরটা ধরতে বলো না! এ জিনিস হালে জুতে পোষ মানানো যাবে না।

বলাই কানাইকে ধরে গোয়ালের সামনের জমিতে বেঁধে দিল। ওরা তিন-জন খালে পড়ে থাকলো—না, খাল পেরিয়ে রেল লাইনের দিকে এগোলো—সে জিনিস দেখার সময় নেই এখন বলাইয়ের। পাতিহাঁসের ঘরের দরজা খুলতে হবে। বাঘা সারারাত জেগে বারান্দায় পায়চারি করেছে। তাকে তার ঘরে

শুইয়ে দিয়ে ঘর অন্ধকারের ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে বাথার ঘুম আসে না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে অরুণ বরুণদের ঘরের ঝাঁপ খুলে ফেলল বলাই। রাজহাঁস দুটো তড়বড় করে বেরিয়ে এল। সূর্য চন্দনেশ্বরের গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে টাটকা আলো এইমাত্র পাঠিয়ে দিল।

অনেকদিন বাদে অনাথ বেলাবেলি বাজার করে ফিরছিল। শ্যাম পালের নিজের ভেড়ি আছে। নিজের মাছ নিলামের খোটি আছে। সেখান থেকেই টাটকা বাগদা চিংড়ি কিনেছে অনাথ। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছিল।

স্টেশনবাজার ছাড়িয়ে লেভেল ক্রসিংএ এসে দেখলো, রিকশা যাচ্ছে না। তিনখানা গো-গাড়ি রাস্তা না পেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ভীষণ ভিড়। এগোবার উপায় নেই কোন। সবচেয়ে ভিড় নিশাপতিদের সাইকেলের দোকানের সামনে। দু'জন লোক ছুটে বেরিয়ে গেল। একজনের জামায় রক্তের দাগ। অন্যজনের বুকপকেট খাবলা হয়ে ঝুলে পড়েছে। ভিড়ের যেখানটায় গোলমাল—সেই আসল জায়গায় লোক স'রিয়ে ঢোকা গেল না। অনাথ দূর থেকে সন্তোষ টাকির গলার আওয়াজ পেল। হম্বিতম্বি সহকারে কাকে যেন খুব পেটাচ্ছে। সঙ্গে তার নিজের লোকেরাও আছে। তারা এই বিনে টিকিটের সার্কাসে ভিড় সামলাচ্ছে।

ভিড় পেরিয়ে বাড়ির পথে অনাথ যা শুনলো তা হল, দক্ষিণা চক্কোত্তীর হয়ে সন্তোষ টাকি এখন ভাগী বন্দোবস্তের প্রজাদের সিধে করছে। দক্ষিণার জমি-জায়গা বাপকেলে। পরিমাণ কম নয়। তাছাড়া বিন্ধ্যেশ্বরীর চরের লাগোয়া বেশ কিছু পয়োস্তি সারি জমি নদী মরে যাওয়ায় দক্ষিণার দখলে এসেছে। তা বিশ-ত্রিশ বিঘে তো বটেই। বালি জায়গা। ভালো তরমুজ, ফুটি হচ্ছে আজ ক'বছর। সে জায়গায় ক'জনকে বন্দোবস্ত দিয়েছিল দক্ষিণা। তাদেরই একজন ও বছরের তরমুজের তোলা দেয়নি বলে নিশাপতির দোকানের সামনে এই ভিড়। দক্ষিণা ভাগী প্রজা সিধে করার ভার দিয়েছে সন্তোষ টাকিকে। লোকে বলছে, এ বাবদে থানা-পুলিস সামলানোর ভার দক্ষিণা স্বয়ং নিয়েছে। অনাথ বাড়ি ঢোকার মুখেও সন্তোষের হাতে লাঠি, গলায় দাবড়ানি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। শুনতে পাচ্ছিল।

চরের পয়োস্তি জায়গা ভাগে নিয়ে চাষ করতে হলে সারারাত সেখানে কুঁড়ি বেঁধে পড়ে থাকতে হয়। নইলে শশা, তরমুজ, চিচিঙ্গে কোনোটাই চোরের হাত

থেকে বাঁচানো যাবে না। দিনে সেখানে বালি জায়গা তেতে গিয়ে গরম। রাতে আবার অনাসৃষ্টি শীত। খুব সাবধানী চাষী না হলে এসব জায়গায় টিকতে পারে না। শেষে খাটুনিই সার হয়। গতর খাটুনি, জমিদারের ভাগ তো আছেই। তারপর আছে দৈব। সে রকমই কোন ব্যর্থ চাষী আজ মার খাচ্ছিল সন্তোষের হাতে। দক্ষিণা এ ধরনের চাষীদের উৎখাত করছে—এ খবর এখানে সবাই জানে। চাষীদের কথা—আমরা গতর দিয়ে এই তিন বছরে জায়গাটা দামী করে দিলাম। আর দুটো বছর সুযোগ দাও। সুদে আসলে পয়সা উঠে আসবে। জমিদারকে খুশী করে দেব। দক্ষিণা শোনেনি। নতুন প্রজা পত্তনী দেবে। তারা নগদ টাকা দেবে বেশী। তাছাড়া এখন কত পয়সা দরকার দক্ষিণার। সামনে ভোট। মাইক। মোটর গাড়ি। পোস্টার। গাঁয়ে গাঁয়ে স্লোগান ভাসছে বাতাসে—জনতার প্রার্থী, দক্ষিণা চক্কোত্তী।

•

পঞ্চাননতলার উলটোদিকেই পঞ্চানন অপেরা পার্টির অফিস। আজ বেশ কিছুকাল তালা বন্ধ। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় রিহার্সেলের গলা আর পাওয়া যায় না। সে-ঘরের বারান্দায় তিনজন বসে দুলে দুলে বিড়ি বাঁধছিল।

কলকাতা থেকে তিনটে কুড়ির ট্রেন এসে দাঁড়ালো। ঠিক এই সময়ে জটা ধরা মাথা নিয়ে একটা লোক পঞ্চাননতলার সামনের রাস্তায় চেঁচাতে লাগলো। যেন কেউ তাকে মেরে ফেলছে—এরকম চিৎকার। বাবা গো। মা গো। আমায় ছেড়ে দাও। লাগছে ভীষণ।

মজার কথা কেউ তাকে ধরেওনি। একটু পরে লোকটি শান্ত হল। যারা বিড়ি বাঁধছিল—তাদেরই একজন এক ঘটি জল এগিয়ে দিল। খেয়ে নাও জগেনদা।

বারান্দায় বসে জগেন বলল, একখানা বড় বাতাসা চাই।

তাও এনে দিল ওরা। জল খেয়ে জগেন বলল, কেমন অ্যাক্টিং করলাম বল তো?

চমৎকার! এখন বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকো। রোদ কেমন তেতে আছে দেখছো?

কোথায়! আমার তো বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। তাই তো কোট গায়ে দিয়ে আছি।

যে জল দিয়েছিল—সে কিছু না বলে চুপচাপ তাকিয়ে থাকলো। এই গরমে

ইলেকট্রিক ট্রেন আগুন হয়ে আছে। বাতাস নেই একটুও। পঞ্চাননতলার মাথায় ছায়া ধরা গাছটার একটি পাতাও নড়ছে না। বলে কিনা—শীত করছে!

ডাব, তাড়ি, মাছ নিয়ে যারা কলকাতায় যায়—তারা এই ট্রেনে ফিরে এখন ঘরমুখো। তাদের একজনকে দাঁড় করিয়ে জগেন একটা সিগারেট নিল। সিগারেটটা ব্যোম টানে খেল। তারপর আবার সেই চিৎকার। আমায় ধরে নিয়ে যেও না। ছেড়ে দাও বলছি—

দক্ষিণা চক্কোত্তির ছোট ছেলে বিকাশ কলকাতায় আশুতোষ কলেজে পড়ে। সবে ভরতি হয়েছে। হাফপ্যাণ্ট ছেড়ে ধুতি এখনো সড়গড় হয়নি। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জগেনকে দেখছিল। কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, কে ধরেছে তোমায়?

আমায় ছাড়িয়ে দাও। একটু কষ্ট কর। বড় লাগছে।

কে ধরে আছে তোমায়?

চিনি নে—

রাস্তার লোক কেউ জগেনকে দেখে। কেউ দেখে না। আগে সে ছিল—জগেন যাত্রা। এখন সে জগেন পাগলা। লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে বাঁ হাতে স্টেশনবাজারের মুখে জগেনের জুতোর দোকান। আজ বেশ কিছুদিন সে দোকান তালাবন্ধ।

খালপোল পেরিয়ে বিকাশ বাড়ি ফিরলো। এই সময়টা তার খুব ভাল লাগে। এখন ঈশ্বরীতলায় ছায়া পড়ে আসে। সন্ধ্যের মুখে বাতাস দেয়। সবুজ রঙের ইলেকট্রিক ট্রেনকে পরের স্টেশনের দিকে ছুটতে দেখা যায়। সেই তুলনায় কলকাতায় সে কোন রঙ দেখতে পায় না। সারা শহরটা কেমন ঠোঙা-ঠোঙা লাগে।

সন্ধ্যের মুখে বিকাশ দেখলো—লিলিকে নিয়ে টুকু কোম্পানি বাঁধে ঘুরছে। সঙ্গে ওদের বাঘা। এই কুকুরটাই যত নষ্টের গোড়া। একদিন সে টুকুর সঙ্গে কথা বলছিল। এমন করে কুকুরটা এগিয়ে এল কি বলবে! তখন কি কিছু বলা যায়!

বিকাশ এক্সারসাইজ বুক থেকে একখানা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে লিখতে বসলো। প্রিয় টুকু—

উমার ব্যথা উঠলো দুপুরে। অনাথ আর অফিস যেতে পারলো না। বিকেলের আগেই বাচ্চা দিল। এঁড়ে। সন্ধ্যের মুখে দেখা গেল—নতুন সাদা রঙের বাচ্চাটা তিড়িং তিড়িং লাফাতে চায়। কিন্তু পারছে না।

বলাই অনেকক্ষণ ধরে উমাকে দুয়ে প্রায় এক বালতি দুধ বের করলো। এ দুধ বাছুর খেতে পারবে না। এ দুধ মানুষ খেতে পারবে না। খেলে পেট ছাড়বে। সন্ধ্যের এক বালতি দুধ বলাইয়ের কাঁধে চাপিয়ে শান্তা পঞ্চাননতলায় চলল। সঙ্গে টুকু আর লিলি। উমার নতুন ছেলেকে বাঁচানোর জন্যে কানাইকে বেঁধে রাখতে হয়েছে। নয়তো ঢুঁসিয়েই মেরে দেবে। বাচ্চা দিয়ে উমা এখন খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বিরাট এক গামলা খাবার পেয়েছে। বেশী করে ফেন, গুড, চুনিভুষি মেশানো হয়েছে কুচো খড়ের সঙ্গে। খাচ্ছে আর মুখ তুলে নতুন বাচ্চাটাকে দেখছিল।

জানলার কাছে বসে অনাথ সবে তার খাতা খুলেছে। এখন বাড়ি খালি। শান্তার পেছন পেছন টুকু যাচ্ছিল। তার গলা শুনতে পেল। বলাইকে বলছে, উমা দিনে কতটা দুধ দেবে?

বলাই কি একটা বলল। টেবিলে বসে থাকা অনাথ এত দূর থেকে কিছু শুনতে পেল না। বোধ হয় শান্তা ধমক দিয়ে উঠলো। অনাথ কোম্পানি বাঁধ দিয়ে তার নিজের বউ, দুই মেয়ে, বলাইকে হেঁটে যেতে দেখতে পেল। শান্তার মাথায় ঘোমটা। অন্ধকার হয়ে আসা আলোয় সহযাত্রী টুকু আর লিলিকে দুটো কালো রঙের সরল রেখার চেয়ে বেশী কিছু দেখাচ্ছিল না। সবার আগে আগে বাঘা।

তাড়াতাড়ি খাতা খুলে বসলো অনাথবন্ধু। ইদানীং অনেক কথা তার মনে আসে। পরে ভুলে যায়। আজ থেকে সে লিখে রাখবে। এই মুহূর্তে উমার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের অন্য তৃপ্তিতে অনাথ কোম্পানি বাঁধের ওপরকার আকাশে তাকালো। সন্ধ্যার রক্তরঙের আকাশে দু'খানা মেঘ ঝুলছে। আকাশ একখানা বাড়ি হলে—মেঘ দু'খানা তার দরজা। সে বাড়িতে আগুন ধরে গেছে। দৃষ্টি থেকে সূর্য খসে পড়লেই বাড়িখানা অন্ধকারে ডুবে যাবে। অনাথ তার খাতায় লিখলো—

আকাশ জিনিসটা তরল। ছোঁয়া যায় না। প্রতিক্ষণেই পাল্টায়। আগের মুহূর্তটি আর ফিরিয়া আসে না। ইহা শুধু নিরীক্ষণের বিষয়। মহম্মদ বাজিকর আসিয়াছিল। সে আমাকে প্রতিদিন দুই চামচ করিয়া আকাশ খাইতে পরামর্শ দিয়াছে। তাহার কথায়, ইহাতে মন ভাল থাকিবে। আকাশ তো আমরা সব সময় খাইতেছি। মুখ খুলিলেই ভিতরে চলিয়া যায়। শূন্য হইতে মাটি পর্যন্ত এই আকাশ নামিয়া আসিয়াছে।

শান্তা এক নতুন অনুভূতিতে ভাসতে ভাসতে পঞ্চাননতলায় চলে এল। বাবা পঞ্চানন্দ ফুল বেলপাতার ভেতরে প্রায় চাপা পড়ে আছেন। এইমাত্র আলো দিল ভেতরে। পাথরের অন্য দেবদেবীরা আলো পেয়ে ঝকমক করে উঠলো।

বাবা পঞ্চানন্দের দিকে চোথ বড় করে তাকালো শান্তা। বলাই এগিয়ে গিয়ে বালতি ভরতি দুধ সে-পাথরে ঢেলে দিল। শান্তা মনে মনে বলল, বাবা, আমাদের উমা যেন চিরকাল এই রকম দুধ দেয়। তোমার মাথায় বৈশাখ মাস ভোর শীতল দেব। ঝারি বসিয়ে দিয়ে যাবে বলাই।

পঞ্চানন্দের পাশেই নারায়ণ মূর্তি। শান্তা গলায় আঁচল দিয়ে গড় করলো। মাথা তোলার আগে মনে মনে বলল, আপনারা ঠাকুরদেবতারা সবাই এথানে আছেন। আপনারা সবাই একটু টুকুকে দেখবেন। ওকে নিয়ে আমার বড় ভয়। টুকুকে সুমতি দিন। চলে আসার সময় একটা কাঁচা টাকা ছুঁড়ে দিল শান্তা। পাথরে লেগে ঠং করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দুটো ন্যাংটা ছেলে ছুটতে ছুটতে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে গেল। বাবার ঘরে কোন পাহারা নেই। থাকেও না। এই হল গিয়ে ঈশ্বরীতলার নিয়ম।

তথন অনাথ তার থাতায় লিথছিল—

বিরজা ডাক্তারের সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। সেই সার্কাস পার্টি নিশ্চয় এথন অন্যত্র কোথাও তাঁবু ফেলিয়াছে। সেদিন সন্ধ্যার মুখে সার্কাসের বাঘটির চোথের জায়গায় দুটি মার্বেল জ্বলিতেছিল। গামাদা না সরাইয়া লইলে নির্ঘাত আমাকে কামড়াইতো। বিরজা ডাক্তারের ছেলের জন্য বাড়ির সামনের দেবদারু গাছটিকে ন্যাড়া হইতে হইয়াছিল। এতদিনে নিশ্চয় নতুন ডাল গজাইতে শুরু করিয়াছে। বিরজাবাবু না হইলে উমা গাভিন হইতো না। আমি দীঘির জলে পড়িয়া যাইতেছি—তথনো সার্কাসের মেয়েটি হাসিয়া চলিয়াছে। হাসির দমকে তাহার কোমরের জাঙ্গিয়াটি কাঁপিতেছিল। বড় তাঁবুতে তথন বাজনা বাজিতে-ছিল। এই সব ঘটনা আকাশের নীচেই ঘটে।

অনাথ দেথলো, নতুন বাছুরটা টলতে টলতে তার মায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। উমা তার গা চেটে দিতে লাগলো।

অরুণ বরুণ তাদের ঘরে ঢুকছিল। তারা দু'জন এই দৃশ্য দেথতে পেয়ে একসঙ্গে কোয়াং কোয়াং ডেকে উঠলো। বাছুরটা সেই ঝিঁঝিউগিলের আওয়াজে ভড়কে গেল। সে-আওয়াজে এগারোটা তাজা লেগহর্ন প্যারেডের কনেস্টবলদের কায়দায় একসঙ্গে রাইট অ্যাবাউট টার্ন করলো।

কোম্পানি বাঁধের গায়ে বিশেষ বাড়ি নেই। তিন-চার ঘরের বসতি। ঈশ্বরীতলার এদিকটা এখনো ফাঁকা। খালের ওপারের বাঁশবন, ইটখোলার গর্ত, রেলের ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের আলো—সবই এখান থেকে এখন জ্যান্ত লাগছিল। তার ভেতর দিয়ে সন্ধ্যার বাতাস উঠে অনাথের গা ঠাণ্ডা করে দিল। রাতের এখন দিনকে গ্রাস করার সময়।

জগেন পাগলাকে গা ঘেঁষে এগিয়ে আসতে দেখে লিলি 'মাগো।' বলে শান্তার গায়ে লেগে গেল। বলাই ধমকে উঠলো। এই জগেনদা। কি হচ্ছে? সেয়ানার পাগলামি।

শান্তা সরে গিয়ে হাঁটতে লাগলো। সে পরিষ্কার জানে—জগেন যাত্রার এ পাগলামি কোন সেয়ানার কাণ্ড নয়। সে-রাতে বাঘার জন্যেই যাত্রা ভণ্ডুল হতে বসেছিল। সব শুনেছে শান্তা। সে রাতেই জগেনের জুতোর দোকানের দরজা ভেঙে চুরি। ঈশ্বরীতলাসুদ্ধ সবাই জানে। ব্যাঙ্কের লোক এসেছিল—টুকুর বাবার কাছে—সাক্ষী নিতে। একসঙ্গে দু'দুটো শোক। গোড়ার দিকে জগেনের এলোমেলো কথায় কেউ কান দেয়নি। তারপর দেখা গেল—জগেন স্টেশনের উঁচু জলের ট্যাঙ্কে উঠে বালিশের ওয়াড় নেড়ে সিগন্যাল দিচ্ছে। তখনই ব্যাপারটা ধরা পড়ে। ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বাঘা বলাইয়ের পাশাপাশি আগে আগে যাচ্ছিল। জগেনের কি মনে হতে আবার ফিরে এল। মুখে একটাই গৎ। চিঠি। চিঠি।। চিঠি।।।

গমকল থেকে জগেনের গায়ে এসে আলো পড়েছে। মাথায় জটা। খালি গায়ে বুক খোলা কোট। পাৎলুনের বাঁ পায়ের অনেকটা নেই। বাঁ হাতে গালের চাপদাড়ি চুলকোচ্ছিল। ডান হাতে সত্যিই একখানা কাগজ। দলা পাকানো।

আবার জগেন ক্ষেপে উঠলো। চিঠি! চিঠি!! চিঠি!!!

এসব আওয়াজ বাঘার একদম সহ্য হয় না। সে সবার আগে খালপোলের ওপারে চলে গেল। শান্তা বড় বড় পায়ে এগিয়ে গেল। লিলিও তাই। পুজো দেওয়ার পর টুকুর হাতে একখানা মঠ পড়েছিল। তাই কামড়াতে কামড়াতে এগোচ্ছিল। এবার আচমকা সে জগেনের সামনাসামনি পড়ে গেল।

বাজার অব্দি যাবে বলে টুকুকে শান্তা নিজের একখানা শাড়ি পরিয়ে এনেছে। রাস্তার আলোয় জগেনের মুখখানা টুকুর চোখের সামনে কাটামুণ্ডু হয়ে ঝুলে পড়ল। কারণ জগেনের শরীরের বাকীটা অন্ধকারে। টুকু হকচকিয়ে গিয়ে বলল, কার চিঠি?

তোমার। এই তো। জগেন একরকম টুকুর হাতখানা খুলে ফেলে তাতে গুঁজে দিল। দিয়ে যেমন এসেছিল তেমন চলে গেল। টুকুর হাত থেকে কাগজখানা পড়ে গেল। মা এগিয়ে গিয়েছে। বাবা খালপোলের ওপার থেকে খেজুরতলায় দাঁড়িয়ে ডাকছে। কী মনে হতে টুকু কুড়িয়ে নিল। সাদা এক্সারসাইজ বুকের পাতা। খুলে দেখলো একবার। গোটা গোটা অক্ষরে কি সব লেখা। হাত মুঠো করে খালপোলের ওপর দিয়ে ছুটে গেল টুকু। মাকে ধরতেই হবে। একা সে যেতে পারবে না। খেজুরতলাটা অন্ধকার।

মা, জগেন যাত্রা এইমাত্তর একখানা কাগজ দিল—

ফেলে দাও। ওদের হাতে নোংরা থাকে।

লিলি বলল, নারে দিদি ফেলিস না। অনেক সময় পাগলদের হাতে মন্ত্র-পড়া কাগজ থাকে শুনেছি। তাতে তোর উপকার হতে পারে।

দিদি হিসেবে টুকু বলল, খুব পেকেছিস। বলেও কাগজখানা ফেলতে পারলো না।

বারান্দায় উঠে শান্তা অনাথকে পেল। অনাথ টেবিল থেকে উঠে এসে নতুন বাছুরটাকে এইমাত্র কোলে করে বিচুলির গদিতে বসিয়ে দিয়ে এসেছে। আজ রাতটা বলাই গোয়ালের কাছাকাছি শোবে। কানাই মাড়িয়ে দিতে পারে। সাদা রঙের বাছুর। টলটল করছিল কালো চোখ। নাকের ডগা একদম কাচের পেপারওয়েট। বলাই ওকে দুধ খাওয়াতে শেখাবে।

বুঝলে, দক্ষিণাবাবু ননীবাবু শশীবাবুদের বাড়ি কাল আমি দুধ পাঠাবো। সবাই খুশী হবে।

পাঠিও।

উমাকে কাল সকালেই লাউয়ের পায়েস রেঁধে দেব।

মা ত্যাখো। জগেন যাত্রার কাগজে কে আমায় চিঠি লিখেছে—

শান্তা কোনরকম মন দিল না। লিলি আর টুকু এতক্ষণ আলোয় মেলে ধরে পড়বার চেষ্টা করছিল। কাগজখানা দলাপাকানো।

হ্যাঁ মা। সত্যি। পড়ে দেখ।

অনাথ কাগজখানা হাতে নিল। তোমরা এবার হাত-পা ধুয়ে পড়তে বোসো গে। আমি দেখছি। বলাই, একটু চা করবি?

ঘরের কাজ করতে শান্তা এক-একবার বেরিয়ে আসছিল। টুকু নন্দবাবুর হোমটাস্ক নিয়ে কোন কূল পাচ্ছে না। এইসব বুদ্ধির অঙ্ক তার একদম মাথায়

ঢোকে না। এখন সারা ঈশ্বরীতলার মাঠে মাঠে ধানচারা বড় হয়ে কালো রঙ ধরেছে। দিনে দিনে বড় সুন্দর দেখায়। অঙ্ক ছেড়ে দিয়ে টুকু রঙ পেনসিলে সে ছবি আঁকতে শুরু করে দিল। লিলি একমনে পেনসিল কাটছিল। শিস সরু হয়ে মুট করে ভেঙে যাচ্ছিল।

লিলি উঠে বাবার ঘরে গেল। তার বাবা এক এক সময় খাতা খুলে কি সব লেখে। আবার রেকর্ড বাজিয়ে গান শোনে। এখন জানলা দিয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে আছে। টেবিলের নীচে বাঘা গম্ভীর হয়ে বসে। অন্যদিন এ-সময় বজ্জাত বেঁচে থাকলে তার সঙ্গে অন্ধকার উঠোনে খেলতো বাঘা। ছুটোছুটি।

বাবু, আমাদের বাড়িতে কেউ আসে না কেন? মানে বেড়াতে আসে না কেন?

আমরা যে কলকাতা থেকে দূরে থাকি।

তা বলে কাকা, জেঠু আসবে না?

সময় কোথায়। সবাই তো কাজে ব্যস্ত থাকে।

কেন? শশীবাবুর দাদা তো চন্দননগর থেকে আসে।

তিনি রিটায়ার করেছেন।

আমাদের কোথাও বেড়াতে নিয়ে চল বাবু।

বেশ তো। অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে যাক।

লিলি জানলার বাইরে অন্ধকারে তাকিয়ে দেখলো আলো বোঝাই ইলেকট্রিক ট্রেন লোকজন নিয়ে ঈশ্বরীতলা ছেড়ে যাচ্ছে। এখানে বসে অন্ধকারের ভেতর ওই ছবি একদম একটা সিনেমা। অনেক দূর দিয়ে যাচ্ছে বলে কোন শব্দ নেই।

অনাথ জানে, এ-বাড়িতে সে শান্তা, টুকু, লিলিকে সব দিতে পারে। কলকাতায় যা যা পাওয়া যায়। সব। দিতে পারে না কলকাতার ভিড়। আওয়াজ। গল্প। কাছাকাছি থেকে সবাই যে পাড়ার মত একটা বোধ পায় —ঈশ্বরীতলায় কোম্পানি বাঁধের গায়ে নতুন বাড়িতে মাঠের ভেতর ফাঁকা ফাঁকা বসতিতে সে-জিনিসটা একদম পাওয়া যায় না। বৃষ্টির রাতে ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে জলের ছিটে খুবই ভালো লাগে—কিন্তু পাশে কোন বাড়ি নেই। লোক নেই। জানলা খুললে শুধু অন্ধকার। এ জিনিস পালটানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর রেকর্ড বাজলো খানিক। শান্তাও ঘুমিয়ে পড়ছিল। অনাথ ডেকে বলল, ওদের গায়ে চাদর দিয়ে এ-ঘরে একটু এসো।

সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। শান্তা পান সেজে একটা মুখে দিল। আরেকটা অনাথকে

দিয়ে বলল, কি বলবে বল। আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। সারাদিন একটু শুইনি।

তোমার মেয়েকে লেখা চিঠি দেখেছো? অনাথ কাগজখানা তুলে দিল শান্তার হাতে।

শান্তা খাটে বসে পড়তে লাগলো।

প্রিয় টুকু,

আমি তোমায় ভালবাসি। সেদিন কোম্পানি বাঁধে তুমি যখন বাঘাকে নিয়ে খেলছিলে—আমি সবে কলেজ থেকে ফিরছি। গাছপালার ভেতর দিয়ে বাঘাকে নিয়ে তোমার ছোটাছুটি আমি না দেখে থাকতে পারলাম না।

একেই বোধ হয় ভালবাস বলে।

আজকাল সব সময় তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। তোমরা যাত্রা দেখতে গেলে আমায় জানাবে। আমিও প্যাণ্ডেলে গিয়ে বসে থাকবো।

তোমরা এখানকার লোক নও। তোমার বাবা যখন প্রথম এখানে আসেন—আমি তখন ক্লাস ফোরে পড়তাম। তুমি একদম এলেবেলে ছিলে। লিলিকে আমরা হামাগুড়ি দিতে দেখেছি।

তুমি আমাদের চেয়ে অনেক ছোট। আমরা এখন কলেজে পড়ি। পড়াশুনোর চাপ অনেক। একটা লেকচার মিস করলে অনেক কিছু হারাতে হয়। সে তুমি বুঝবে না। তুমিও একদিন বড় হবে। তখন বুঝবে—কলেজের পড়াশুনো কি জিনিস। ভালবাসা কাকে বলে। জানি এ চিঠির মর্ম তুমি বুঝবে না। তবু লিখছি। তোমায় না দেখে থাকতে পারি না। জবাব দিও। ইতি

তোমারই—

বিকাশ

পুঃ। বাবা এখন ভোট নিয়ে ব্যস্ত। দুপুরে একতলার বসার ঘর ফাঁকাই থাকে। এলেই পারো তখন।

চিঠি থেকে মুখ তুলে শান্তা অনাথের দিকে তাকালো। খুব পাকা ছেলে। তোমার মেয়ে কিছু করেনি তো?

মা হয়ে তুমি জানো না। তারপর হেসে বলল, ছেলেটি পাকা নয়। সরল। এ বয়সে এরকমই হয়।

কি করে হয় বলতে পারো? টুকুর বয়সটা কি? গ্রোথ বেশী বলে সবাই ভুল করে। মেয়েটাও গেছো। সর্বত্র লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। কাল সকালেই বলব, স্কুল আর বাড়ি করবি। কোথাও বেরুবি না।

তা কেন? ওর দোষ কি! যেমন চলছে তেমন চলতে দাও।

এখানে থাকলে তোমার মেয়ে মানুষ হবে না। বয়ে যাবে। ছেলেগুলো ভালো না।

একটি ছেলেও খারাপ নয় শান্তা। একদম মেশামিশি নেই বলে এ অবস্থা। তোমার টুকুর মনে কি এসব কিছুর ছাপ আছে?

ওর কথা বোলো না। ও কি কিছু জানে! সময় হলে মানুষ শেখে।

জানি শান্তা। এখন ওর বাড়তির সময়। কোথাও কোন বাধা দিতে গেলেই উথলে উঠে পেরিয়ে যাবে। তখন আটকাতে পারবে না শান্তা।

আজকাল তো শোবার আগে রোজ রাতে তিন-চারখানা গুঁজিয়া থালায় দিয়ে ক্যালেণ্ডারের শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে। তারপর শোয়।

কি ব্যাপার শান্তা?

কিচ্ছু না। ভোরে উঠে সে গুঁজিয়া নিজেই খায়। লিলি বলছিল—প্রণাম করে নাক বলে, ঠাকুর! আমি যেন অঙ্কে ভালো হই। ইংরেজিতে পাস করি। বোঝো তোমার মেয়ের কাণ্ড!

ওকে সীতাকুণ্ডুর স্কুলে ভরতি করে দেব শান্তা। ট্রেনে যাবে আসবে। দুটো স্টেশন তো মোটে। তাহলে কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে না। সময়ই পাবে না। স্কুলটাও ভাল।

দু'জনই চুপ করে বসে থাকলো খানিক। ঈশ্বরীতলার মাঠে মাঠে এখন কোথাও পা পাতার জায়গা নেই। সর্বত্র ধান। চারাগুলো সারা দিনরাত ঝিনঝিন করে বেড়ে চলেছে। একদম টুকুর মত। বলাইয়ের বাবা ভগীরথ বলে—ধানচারা না অমরলতা বাবু! মৃত্যু নাই। বছর বছর ফিরে আসে। অমর খন্দ।

অনাথের মনটা টুকুর জন্যে কিসে ভরে গেল। বর্ষার ছাপানো জলের মত। বর্ষাকালে বাঁধ কেটে দিলে ঈশ্বরীতলার মাঠে মাঠে এভাবেই জল চলে আসে। সন্ধ্যেরাতে সে জলের ভেতরকার উঁচু ঘাসের ডগায় জোনাকিরা এসে বসলে আলোর প্রতিবিম্ব মাঠ থেকে ঠিকরে উঠে আসে। টুকুর জন্যে অনাথের বুকের একতলা থেকে দোতলায় আলো উঠে আসছিল।

শান্তা তখনো জানলা দিয়ে অন্ধকারে তাকিয়েছিল। আচমকা অনাথের দিকে ফিরে বলল, ভেবেছিলাম দক্ষিণাবাবুর বাড়ি নতুন দুধ পাঠাবো। আর পাঠাবো না।

তা কেন? দক্ষিণা চক্রোত্তীর তো কোন দোষ নেই।

বলছো! জনতার প্রার্থী! তাই না? কিন্তু টুকু তো আমাদের ভাবনায় ফেললো।

অনাথ বলল, দক্ষিণাবাবু তো খারাপ লোক নন। অবস্থা ভালো বলে মানুষের যেটুকু মেজাজ হয় তাই আছে তাঁর। তার চেয়ে বেশী তো কিছু নয়।

ওর কি এখন ভোটে দাঁড়ানোর সময়? তার আগে মেয়ে তিনটের বিয়ে দেওয়া দরকার নয়? আমার সঙ্গে দেখা হলেই এগিয়ে এসে কথা বলে হেসে। ভারী ভালো তিন বোন। তোমার কথা তুলে ওদের বড় বোন বলেছিল, আপনি একটু দাদাকে দিয়ে বাবাকে আমাদের বিয়ের কথাটা মনে করিয়ে দিন!

॥ নয় ॥

সীতাকুণ্ড ছাড়িয়ে আরো এক স্টেশন। তারপর বড় পীরের জংশন। স্টেশনেই আগরবাতি বিক্রি হচ্ছে। দুপুরের ফাঁকা ট্রেন থেকে অনাথবন্ধু বসু হোল ফ্যামিলি নিয়ে নামলো। গেট থেকে বেরিয়ে খটখটে ইঁটের রাস্তা। তার দু'ধারে বড় পীর সাহেবের দরগার ছবি ছাপানো ক্যালেণ্ডার বিক্রি হচ্ছে। দোকানে দোকানে সিন্নী চড়ানোর নানা জিনিস সাজানো। পয়সা ফেললেই পাওয়া যাবে।

দুপুরে এই বেরিয়ে পড়ার আইডিয়াটা অনাথের। কাছের মধ্যে কাছে। তবু ট্রেনে যেতে হয়। যেন অনেক দূর যাচ্ছে—এভাবেই সে আজ ট্রেনে উঠেছে।

অনাথের সমস্যা অনেক। কলকাতায় ভাই বোন, জানাশুনোদের ছেড়ে সাত আট বছর আগে এখানে চলে এসেছিল। এখন গড়িয়াহাটার মোড়, রজনী সেন রোড—এসব তার ফরেন লাগে। বরং শেয়ালদা দিয়ে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে যেতে তার এখন অনেক কাছের মনে হয়।

বাজার করতে আজকাল তার বিশেষ ভালো লাগে না। বলাইকে নিয়ে পাঁচজন। কিন্তু এমন এত লোক নেই বাড়িতে যে, রিকশা বোঝাই দিয়ে এক-জন পুরনো গৃহস্থ হিসেবে অনাথ বাজার করে ফিরবে আর সবাই খুশী হবে। বরং সেরকম বাজার আনলে জিনিসপত্র নষ্ট হয়। সন্ধ্যেরাতে ঘরে বসে কথা বললে তা রিবাউণ্ড করে। বাড়িটা গমগম করার মত লোকজন নেই।

শান্তা এক-একদিন সন্ধ্যেবেলা বলে, এখানে যদি বাড়িঘর করতো সবাই

তাহলে বেশ হতো। অনাথেরও তাই মনে হয় এক এক সময়। অথচ অনাথ এখানে এসেছিল—ফাঁকায় থাকার জন্যে। এখন সে বোঝে, ভিড়ের মতই ফাঁকা সব সময় ভালো লাগে না। তবে ফাঁকায় থাকতে থাকতে সে এখন নিজেকে অনেক বেশী দেখতে পায়। এই দেখায় অনাথের অনেক সাহায্যকারী আছে। যেমন, মেঘ। বিশ্বেশ্বরীর বাওড়। বর্ষায় ঘন কালো হয়ে ওঠা বাঁশবন। এরা তার চোখের সামনে বাতাসের গা থেকে বাতাসের খোসা তুলে ফেলে আসল জিনিস দেখিয়ে দেয়। কলকাতায় এ সুযোগ কোনদিন হয়নি অনাথের।

শাস্তা ঝুঁকে বসে দুখানা ক্যালেণ্ডার কিনলো। বড় পীর সাহেবের দরগার ছবি। উঁচু বেদীর মত মাজার। দু'ধারে ফুলের তোড়া। কবে কত আগে তোলা ছবি থেকে ব্লক করে ক্যালেণ্ডার ছাপানো। দুখানা কিনেছে শাস্তা। একখানা বড় শোবার ঘরে থাকবে। আরেকখানা বসার ঘরে। বড় জাগ্রত পীর। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—সবাই আসে দরগায়। নানা প্রার্থনা নিয়ে।

জায়গাটা খুব সুন্দর। দুপুর বলে ভিড় ছিল না একদম। কাছেই মক্কা পুকুর। নিজের ইচ্ছে জানিয়ে শাস্তা কাগজের নৌকো ভাসিয়ে দিল। তারপর ঢেউ দিতে লাগলো। সেই ঢেউয়ে কাগজের নৌকো যদি ওপারের তীরে গিয়ে ঠেকে—তাহলেই মনস্কামনা পূর্ণ হবে। শাস্তা ঢেউ দিচ্ছিল। পাশে টুকু আর লিলি দাঁড়িয়ে। শাস্তা মনে মনে বলছিল, পীর সাহেব, আপনি টুকুর বাবার তাড়ি খাওয়া ছাড়িয়ে দিন। তাহলে আমি আপনার দরগায় তিন সন্ধ্যে সিন্নী চড়াবো। লিলিকে একটু মোটা করে দিন। টুকুর সুমতি আসুক। বড় গেছো মেয়ে হয়েছে। বিকেলবেলা কোম্পানি বাঁধে ও বেড়াতে বেরোলে স্টেশন বাজার থেকে উঠতি বয়সের ছেলেরা এসে গান গায়, হাসে, তাকায়। টুকুটা এতই বোকা কিছুই বোঝে না। আমি আর কত দিক সামলাবো পীর সাহেব!

দরগার বাড়িখানা আগেকার চুনসুরকির গাঁথুনি। ভেতরে সাদা কাপড়ে ঢাকা মাজার। এরই ছবি ক্যালেণ্ডারে ছাপানো। পাশের বারান্দায় বড় কালো পাথরের শিলনোড়া। বার্ষিক উৎসবের দিন মাংস রান্না হয়। তখন এই শিলে মসলা পেষাই হয়। দরগার ভেতরে শুধু পুরুষরা ঢুকতে পারে। অনাথ নমস্কার করে ভেতরে গেল। নিয়মমত ধুতির কাছা খুলে লুঙি করতে হল। তারপর দেওয়ালে ঝোলানো অনেকগুলো ফেজ থেকে একটা তুলে নিয়ে মাথায় বসাতে হল। বড় মোল্লা সাহেব যেমনি ফরসা তেমনি মোটা। তাঁর নির্দেশে মাজার

ঘুরে মাথা নীচু করে প্রার্থনা করলো অনাথ। খুব সরল প্রার্থনা। বড় পীর-সাহেব, আপনাকে প্রণাম জানাই। কাল ভোরেও যেন মৌজা চন্দনেশ্বরের ওপার থেকে সূর্য ওঠে। আমাদের বাড়ির জানলা থেকে রোজ রোজ যা দেখতে পাই—কালও যেন তা দেখি। এই ঈশ্বরীতলায় যেন বার বার ফিরে আসতে পারি। জ্যোৎস্না রাতে ফুটফুটে আলোয় বাঁশবনের মাথায় বসে তেড়ো পাখি ডাকুক। তখন বাঁশতলায় সাদা জ্যোৎস্না পড়ে থাকবে।

ফিরতি ট্রেনের জানলায় বসে শাস্তা দেখলো, বড় পীর সাহেবের দরগার পেছনের মাঠে বেঁটে বেঁটে নারকোল গাছে গোল, সবুজ পূর্ণ ডাব ফলে আছে। মুখে বলল, আমরা এরকম মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়লে পারি!

অনাথের বুকের ভেতরে খচ করে একটা আলপিন ফুটে গেল। আমরা মানে কি? এই তো সেদিন বিয়ে হল। এখন টুকু, লিলি সমেত তারা একটি প্রতিষ্ঠান। পুরনো হয়ে যাওয়ার ছাপ পড়েছে কথাবার্তায়। এসব ভালো লাগে না অনাথের। তাহলে কি চলে যাবার সময় এসে গেল? আমরা কি এত তাড়াতাড়ি এত পুরনো হয়ে যাচ্ছি!

দক্ষিণা চক্কোত্তী এ অঞ্চলের প্রথম এম.এ, বি-এল। কাদা ভেঙে সাত মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে স্কুলে পড়েছে। কয়লার ইঞ্জিনে টানা দুখানা গাড়ি সে-আমলে কলকাতা যেতো আসতো। তাতে চড়ে গিয়ে কলকাতায় কলেজে পড়েছে। আইন পড়েছে। স্বাধীনতার আগে অল্পদিন জেল খাটে। তারপর কী লিখে দিয়ে বেরিয়ে এসে সরকারী কাজে ঢোকে। সে অনেক দিনের কথা।

এখন ঈশ্বরীতলায় বেলা তিনটে। কার্তিক মাসের বিকেল। আগে আগে উঠে যাবার ধান তাড়াতাড়ি কাটা শুরু হয়েছে। দক্ষিণার মাহিন্দররা গো-গাড়ি থেকে সে ধান বিচুলিসুদ্ধ তুলে এনে উঠোনে গাদা দিচ্ছিল।

দক্ষিণার বাবা একতলা বাড়ি করে যান। দক্ষিণা সে-বাড়ি দোতলা করেছে। বিরাট বিরাট ঢাকা বারান্দা। তেতলার ছাদের সঙ্গে একখানা বড় ঘর। সে ঘরে বেতের ইজিচেয়ারে দক্ষিণা শুয়ে। পায়ের কাছে সন্তোষ টাকি বসে। দক্ষিণার বড় মেয়ে রেখার এখন বত্রিশ। মেজো রিনির বয়স আঠাশ। ছোট শুভার বয়স ছাব্বিশ। তারপর দুটি ছেলে আছে দক্ষিণার। প্রকাশ আর বিকাশ। ছেলেরা বাড়ি নেই। দু' বাটি মুড়ি আর চা নিয়ে রেখা তেতলার ঘরে দিয়ে এল।

দক্ষিণার স্ত্রী রোহিণী দক্ষিণাদের চেয়ে অনেক বড়ঘরের মেয়ে। সে ভোট,

জমিজমা বোঝে না। ছোটবেলায় হাওড়ার ওদিককার এক মাঝারি কারখানার মেয়ে হিসেবে এ-বাড়ি বউ হয়ে এসেছিল। সেই থেকে ঈশ্বরীতলায়। তার ভাষায় জায়গাটা বড গরিব। সবাই সবাইকে ঠকানোর চেষ্টায় আছে। এক পলা তেল ধার দিয়ে সাতদিন তাগাদা দেয়। তবে এখানে কেউ কাউকে ঠকাতে পারে না বিশেষ। কারণ সবাই হুঁশিয়ার। অনেকেই এক বেলার বেশী ভাত খেতে পায় না। চেহারাগুলো পাকাটে। খারাপ। নিতান্ত কিশোরীও এঁচোড়ে পেকে ঠনঠন করছে।

সিঁড়ি দিয়ে বড মেয়েকে নামতে দেখে জানতে চাইলে', কোথায় গিয়েছিলি রাখু?

বাবার ঘরে মুড়ি দিয়ে এলাম। চা খাবে না?

দে। সেই ডাকাতটার সঙ্গে বসে পরামর্শ করছে তোর বাবা?

হ্যাঁ। সন্তোষদা এসেছে।

আবার দাদা কি রে! ডাকাতকে দাদা বলতে হবে শেষে এদেশে?

বাবা দাদা বলে ডাকতে বলেছেন।

ওসব বন্ধ রেখে একটু ছেলে দেখতে বেরোতে বল তো বুড়োকে। নোনা-বিষ্টুপুর থেকে একটা সম্বন্ধের খবর এসে পড়ে আছে।

সবার কি বিয়ে হয় মা? কোথায় ছিল ছোট মেয়ে শুভা। সে এসে বলল। এই মেয়েকে রোহিণী ভয় খায়। পায়ের গডন মুখের। তবে শুকনো। সব সময় একটা অজানা দুঃখ থানা দিয়ে থাকে সেখানে।

মায়ের কোন জবাব পেল না শুভা। তখন সে নিজেই বলল, আমাদের কলেজে পড়ালে পারতে মা। আমরা বাইরের জগৎ দেখতে শিখতাম। কাঁহাতক ঘরে বসে থাকি।

কেন? রিনির মত ঘুরে বেড়ালে পারিস! কে আটকাচ্ছে?

তোমার রিনি এখন পুকুরপাড়ে ছিপ হাতে বসে আছে। মাছ না হলে ভাত ওঠে না মুখে।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ঘেন্না ঘেন্না। এই মাছরাঙা মেয়েকে কার ঘরে দেব আমি? প্রায় কাঁদতে বসলো রোহিণী।

লিকার ছিল। তাই গরম করে দুধ চিনি মিশিয়ে এনে সময়মত বড় মেয়ে রাখু কাপটা মায়ের সামনে ধরলো। রিনিকে বকছো কেন মা? ওর কি দোষ! সময়মত বিয়ে দাওনি। তেমন করে পড়াওনি। আমরা যাবো কোথায়?

কোন কথা বলতে পারলো না রোহিণী। চায়ের কাপটা রেখে দিয়ে বলল, তোদের বাবা যে মন্ত্রী হবার জন্যে ক্ষেপেছে। সামনে ভোট।

তেতলার ঘরে সন্তোষ টাকি তখন দক্ষিণাকে ভালো ভালো খবর দিচ্ছিল। তার মতে এখনই রাতারাতি চরের পয়োস্তি জমি থেকে ভাগচাষীদের তুলে দেওয়া দরকার। ভোটের এখনো কিছু দেরি আছে। এই ফাঁকে তুলে দিতে পারলে নয়া পত্তন দিয়ে টাকাও এসে যাবে হাতে।

এই ঘরখানা এখন দক্ষিণা চক্কোত্তীর শলাপরামর্শের ঘর। দশখানা অঞ্চল নিয়ে বিধানসভা কেন্দ্র। কত জায়গার লোক আসে তার কাছে। পেনসনের টাকা কমিউট করিয়ে দোতলা গাঁথতে হয়েছে। তাই মাস গেলে এখন যা পেনসন হয়—তাতে সংসার চলার কথা নয়। বাপকেলে জমিই ভরসা। বাড়িভাড়া লাগে না। গাই আছে। দুধ কিনতে হয় না বিশেষ। কয়লার ঝামেলা কম। কাঠকুটোতেই অনেক কাজ চলে। জমি থেকে বিচুলি, ধান, গুড়, ডাল ছাড়াও ঢেঁকিছাটা চাল আসে। আসে ডিম। নগদ পয়সা শুধু সাবান-সোডা, ইলেকট্রিক বিল, মসলাপাতির জন্যে লাগে। আর লাগে কাঁচা বাজারে মাঝে মাঝে। বড় ছেলে প্রকাশ ল ফাইন্যাল দেবে। ভোটের সব খরচ সামলাতে কিছু জমিও বেচতে হবে। পার্টি-ফাণ্ড থেকে তো আর সব খরচ কুলোবার নয়। অবিশ্যি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেণ্টকে বলে রেখেছে দক্ষিণা।

বাইরের আকাশে সুন্দর মেঘ ভেসে যাচ্ছিল। ঘরের সামনের ছাদে দক্ষিণা দেখলো, ডাবের ফুল পড়ে ঘিয়ে-রঙ হয়ে আছে। ছোটবেলায় এ ফুল কুড়িয়ে খেত দক্ষিণা। এখনকার ছেলেমেয়েরা জিনিসটা জানেই না।

তার পায়ের কাছে সন্তোষ বসে। গায়ে হাতকাটা ফতুয়া। নীল রঙের। পরনে ধুতি। মালকোছা মেরে পরেছে। জুতোজোড়া দক্ষিণার দেওয়া। এখন তা দরজার মুখে। সন্তোষ যে কথাই শুরু করে তার গোড়ায় বলে—'আমাদের'।

যেমন—

'আমাদের ভোট।'

'আমাদের ভাগ্য।'

'আমাদের খরচখরচা।'

দক্ষিণা জানে, এই 'আমাদের' কথাটাই সন্তোষের সব চেয়ে বড় অস্ত্র। একবার 'আমাদের' বলে সন্তোষ যে কত নিকটের হয়ে যায় তা সন্তোষ নিজেও জানে।

এসব কথার শেষে সন্তোষ টাকার কথাই পাড়ে।

যেমন—

উত্তর রামনগর অঞ্চলে তাঁতীদের এক সন্ধ্যে খাইয়ে দেওয়া দরকার। তা গোটা আশি টাকা তো আমাদের লাগবেই। কম করেও ন'ঘর মানুষ।

সাতঘেরে ইস্কুলের ক্লাস টেনের চালে এক নম্বর সরেশ টালি চাই আটশো। সত্তর টাকার নীচে তো আর আমরা শ পাবো না।

এরকম নানা কাজ থাকে সন্তোষের। সবই ফুরোনের কাজ। মাসমাইনে আছে। তারপর সন্তোষের জন্যে থানা-পুলিস সামলাতে হয় দক্ষিণাকে। এক-একটা কাজ সমাধা করে এসে দস্তুরি জোটে সন্তোষের। দক্ষিণা বলেছে, মন্ত্রী হলে সন্তোষকে কলকাতায় নিয়ে দপ্তরের একটা কাজ দেবে। পাকা চাকরি।

ধর যদি ওরাও লাঠিসোটা নিয়ে তৈরি থাকে?

থাকবেই তো। আমরাও তৈরি হয়ে যাবো। বলেই সন্তোষের খেয়াল হল, তার সঙ্গে লাঠিবাজি করতে অত রাতে কে যাবে—কে যেতে পারে—তা এখনো সে জানে না। চক্কোত্তীমশাই কড়া ধাতের লোক। ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আইন জানেন। জমিজায়গাও আছে। এ বাড়িতে ঢুকে সন্তোষের গায়ে আলাদা জোর এসে যায়। সাহস হয়। সে এতকাল স্টেশনে শুয়ে থাকতো। সেখানকার কলের জল খেত। এখন এখানেই একতলার বারান্দায় শোয়। দু'বেলা এখানেই পাত পাড়ে। সবাই তাকে বলে দক্ষিণার লোক।

ওদের লোকবল বেশী।

বেশির ভাগই তো লিকলিক করছে বাবু। এক ঘা কষালেই মুখথুবড়ে পড়বে।

দক্ষিণার কপালে ভাঁজ পড়লো। সামনে ভোট। হাতে টাকা দরকার। ধানের দর নেই, নয়া পত্তন দিয়ে প্রজা বসালে এখুনি নগদ টাকা হাতে আসে। পুরনো ভাগীদের তুলে দিতে পারলেই সব পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু হইচই ক'রে তুললে কথা উঠবে। অন্য সব অঞ্চলের চাষী ভোটাররা জিনিসটা ভালো চোখে দেখবে না। মিষ্টি কথায় প্রজারা উঠবার নয়। কী করা যায়!

প্রথমে মারা গেল তিনটি। তিনটিই ডিম দিচ্ছিল। অফিস যাবার পথে শান্তাকে অনাথ ইঞ্জেকশনের বরাত দিয়ে গেল। বলল, সকাল সকাল ফিরে আসব। তুমি মুরগির ডাক্তারের বাড়ি বলাইকে দিয়ে রিকশা পাঠাবে।

বিকেলে একটা গাড়ি আগে এসে প্ল্যাটফর্মে নামলো অনাথ। নেমেই সব খবর পেল। অসুখ সামান্য। ককসিডাইসিস। চুনো রঙের পায়খানা। কাঁপুনি। এবং মৃত্যু। ঠেকাতে না পারলে মারাত্মক। ঘটেছে তাই।

আজ প্রায় দু'মাস রোজ ডালা ভরতি করে ডিম উঠছিল। বাজারেও বিক্রি হয়েছে কিছু। মুরগির খাবার ডিম বিক্রির টাকায় হচ্ছিল। হয়ে টাকা বেশীই দাঁড়াচ্ছে এ ক'মাস।

কোম্পানি বাঁধ দিয়ে হেঁটে গিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকলো অনাথ। গোটাচারেক মোরগ তখনো ওদের পায়চারির জায়গায় জবুথবু হয়ে বসে কাঁপছে। বাকী জায়গাটায় মরা মুরগিগুলো বড় সাদা ফুল হয়ে ছড়িয়ে আছে।

বলাইকে পাওয়া গেল লাল বারান্দায়। কাঁদছিল বসে বসে। শান্তা মন দিয়ে কাঁথা মেরামত করছিল ছুঁচে। অনাথকে দেখে চোখ তুললো। সেখানে জল। অনাথ হাসবার চেষ্টা করল। ঠিক হল না।

সন্ধ্যের মুখে মুখে মদন বদন এসে মাঠের ভেতর বড় করে গর্ত খুঁড়ে ফেলল। টুকুরা স্কুল থেকে ফিরে সব দেখেশুনে নির্বাক। মদন বদন দুটো মোরগ নিল। এখনো তারা মরেনি। বাকীগুলোকে বলাই তিন-চারবার যাতায়াত করে ঝোড়া বোঝাই দিয়ে গর্তে এনে ফেলল। তারপর মাটি চাপা। টুকু আর লিলি দেখতে পেল, অন্ধকারের ভেতর দুটো আধমরা সাদা মোরগ ঝুলিয়ে মদন বদন বাড়ি ফিরছে। যাবার সময় মদন তার মায়ের কাছ থেকে দুটো রসুন, দুটো পেঁয়াজ নিয়ে গেল।

সকাল সকাল খেতে বসে অনাথ বলল, আমরা কোনদিন আর কিছু পুষবো না।

বাবা তখন সিঁড়ির কোণে নিজের খাবার প্লেট উলটে নিয়ে খাচ্ছিল। ও এমনি সোজাসুজি খেতে পারে না।

শান্তা কোন জবাব দিল না। একসময় নিজে থেকেই বলল, এর চেয়ে হাঁস পোষা ঢের ভালো। দরকার মত তা বসিয়ে বাচ্চা তোলা যায়। খাবার বলতে ঝিনুক। কোন ঝামেলা নেই।

রাতে সিগারেট খেতে খেতে মুরগিদের পায়চারির জায়গাটা চোখে পড়ল অনাথের। সেখানে এখন এক চৌকো জ্যোৎস্না মাত্র।

শান্তা ডাকলো। এদিকে এসো।

অনাথ কাছাকাছি এলে শান্তা বলল, দুধ জ্বাল দিয়ে রাখছিলাম। জানলা

দিয়ে বিড়ির গন্ধ এলো। ছাখো তো কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না? চোর নয় তো?

কেন? বলাই কোথায়?

বাঘাকে নিয়ে কোম্পানি বাঁধে গেছে। মদনের ছিপ বসানো দেখতে।

রান্নাঘরের পেছনেই বড় বারান্দা। তারপর খোলা মাঠ। বর্ষায় জল আসে। শীতে শীত। বাইরে বেরিয়ে কিছুই দেখতে পেল না অনাথ। ঈশ্বরীতলার আকাশে তখন কিছু তারা ছড়ানো। আর কিছু মেটে আলো ছিল। চাঁদের চোখে চশমা থাকলে সে এখানকার কয়েকটি বাড়ির ছাদ, গাছের মাথা আবছা মত দেখতে পেতো এখন।

গন্ধ পেয়েছো ঠিক?

পরিষ্কার। আমার কোন ভুল হয়নি।

তাই তো! বলে অনাথ বাইরে বেরুলো। বারান্দার নীচেই পাতিলেবুর গাছ। তার মাঝে পেঁপে। বড় পেঁপেগুলোয় বলাই ন্যাকড়া জড়িয়ে রেখেছে। নীচের থেকে তাতে বাঁশের ঠেকা লাগানো। একটু দূরে অল্পবয়সী নারকেল গাছগুলোয় সবে ডাব ধরছে আজ বছরখানেক। সেখানটায় অন্ধকার। কেউ লুকিয়ে বসে নেই তো?

টর্চটা দাও তো!

আলো ফেলেও কিছু দেখতে পেল না অনাথ। আলোর ঝলকে অরুণ বরুণ একবার কোয়াং করে উঠলো। নতুন টিউবওয়েলে হ্যাণ্ডেল পাম্প করার সময় জলের সঙ্গে এই আওয়াজ উঠে আসে। বাড়ির বাইরে এসে বুঝলো, বাড়িটা একা একা রাতে কেমন মাঠের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকে।

অনাথ ঘরে এসে শান্তাকে বলল, আমাদের এই ফাঁকায় থাকার সুখ বুঝি গেল। শনি ঢুকেছে। নইলে একদিনে সব মুরগি সাবাড় হবে কেন?

অনেক রাতে ঘুমের ঘোরে অনাথ টের পেল, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। তারা ছুটে এসে জানলার পাল্লা আক্রমণ করলো। শুয়ে শুয়ে এ আওয়াজ শুনতে বড় ভালো। তারই ভেতর বাঘার গলা পেল। অনেক দূর থেকে বাঘা ডাকছে। বাইরে এখন একটুও আলো নেই। কোম্পানি বাঁধ, মৌজা চন্দনেশ্বর, মৌজা খাড়ুপাতালের ওপর দিয়ে বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস দাপাচ্ছে। এর ভেতরে বাঘা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে। না, কাঁদছে বোধ হয়। ঘুমে, আরামে বাঘার গলার আওয়াজও অনাথের কাছে স্বপ্ন হয়ে ফুটে উঠলো। স্বপ্নে কেউ কি আর

ওঠে! অনাথও উঠলো না।

উমা এরকম সময় মাঝে মাঝে কান লটপট করে। বিশাল কান। সেই লটপটানির আওয়াজও শুনতে পেল অনাথ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই। খুব আস্তে ডাকলো। উমা! উমা! অনেকদিন হল আমাদের বাড়িতে এসেছো। তোমার ঠিকমত যত্ন হচ্ছে না উমা।

আবার বাঘা ডাকছে। আন্দাজে ঘুমের ভেতর অনাথ ফাঁকা মাঠে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখলো। বাঘা গলা তুলে ডাকছিল। সে আলোয় এক মুহূর্তের জন্যে তাকে দেখা গেল। চোখ দুটো জ্বলছে। লেজ খাড়া হয়ে উঠলো।

কার্তিকরাঙী ধান উঠে গেছে অনেকদিন। তার চাল উঠে বাজার থেকে ফুরিয়েও গেল। সবার শেষে ওঠে মরিচশাল ধান। তাও উঠলো। সকাল-বেলাটা পুকুরের দিককার বারান্দা হিম পড়ে চান করে থাকে। রোদ তাতলে তবে সে-জল শুকোয়।

শেষরাতের কুয়াশার ভেতর মাথায় চাদর পাকিয়ে বেরিয়ে পড়ল অনাথ। চেনা ঈশ্বরীতলা তখন অন্যরকম। দূরে স্টেশনবাজারে জবেদের খোটিতে তখন মাছ নিলামের ডাক উঠছে। তার অস্পষ্ট কলরোল ভেসে আসছিল। অনাথ উলটোদিকে হাঁটা ধরলো। বেরোবার সময় দেখেছে—উমা বসে বসে ঘুমোচ্ছে। নতুন বাছুরটা কাল রাতের বাসি জাবে এই ফিকে ভোরে মুখ দিচ্ছিল।

মাঠের ঘাস ভিজে।

হাঁটতে হাঁটতে অনাথ বিন্ধ্যেশ্বরীর বাওড়ে এসে হাজির হল। এখানে সব চেয়ে আগে ভোর আসে। মরা চাঁদের গোল রেখাটুকু শুধু বাওড়ের জলে মুখথুবড়ে পড়েছে। ভোররাতের বাতাস অন্ধকারে বয়ে গিয়ে আলো এনে দিচ্ছিল। অনেকটা জুড়ে বাওড়ের জল।

অনাথ বটতলায় আসন করে বসলো। এখান থেকে আকাশ, জল, বাতাস—সব কিছু অনুভব করা যায়। ক'দিন আগে অসময়ে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাওড়ের জল তাই খানিকটা বেড়েছে। চাদরখানা ভালো করে গায়ে পেঁচিয়ে নিল অনাথ। এই সময়টায় নির্জন চরাচরে গাছপালার ভেতর তার একটা ভাব আসে। সে ভাবের কোন মানে জানে না। অনাথ ধ্যান জানে না। কোন গূঢ় জ্ঞান নেই তার। পৃথিবী এখানে গাঢ় হয়ে বাওড়ের জলের মতই কানায় কানায় ভরতি।

আমি কি ছাড়তে শিখেছি? নিজেকে প্রশ্ন করলো অনাথ। আগে অনাথ অফিসে প্রোমোশন, স্পেশ্যাল ইনক্রিমেণ্ট নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। মনে কষ্ট পেয়েছে। অনেক কিছুই ঘোর অবিচার বলে মনে হয়েছে। মনটা এক রকমের বিষাদের চাপে কালো হয়ে উঠতো। সে তো অনেকদিন আগেকার কথা। তারপর সে আস্তে আস্তে আকাশের রঙ চেনে ঈশ্বরীতলায় এসে। ছুটন্ত বৃষ্টিকে দৌড়ে আসতে সে এখানেই দেখে। দেখে দেখে আর ফুরোয় না। ভগবানের নিজের এই ফুটবলটার সারা গায়ে গাছপালা, মানুষ দিয়ে তৈরি এত লেসের কাজ! ভাবা যায় না। কত ডিজাইন।

এখানে এসে আমি একটা মজায় জড়িয়ে আছি। কলকাতায় থাকতে যত এলেবেলে জিনিস গায়ে লেগে ছিল—তা ঝেড়ে ফেলতে পেরেছি ঠিকই। কিন্তু এখানে এসে একদম নগর বসিয়েছি। শাস্তা, উমা, টুকু, বাঘা, শুক্লা, লিলি আরো কত কি! শেষ নেই। আজকাল কানাইটার জন্যে বড় মনখারাপ হয়। ওকে বেচে না দিয়ে উপায় নেই। ঢুঁসোয়। কোন কাজে আসে না। খড় খাবে আর ফেলবে তিনগুণ। কিন্তু কোথায় যাবে? কোন অজানা জায়গায় গিয়ে বেঘোরে না প্রাণটা দেয়! যে কিনবে সে কি ঠিকমত খেতে দেবে?

বাওড়ের সামনে এই বটতলায় বসে অনাথ মনস্থির করার চেষ্টা করতে লাগলো। আমি ছাড়তে শিখলাম কোথায়? না ছাড়লে কি এই জগৎসংসার দেখা যায়! দেখার চোখ পাওয়া যায়! আমার সারা চোখে এখনো কত জিনিসের জন্যে মায়া আকন্দ-আঠা হয়ে লেগে আছে। কবে বাহুল্য কমাতে কমাতে একদম একা হয়ে যাবো! শুনতে স্বার্থপরের মত। কিন্তু এই পৃথিবীটার রস নিতে গেলে একদিন তো একা হতেই হবে। না হয়ে তো কোন রাস্তা নেই।

মৌজা চন্দনেশ্বরের ওপরের আকাশ দিয়ে সূর্য তার আজকের প্রথম তিনটি রশ্মি পাঠালো। যেমনি তেজী তেমনি সোজা। বটতলায় পৌঁছে কুয়াশায়, ভিজে ঘাসে সে রশ্মিগুলো চকচকে আলো হয়ে গেল।

অনাথের মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে আসছিল। পাখিরা বেরিয়ে পড়লো। ওরা এবার বাওড়ের জল পার হয়ে ওপারের খোলা আকাশে যতটা পারে ফুঁড়ে ওপরে উঠে যাবে। এখানে এসে তক দেখছে—পাখিরা রোজ ভোরবেলায় এ কাজটা প্রথম করে।

আরে বসুমশায় যে! কখন এসেছেন?

অনাথ সে কথায় গেল না। আজকাল সে ফাঁক পেলে কিছুদিন অন্তর এখানে চলে আসে। এসে মহম্মদ বাজিকরের ডেরায় গিয়ে বসে। কিংবা তালপাতার ওই কুঁজি ঘরটার বাইরে এই মাটির ঢিবিতে এসে বসে। দু'জনে নানা বিষয়ে কথা হয়। কখনো চুপচাপ বসে থাকে। তখন চোখের সামনে এখানকার আকাশে ছবি বদলায়। এক এক সময় মেঘ মহাভারতের কৌরব সেনা হয়ে আসে। আবার রামায়ণের গল্পের চেহারাও নেয়। প্রথম ভোরে আলো ফুটলে আর শেষ বিকেলে আলো মরলে—এই দুটো সময় আকাশের যে কী হয় তা বলা যায় না। দেখতে হয় শুধু। দেখে দেখে ভাবতে হয়।

ভাবছেন কি দাঁড়িয়ে? আসুন।

আপনার হাতে ওটা কি?

ক্ষেত থেকে মূলো তুলে নিয়ে এলাম।

মূলো কোথায়? ও তো সাপ দেখছি।

রাত থাকতে উঠতে হল অনাথবাবু। ওরা যখন আহারে বেরোয় তখন উঠেছি। নয়তো ধরা যেতো না।

বাজিকরমশায়, কোন অপরাধ নেবেন না, না ধরলেই পারতেন। ওরও তো জীবন আছে।

ধরার কোন ইচ্ছে ছিল না। দাঁড়ান। আগে রেখে আসি। তারপর কথা হবে।

ছেড়ে দিন না।

ঘুরে দাঁড়ালো বাজিকর। উপায় নেই কোন। আজ অনেকদিন ও আমার ওপর নজর রেখেছে। আমি ঘুমোলেও ওর চোখ দেখতে পেতাম। শান্ত হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমিই ওর নিয়তি। আজ ওকে না ধরলে—ও আমায় ধরতো নির্ঘাত। জাত সাপ। ও ধরলে চলে পড়তাম। কোন নিস্তার ছিল না। সে তুলনায় ওকে তো আমি বাঁচিয়ে রাখবো।

নিয়তি মানেন?

উঃ! আপনার স্বভাব বড় খারাপ। একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করেন। কোন্‌টার জবাব দেব? বসুন, আসছি।

অনাথকে আর কথা বলতে না দিয়ে বাঁশের ঝাঁপ সরিয়ে ভেতরে চলে গেল বাজিকর।

খানিক পরে দু'জনে মুখোমুখি বসলো। মাঝখানে সূর্যের পাঠানো রশ্মি এসে

পড়ে আছে। সে ঘাসের ভিজে শিশিরটুকু বাষ্প করে দেবে অল্প সময়ে। সে-কাজই শুরু হয়েছে। ঘরে দুটি কচি ডাব আছে, খাবেন ?

আসুন। কিন্তু কাটবেন কি দিয়ে ?

ভাববেন না। ছুরি-কাঁচির ঘরের মেয়ে ওষ্ট একখানা চাকু দিয়ে গিয়েছে। দাম নেয়নি। ভালো জিনিস।

আপনি প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। ওরা কি আর দাম নেয়! তারপর অনাথ বলল, যে আপনার অন্ন যোগাতো সে কোথায় ?

মাথা ধরায় ওষুধ খেয়ে খেয়ে শহুরে হয়ে পড়ছিল। তাই একদিন জ'পুরের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এলাম। যাক। কিছুদিন অন্তত: আবার সাপ হয়ে থাকুক। অমাবস্যা পূর্ণিমায় বিষ আসুক। মাথার যন্ত্রণায় রেগে গিয়ে গাছের গায়ে ছোবল বসাক।

• বাজিকরের কথার ভঙ্গিতে অনাথ সেই সাপটির ফণা দেখতে পেল চোখের সামনে। গভীর রাতে বুনো গাছপালার ভেতর এক চৌকো জ্যোৎস্নায় অনেক ব্যথা নিয়ে মাথাটি তুলেছে। আর ভার সইতে পারছে না। কাছেই মোটা গুঁড়ির কালসিদ্ধি গাছটায় ঠোকর দিল। এক ছোবল। দুই ছোবল। তিন। এবার মাথা সাফ লাগছে। শরীরের ভেতরে অদৃশ্য পেশীতে চাপ দিয়ে একটা গতি আনলো। সেই গতিতে সাপটা গাছপালার ভেতরে মিশে গেল।

তাকে কি আর পাবেন কোনদিন!

দেখা হয়ে গেলে আমার ঝাঁপিতে উঠে আসবে। আজ যাকে বাওড়ের মাঠ থেকে নিয়ে এলাম—তার সঙ্গে পথেঘাটে প্রায়ই দেখা হতো। আমার ইচ্ছে ছিল না ওকে ধরি, ওর জীবন থেকে তুলে আনি। একদিন বুঝলাম—আমাকে নজরে রেখেছে।

কিভাবে বুঝলেন ?

বোঝা যায় অনাথবাবু। আমার আব্বাজান গুণীন ছিল। আবার ডাকাতও ছিল। তার কাছে আম্মা শিখেছিল সব। দু'জনে শেকড়-বাকড়, সাপ-বিষ আর লুটের মাল নিয়ে জঙ্গলে থাকতো। আমি একটা ছোট ছেলে অবাক হয়ে দেখতাম—আম্মা বনের ভেতর লুটের গয়না পরে বা'জানের জন্যে বসে আছে সেজেগুজে দুপুর থেকে। বা'জান হয়তো ফিরলো মাঝরাতে। কানে কানপাশা, গলায় সাত প্যাঁচের হার, বেনারসী পরে আম্মা তখন ঘুমোচ্ছে। ঘুমন্ত বনপরী। সাত-আট বছরের আমি তখন লণ্ঠন দেখিয়ে বা'জানকে সিগনেল দিই। তবে

বা'জান ঘরে আসে। জঙ্গলের পথেও তো শত্তুর ওৎ পেতে বসে থাকতে পারে। যাগ্ গিয়ে। ভোরবেলা এসব শুনবেন। আপনাকে ডাবের জল দিই আগে।

বলুন না।

মুখ দিয়ে খেতে হবে কিন্তু। বাসনপত্র, গ্লাস বাটি বিশেষ কিছু নেই আমার।

তাই দিন। আপনি একটা খান—আমি একটা।

বিষয়-আশয়ে খেন্না ধরিয়ে দিলে আম্মা। বা'জানের ছিল দেখে বেড়াবার শখ। দখল করার শখ। খবরদারির শখ। আমি কোন্ জঙ্গলে জন্মেছি তা জানি না। জ্ঞান হয়ে তক দেখে আসছি আমি জঙ্গলে থাকি। বা'জান চিনতো কত গাছপালা। ডাক্তার তো ছিল না জঙ্গলে। আম্মা শিখেছিল বা'জানের কাছ থেকে। জ্বর হলে আম্মা আমায় কি সব লতাপাতার রস দিত। দু'দিনে চাঙ্গা হয়ে উঠতাম। বা'জান দলবল নিয়ে দূর গঞ্জে গাঁয়ে চলে যেত। ফিরে আসতো গয়না, টাকা, কাপড়, চাল—এসব নিযে। আমার গল্প আপনার ভাল লাগছে ?

থামবেন না দয়া করে। এ তো আপনার গতজন্মের কাহিনী।

বেশ। যখন শুনতে চাইছেন তো বলি। আমার আম্মা সম্ভবতঃ হিঁদুর মেয়ে ছিল। দূর দূর কালীবাড়িতে বা'জানকে না জানিয়ে বা'জানের জন্যেই পুজো পাঠাতো। আর মাটি খুঁড়ে, মোটা গাছের গুঁড়িতে গর্ত করে টাকা রাখতো। গয়না রাখতো। বা'জান দু'-তিনদিন বাদে ফিরে এসে অনেক কিছুই খুঁজে পেত না। মনেও রাখতে পারতো না সব। খিটিমিটি লেগে যেত দু'জনে। আম্মাকে কাটলো সাপে। বা'জান শেষ অব্দি গেল পুলিসের গুলিতে। কঠিন জান। যেতে কি চায় ? এফোঁড় ওফোঁড় গুলি। তবু মরে না। রাসবাড়ির আদালত-হাটের কাছাকাছি ইটখোলার পুকুরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বা'জান। পুরনো ডাকাত। গাঁয়ের লোক সড়কি, বল্লম নিয়ে ছুটে এসে গেঁথে ফেলল। তবু জান যায় না। মাথা তুলে ভেসে আছে। বড় আশা ছিল বাঁচার। একজন দেখলো, দাঁতে কি একটা শেকড় কামড়ে আছে। দূর থেকে কোচ দিয়ে দাঁতের ফাঁকের সে-শেকড় খুঁচিয়ে সরালো—তবে জানটা বেরিয়ে গেল। এই ছিল আমার বা'জান।

সে-সব গয়নাগাঁটি ? টাকা-পয়সা ?

মাটির গর্তে। গাছের খোডোলে। আম্মাজান আচমকা চলে গেল। তুলে আনা হয়নি। বা'জান জানতো না। তারপর তো ফৌত। আমি ছোট

ছিলাম। সব দেখে রাখিনি। যা জানতাম—তাও ভুলে গেছি। কোন্ সেই জঙ্গলে রাজার ঐশ্বর্য খাজানা হয়ে পড়ে আছে। কেউ কোনদিন হয়তো খুঁজেও পাবে না।

এমন গুণীনের বউকে সাপে কাটলো?

আমি তো তখনো তেমন শিখিনি। বা'জান পুলিসের চোখে ধুলো দিতে বাইরে বাইরে থাকে। সেই সময় আম্মার নিজের ঝাঁপির সাপ ওই কাণ্ডটি করে বসলো। ঝাঁপির মুখ বাঁধতে ভুলে গিয়েছিল আম্মা। মাঝরাতে ডালা খুলে বেরিয়ে এল। আমার আজও মনে আছে। আম্মার পাশে শুয়ে আছি। আমার হাতের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা শরীরটা পার হল। জেগে চুপ করে শুয়ে আছি। নড়লেই খতম। বনে চলে যাবার আগে আম্মাকে চুমু খেয়ে গেল। ঘুমের ঘোরে একবার শুধু 'উঃ!' বলেছিল। শেষরাতে চেঁচিয়ে উঠেছিল। পরদিন রোদ উঠতে নাক বসে গেল। ঘুমে বেহুঁশ। কেউ আর জাগাতে পারলাম না আম্মাকে।

আপনার বা'জান ডাকাত হতে গেল কেন? গুণীন মানুষ—

ডাকাত হবার তো কথা নয় তার। বড গুণীনের ছেলে ছিল। এক হিঁদু বাড়িতে বয়স্থা কন্যার ঘাড় থেকে ভূত নামাতে গিয়ে আম্মার সঙ্গে দেখা। দু'জনে পালিয়ে গিয়ে নিকে করে। দু'জনই দেখতে খুব সুন্দর ছিল। সে আমার এই বয়সের চেহারা দেখেই মালুম হচ্ছে আপনার। নিকে তো করলেন। কিন্তু কেউ আর ঝাড়তে ফুঁকতে ডাকে না। শ্বশুরও ও-বউ ঘরে নিল না। বাইরেও কেউ কাজ দিল না। তখন বা'জান ডাকাত হয়ে গেলেন। এসব আমার জন্মের আগের কথা। তারপর থেকে আমি এই জঙ্গলে জঙ্গলে আছি। আল্লা-তলা অর্ডার দিলে লোকালয়ে যাই।

আপনি তো আমাদের মতই বাংলা বলেন!

আমি বাঙালী। বা'জানের নাম ছিল মোদাব্বের। তারপর আপনাদের মত লোকজনের সঙ্গে আজ চল্লিশ বছর ওঠা-বসা করছি। ভাষাটা তাই অমন হয়ে গেল। আপনাদের গাজনের গান আমার বড় ভাল লাগে। চোত্ মাসে সঙ বেরোলে ছোটবেলায় তার পেছন পেছন ছুটে যেতাম।

বিয়েসাদিতে তো বসেননি!

তা বসিনি। ইচ্ছেই হয়নি। জঙ্গলে জঙ্গলে থাকি। বিশ্বেশ্বরীর এ বাওড় ভালো লেগে গেল। তাই থেকে গেলাম। ওঁরা দু'জন চলে গেলে একা পড়ে

গেলাম জঙ্গলে। নিজেই ঘা খেয়ে খেয়ে শিখতে লাগলাম। অল্প বয়স থেকেই টের পাই—কেউ আড়ালে বসে আমায় দেখছে কিনা। নজরের তাপ লুকোনো যায় না। ধরা পড়বেই। মাসাধিককাল ওই জীবটি আমায় দূর থেকে টেকে আসছে। বাওড়ের জলে চানে নেমেছি—দেখি উনি তীর ঘেঁষে চলে যাচ্ছেন। নামাজ সেরে উঠছি—ওনার লেজ দেখতে পেলাম। অজানা গর্তে ঢুকে পড়ার আগে আমায় ইচ্ছে করেই চেহারার চেকনাইটুকু দেখালো। আমি মনে মনে বলি, আচ্ছা!

গভীর রাতে আহারে বেরোয় ওরা। দু-একদিন দিনের বেলা আমার কুঁড়ির সামনে ধুলো-ধুলো মাটিতে লেজের দাগ চোখে পড়ল। বুঝলুম, লুকিয়ে এসে আমার ডেরাও দেখে গেছে। আর দেরি হলে আমায় কাটবে। আমি ওর মনে ধরে গেছি যে তখন। আর উপায় নেই। তাই আজ রাত থাকতে বেরিয়েছিলাম অনাথবাবু।

ওদের জন্যে কষ্ট হয় না আপনার?

হয়। বোকা। নীরেট জীব। না জেনে গোলমাল করে ফেলে। একটু থেমে মহম্মদ বাজিকর তার আলখাল্লার হাতায় মুখ মুছলো। আপনিই না একদিন কোম্পানি বাঁধের সব সাপ নির্বংশ করতে চেয়েছিলেন!

তখন বুঝতাম না বাজিকর।

যখন কাটে—তখন ওরাও বোঝে না ওরা মানুষকে কাটছে। ভাবে—বাধা দিলাম। ভালবাসলাম। এর নাম কাল ভালবাসা। এভাবে আল্লাতলাহ একজনের হাত দিয়ে আরেকজনের সমন পাঠাল। আমি যে ওর নজরে ধরে গিয়েছিলাম।

সকালবেলাকার বাতাসে শীত ছিল। মহম্মদ বাজিকর বলল, এই ঠাণ্ডায় ওদের বেরোবার কথা নয় এখন। হয়ত খাবার ছিল না। কিংবা শঙ্খলাগার গন্ধ বেরোচ্ছিল গা দিয়ে। তখন ওরা কাঠালিচাঁপার বাস ছড়ায় বাতাসে।

অ্যাতো জেনেশুনে বনে পড়ে থাকেন কেন আপনি?

রাত থাকতে আপনি কেন উঠে বাওড়ের বটতলায় এসেছেন?

আমি নিজেকে এখানে একা পাই। জগৎকে এখানে দেখতে পাই। এত খোলামেলা। কোন ভান নেই।

আমারও তাই অনাথবাবু। ফারাক অবশ্য আছে আপনার সঙ্গে। আপনি সংসারধর্ম করেছেন। আমি করিনি। আবার আমি এই দুনিয়ার গাছপালা

চিনি। কোন্ পাতায় কী গুণ—কোন্ শেকড়ে কী হয় আমি জানি। আপনি জানেন না। বাতাসের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি—বাতাসের ভেতর অদৃশ্য হয়ে কারা দাঁড়িয়ে আছে। খালি চোখেও দেখতে পাই। আপনি পান না।

সেটা কী রকম ব্যাপার বাজিকরমশাই ?

আরেকদিন বলব। তার চেয়ে আসুন চুপচাপ এখান থেকে তাকিয়ে থাকি। দুনিয়ার যতটুকু দেখা যায় দেখি।

ভালোভাবে রোদ উঠে শরীরটা এখন ভাজা-ভাজা হচ্ছে। ভালোই লাগছিল। স'ছটায় ট্রেন গুম গুম করে ঈশ্বরীতলায় ঢুকছে। দিনের আলোয় মদন বদনকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওরা দূরে দূরে ছিপ বসিয়েছে। সেগুলো তুলে তুলে দেখছে। নদীর ফেলে যাওয়া জলে বাওড় বোঝাই। তার সঙ্গে মাঠ-ধোয়া অকালবৃষ্টির জল। প্রায় বর্ষাকালের ভরাট চেহারা। অথচ এখন শীতের মাঝামাঝি। নদী সেই কোন্ কবে এখান থেকে মুছে গেছে। এই বটতলাই হয়তো ছিল খেয়াঘাট। এখন সে-নদীর বুক ধানক্ষেতের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। নতুন পয়োস্তি জায়গা জেগে ওঠায় ডাঙার লোকের লোভ উথলে উঠেছে। ওই যে দূরে ধোঁয়া-ধোঁয়া যে সব জায়গা আবছা দেখা যায়—ওখানেই পয়োস্তি বালি জায়গায় সবজির চাষ। দক্ষিণার ভাগী চাষীরাও ওদিকটায় থাকে।

মদন এখানে আসার আগে তার লাল বারান্দায় নিশ্চয় বাঁধা ভাঁড়ের তাড়িটুকু রেখে এসেছে। ঈশ, অনন্তমূল—আরও অনেক কিছু মিশিয়ে ভাঁড়ের মুখ বেঁধে তবে গাছে ঝোলানো হয়। একটু একটু করে রস জমে। ভাঁড়ের তলানিতে থাকে চুন। সেখানে রোদের তাত সারাদিন ধরে ভাপে ভাপে জিনিসটুকু জারিয়ে দেয়। তাতে নেশা থাকে। থাকে পৃথিবীর ভেতরকার নিজের রস। আগে মাড়ি চিনচিন করে ওঠে। তারপর গাল। খানিক বাদে মাথাটা ভারী হয়ে গিয়ে পাথর বনে যায়। তখনই মজা।

মহম্মদ বাজিকরের গায়ে শুধু আলখাল্লা। অযত্নের কাঁচাপাকা চাপদাড়ি খানিকটা বুক ঢেকে রেখেছে। দাড়ির পাশ দিয়ে খোলা বুকের একচিলতে লালচে লাগছিল রোদে। বড় বড় দুই চোখে বাওড়ের ছায়া পড়েছে। পেছনে তাকালেই এই নির্জনে তার ডেরা চোখে পড়বে।

আপনি আমার চেয়ে অনেক পরে দুনিয়ায় এসেছেন। এখনো আপনার সময় আছে। আপনার নিজের কোন জিনিস তৈরি করতে ইচ্ছে করে না ? আমার তো সে বয়স আর নেই।

আমি আর এ বয়সে কি তৈরি করবো ?

কেন ? কোম্পানি বাঁধের গায়ে আপনার তো তিন-চার বিঘে জায়গা আছে। ওখানে চাষ করুন না।

চাষের আ ম কিচ্ছু জানি নে বাজিকর।

করতে করতে শিখবেন। তৈরি করার আনন্দ আলাদা জিনিস। মদন বদনকে ডাকবেন। দেখবেন কত সুখ।

কেন ? আপনি কি কোনদিন চাষ করেছেন ?

আমি করতে পারিনি বলেই বলছি।

॥ দশ ॥

মাঘের মাঝামাঝি কানাই বিক্রি হয়ে গেল। কিনলো ঈশ্বরীতলারই নন্দলাল। ইটখোলা আছে। পগামলের ইট হয়। গুঁড়ো কয়লা আসে রাণীগঞ্জ থেকে লরীতে। কাজের মেয়ে পুরুষ আসে রাঁচী থেকে। তারা ইটখোলাতেই ঘর বানিয়ে থাকে মুরগ পোষে। সেখানকার কাঁচা কাদা ঠিকমত মেশাই করার জন্যে একটা লোহার ঘেরের ভেতর মাটি ফেলে দিয়ে বাইরে থেকে কলুর বলদের ধারায় কাঁধে ডাণ্ডা নিয়ে কানাই সারাদিন পাক খায়। বাজারের পথে আর যায় না অনাথ। গেলেও ইটখোলার দিকে তাকায় না। যদি কানাইয়ের সঙ্গে চোখাচুখ হয়ে যায়। কানাই তাকিয়ে থাকলে কি বলবে অনাথ ? কিছু বলার নেই তার। বসিয়ে আর খাওয়াতে পারছিলে না। ভালো কথা, ছেড়ে দিলে পারতে। চরে খেতাম। আর বিক্রী করলে ইটখোলার কাছে। জানতে না কী খাটুনি। এ কাজে কোন জন্তুই এক মরশুমের বেশী টেকে না। টিকলেও দাগী হয়ে যায়। অসুখ ধরে। এই কি কথা ছিল তোমার সঙ্গে অনাথবাবু ? ইটখোলার মরশুম কাটিয়ে উঠতে পারলে কোন চাষী হয়তো সস্তায় কিনে নিয়ে যাবে। পিটিয়ে হালে জুতবে।

আজকাল অনাথের রুটিন অন্যরকম হয়ে গেছে। ভোর-ভোর তাড়ি খেয়ে নিজের বাড়ির লাল বারান্দায় বসে মিটিং করে। সেদিন বাজিকরের কথাটা তার মনে ধরেছে। একটা কিছু তৈরি করার ভেতরে বোধ হয় এই জগতের প্রাণ বাস করে। শুধু সেখানেই তাকে টের পাওয়া যায়। ছোঁয়া যায়। প্রথম ভেবেছিল —লোকজন খাটিয়ে নিজের বিঘে চারেকে চাষ করে দেখবে। এখন আই আর

এইট না কি সব বেরিয়েছে। শীতের শেষে রোয়। জ্যৈষ্ঠের শেষদিকে ধান ওঠে। বর্ষার চেয়ে এ সময়টায় নাকি বেশী ফলে। তবে তরিবত চাই অনেক বেশী।

বাজিকরের কথাটা ক'দিনই তার মাথার ভেতরে মার্বেল হয়ে গড়াচ্ছিল। নিজে নিজে কি বানানো যায়। বানানোর জিনিস কী এমন আছে—যা কি না আপনা-আপনি রোজ বদলে গিয়ে দুনিয়াদারির রূপ খোলসা করে দেখিয়ে দেয়। অফিসে বসে বসে বাজিকরের এসব কথা খতিয়ে খতিয়ে ভেবেছে অনাথ। বাজিকর বলেছিল—বৃক্ষ। যার প্রাণ আছে।

নদীরও প্রাণ আছে বাজিকরমশায়। আমি কি একটা নদী তৈরি করতে পারি?

আমি একসময় পারতাম অনাথবাব। সে অন্য কথা।

বলুন না। আমি একদম আনাড়ি। কোন জিনিসই কিছু জানি না।

আপনার ভেতরের মাটি ভালো। যা ইচ্ছে ফলানো যায়।

আপনি নদী তৈরির কথাটা বলুন বাজিকরমশাই।

সে তন্ত্রের কথা। একসময় তন্ত্র নিয়ে খুব মজেছিলাম। তখনকার কথা। কিন্তু তৈরি করলেও সে তো আসল নদী নয়। চোখের নেশা। মনের গোলমাল। আসল নদী তৈরির কারিগর তো খোদ আল্লাহতলা। যাগ্ গিয়ে। সে আরেকদিন হবে। আপনি বরং চাষ করুন। ধান করতে পারেন। কত কি আছে। লঙ্কা করুন। বিঘে পিছু চৌদ্দশো চারা বসাতে পারবেন।

তাতে কি দুনিয়াদারি টের পাবো?

খুব পাবেন। কাঁচা লঙ্কা দু-তিন টাকা কেজি। শুকোলে দশ টাকা বারো টাকা। লোভের খেলাধুলো বুঝতে পারবেন।

ঈশ্বরীতলার মাঠে বর্ষার চাষ উঠে গেলে সবাই গরু ছেড়ে দেয়। এখানে লোকালয় থেকে লঙ্কার চাষ কঠিন ব্যাপার। মদন বলল, বাবু, তুমি ধানচাষ করে ছাখো। অনেকটা জুড়ে চাষ করলে গরু বেঁধে রাখবে সবাই।

কিন্তু জায়গা তো মোটে চার বিঘে। বড় চাষ হবে কোত্থেকে?

তাহলে পাম্পে খালের জল তুলে চাষের খরচ উঠবে না।

অনেক ভেবে একটা রাস্তা পেয়েছে অনাথ। ঈশ্বরীতলা, মৌজা চন্দনেশ্বর, মৌজা খাড়ুপাতাল, মৌজা খারিকপোতা—যদ্দূর দেখা যায়—সবটাই অনেক অনেক বছর আগে বঙ্গোপসাগরের বুক ছিল। সমুদ্র সরে যাওয়ার সময় বসুমতীর বুকের ভেতর নোনা জল ফেলে রেখে গেছে। বসুমতীর হাড়পাঁজরে নুন মাখিয়ে

রেখে গেছে। এখানে মিষ্টি জল অনেক গভীরে। চাষ করতে হলে কোম্পানি বাঁধের লাগোয়া খালের জলই ভরসা। সে-জলে অনেক চাষ করলে তবে পড়তায় পোষায়। কিন্তু জমি কোথায়?

ভেবে ভেবে একটা রাস্তা পেল অনাথ। এই রাস্তা আবিষ্কারে নেমে সে এক বিরাট জগতের সন্ধান পেল। তার নেশাই আলাদা। বর্ষার চাষের পর জলের অভাবে, সারের অভাবে বিরাট জায়গা পড়ে থাকে। কারো পাঁচ বিঘে। কারো এক বিঘে। এরকম করে কোম্পানি বাঁধের গায়ে অন্ততঃ তিনশো বিঘে জায়গা শীতকালে ধান উঠে গেলে পতিত পড়ে থাকে।

ধান লাগছে বিঘে পিছু ছ'কেজির মত। মাসখানেক কিংবা পাঁচ হপ্তায় বীজ ভেঙে নিয়ে পাঁচইঞ্চি ন'ইঞ্চি সারিতে প্রতি খোপে তিন-চারা করে রুয়ে যেতে হবে। ডান হাতের বুড়ো আঙুলে টিপে টিপে। সে-চারা একুশ দিনের হলে ঘন কালো রঙ নেবে। তখন থেকে সার। তখন থেকে গোড়া খোঁচানো। ঘাঁটাঘাঁটিতে শেকড় ছিঁড়ে গিয়ে আরও চারা বেরোবে খোপে খোপে।

মদন যত বলে তার চেয়ে বেশী বলে অন্য চাষীরা। তারা তো মদন বদনের মত হাফ চাষী নয়। সারা পুরো বছরটাই মাটি নিয়ে পড়ে থাকে।

ঈশ্বরীতলায় রটে গেছে। খালের জলে বড় পাম্প বসিয়ে একজোটে চাষ হবে। আজ বিকেলে থিরিশতলায় মিটিং। কাল কোম্পানি বাঁধে। পরশু চন্দনেশ্বরে। এমনি চলছে। অনাথবন্ধু একদম ঘোরে আছে। অফিস এক-রকম মাথায়।

ঘুম থেকে উঠে পুঁটে নস্করের বাড়ি। বাঁধের গায়ে তার সাত বিঘে জমি পড়েছে। দুপুরে স্বয়ম্বর কাওরার ঘরে। স্বয়ম্বর জাল টেনে বেড়ায় রাতে রাতে। দিনে দিনে ঘুমোয়। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে দুটো ক্যাঙলাপানা বাচ্চাকে বেধড়ক পেটায়। এই হল গিয়ে স্বয়ম্বর কাওরার ছবি।

এক-একজনের ঘরে যায় অনাথ। তার বলার আন্তরিকতায়, ইচ্ছের জোরে সবাই জমি দিল। জমি নিতে গিয়ে এমন ডজনখানেক নানা রকমের মানুষকে দেখতে পেল অনাথ। তাদের সঙ্গে অনাথের শর্ত : চাষ উঠে গেলে এক বস্তা ধান।

ধান নিয়ে গাঁয়ের পর গাঁয়ে এক অদ্ভুত সুদের কারবার চলছে। অভাবের দিনে চাষী এক বস্তা ধান ধার নিলে ধান উঠলে দেড় মণ ফেরত দিতে হয়। ঈশ্বরীতলার ভাষায় এ-কারবারের নাম ধানবাড়ি। তেমনি মুদিখানাগুলোয় চালু আছে আটাবাড়ি।

এবারে গাঁয়ের ভেতর বাড়ি বাড়ি ঘুরে অনাথ দেখতে পেল—পুকুরগুলো সংস্কারের অভাবে এক রকমের পচা গন্ধ শ্যাওলা নিয়ে সবুজ হয়ে আছে। পাকা বাড়িগুলো ফাটাফুটো। কাঁচা বাড়ির ছাউনির গোলপাতা পচে ঝুরঝুরে অবস্থা। গাঁইগুলো এঘো রোগে ভুগছে। যাদের ক্ষয়রোগ—তারা সংসারে একপাশে বাতিল হয়ে আছে। জায়গার অভাবে পুরনো ঢেঁকিঘর বাড়ির বুড়ো-বুড়ীর আশ্রয়।

শক্ত, শুকনো—সারা গাঁয়ের চেহারা। মানুষগুলোর কোন রূপই নেই। সবাই সবাইকে অবিশ্বাস করে। ওরই ভেতর অনাথের কথা শুনে ঈশ্বরীতলার মানুষের মনে বিশ্বাস জিনিসটার দিকে বিশ্বাস ফিরে আসতে লাগলো।

অনাথের কথা খুব পরিষ্কার। আমরা ব্যাঙ্ক থেকে ধার করে যন্ত্রপাতি, পাম্প, সার, বিষ, বীজ কিনবো। যাদের জায়গা এখন পড়ে থাকে—তারা চাষ করতে দিলে এক বস্তা ধান পাবে। ফসল উঠলে জমিদারের ভাগ বাদ দিয়ে অর্ধেক চাষীর। অর্ধেক ব্যাঙ্কের। চাষীর গতর। গাঁয়ের মানুষের জায়গা। টাকা ব্যাঙ্কের। আমার কাজ হল—এদের সবাইকে একত্র করা।

মদন জিজ্ঞাসা করলো, এত খেটে তুমি কি পাবে?

আমি? অষ্টারম্ভা।

তবে এ ভূতের বেগার খাটছো কেন?

সে তুই বুঝবি কি করে। যাঃ, পালা। ভালো কথা, বোনের বিয়ে করে?

পিছোতে পিছোতে ফাগুন মাস হয়ে গেল।

ক'ফাগুন ঘুরে গেল? হাতঘড়িটা বেচে খেয়ে ফেলিসনি তো?

তাহলে আমাদের মহাপাপ হবে। আপনি ঘড়ি দিলেন। তারপর সাইকেল হয়েছে।

অনেকেই এসেছে চাষে। দ্বারিকপোতার চাষীরাই সব চেয়ে উৎসাহী। আর উৎসাহী বিশ্বেশ্বরীর নতুন জাগা পয়োস্তি জায়গার চাষীরা। তারা বলে, জল পেলে সব করা যায়। জলই নেই এদেশে। যা আছে তা নোনা। মিঠেন জল সেই পাতালে। বর্ষায় ধরা জল খালে থাকে। তা পাম্প মেসিন পাচ্ছি কোথায়!

ব্যাঙ্কের ম্যানেজারমশায় বললেন, টাকা আমরা দেব। কিন্তু টাকায় দশ পয়সা আপনাদের দিতে হবে।

অনাথ মাথায় হাত দিয়ে পড়লো। সে তো অনেক টাকা মনে মনে বলল. ও বাজিকর মশায়! এ কোন্ খেলায় নামালে আমাকে?

রাতে খেতে বসে শান্তা বলল, যারা তোমায় জমি দিয়েছে—প্রত্যেকের গোলায় ধান আছে। এক বস্তা করে ধান চেয়ে নাও। বলবে, চাষ উঠলে ফেরত দেব। এখন ধানের দর ভালো আছে। পঞ্চাশ-ষাট বস্তা ধান বেচে টাকা ঠিক উঠে আসবে।

খেয়ে উঠে অনাথের মনে হল—কথাটা মন্দ না তো। যারা জমি দিয়েছে—তারাই তো ধান দিতে পারে।

বাইরে ভারী শীত। চল বলাই—

এই রাতে? কোথায়? এখন তোমার চাষীরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

চল্ তো তুই।

মাঠ ভেঙে দ্বারিকপোতায় অম্বিক গাড়ির বাড়ি যখন পৌঁছালো—তখনই সজনেতলায় গাঁয়ের কুকুররা জড়ো হয়েছে। তারা বাঘাকে কামড়াবে। চারদিক কুয়াশা। বাঘা অনাথের হাঁটুর ভেতর ঢুকে যেতে চাইছে—আর কুঁই কুঁই কাঁদছে।

বলাই বললো, গাড়িমশায় এতখোনে শুয়ে পড়েছে। কাল সকালে এসো।

দেখ না দাঁড়া। অনাথ ঈশ্বরীতলার নিয়মমতো বড় বড় করে কাশতে লাগলো। সঙ্গে গলাখাঁকারি। অম্বিক গাড়ির বড় চাষ। কয়েক বছর আগেও মাটি কাটতো। হাজার দরে মজুরী ছিল ভরসা। তাই করে করে অবস্থা ফিরিয়েছে। চাষীদের মুখেই শুনেছে, অম্বিক ধান ধরে রেখে সময়মত বেচে পয়সা করেছে। সে পয়সা ঈশ্বরীতলার স্টেশনবাজারে নতুন ব্যাঙ্কবাড়িতে রাখে না। রাখে নিজের ঘরে। ঘরের বাইরে শোয়। মাটির মেঝে। কিন্তু ভিতের ঘের বালি সিমেন্টে গাঁথা ইঁটের। বারান্দায় শুয়ে শুয়ে সারারাত জেগে কাটায়। চোর এলে যদি অপ্রস্তুত থাকে। ডাকাত এলে যদি তারা অম্বিককে ঘুমন্ত অবস্থায় পায়। তাই যা কিছু ঘুম দিনে দিনে—দুপুরবেলায়। সারারাত মাদুরের পাশে টর্চ, সড়কি নিয়ে জেগে বসে থাকে অম্বিক গাড়ি। সারা গাঁয়ের ফেনখোর কুকুরগুলো অম্বিকের বারান্দার আশেপাশে পড়ে পড়ে ঝিমোয়। এ সব খবর চাষীদেরই।

বিশেষ কাশতে হল না অনাথের।

কে? কে ওখানে?

চোর পড়লেও লোকে এমন চেঁচায় না। আমি অনাথ।

কোন্ অনাথ?

এবার বলাই চেঁচিয়ে বলল, তোমাদের কুকুরগুলো একটু সামলাও। কামড়াবে।

হেরিকেন হাতে অম্বিক বেরিয়ে এল।

বলাই বলল, আমরা কোম্পানি বাঁধের নতুন বাড়ির—

আলো তুলে অম্বিক বলল, বসুমশায় যে। আসুন।

সব বলার পর অম্বিক বলল, শুধু শুধু ধান বয়ে নিয়ে যাবেন কেন? কাল সকাল সকাল বাজার যাওয়ার পথে টাকা দিয়ে আসবো। এক বস্তা ধানের দাম তো? সবাই দেবে।

চাষের ভাগ ধরে মোট তাহলে দু'বস্তা ধান দেবেন তো?

নিশ্চয়ই। আপনি নিশ্চিন্তে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমি নিজেই সবাইকে বলবো। দু-চার দিন সময় নেবে।

টুকু যাবে সীতাকুণ্ড। বিকাশ কলকাতায়। বছর দেড়েক হয়ে গেল টুকু সীতাকুণ্ডুর গার্লস স্কুলে পড়ছে। বিকাশ আশুতোষের ছাত্র।

ডাউন আর আপ ট্রেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। বিকাশ ডাউন ট্রেনে উঠে বসলো। টুকুর এসব দেখার সময় নেই। ঈশ্বরীতলার স্কুল পালটে সীতাকুণ্ড যেতে তার প্রথম প্রথম বাজে লাগত। এখন বরং সীতাকুণ্ডু অনেক বেশী ভাল লাগে। নীলপাড়ের শাড়ি পরতে হয় এখানে।

প্ল্যাটফর্মে নেমে টুকু বিকাশকে দেখে অবাক্। লাল কাঁকর ছড়ানো প্ল্যাটফর্মের বাঁ হাত দিয়ে নেমে গিয়ে স্কুলের পথ। সেই পথের মুখে একটা বিরাট নিম গাছ। তার নীচে টিউবওয়েল। প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হয়ে গেল ট্রেন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। টুকুর কী রকমের একটা লজ্জা এসে গেল। পা আর ওঠে না। বিকাশ এগিয়ে এসে বলল, আমার চিঠি পেয়েছিলে?

সব জেনেও টুকু বলল, কোন্ চিঠি?

জগেন যাত্রা তোমার হাতে কোন চিঠি দেয়নি?

ওঃ! হ্যাঁ। দিয়েছিল। সে চিঠি তো বাবাকে দিয়েছি। সেটা চিঠি ছিল বুঝি? আমি ভেবেছিলাম—পাগলের কাগজ! কথা বলতে বলতে টুকু দেখলো, বিকাশের মুখখানা কালো হয়ে গেল। ওর ভেতরেই টুকু বলল, আপনি

এখানে ? কলেজে যাবেন না ?

যাবো। এই ট্রেনটাই তো আপ ট্রেন হয়ে ফিরে আসবে তখন যাবো। তারপর একটু থেমে বলল, তোমার চিঠি তোমার বাবার হাতে তুলে দিলে কি মনে করে ?

আচ্ছা পাগল তো আপনি। পাগলের হাত দিয়ে চিঠি পাঠালে বুঝবো কি করে আপনার ? যাই. ক্লাসের দেরি হয়ে যাচ্ছে—

দাঁড়াও টুকু। আমার অনেক কথা ছিল।

বিকেলে আমাদের বাড়িতে আসবেন। তখন বলবেন।

কলেজ থেকে ফিরতে আমার সন্ধ্যে হয়ে যায়। এখুনি তোমাকে বলতে চাই। আচ্ছা তোমার ভালো নাম কি ?

টুকু তার জিওমেট্রি বইখানা এগিয়ে দিল। তার মলাটে লেখা—দিস বুক বিলংস্ টু—তারপর তার নাম লেখা।

নামটা পড়ে বিকাশ বলল, স্বতপা বসু। বাঃ। সুন্দর নাম তো।

টুকু অস্থির হয়ে পড়ছিল। স্কুলের টিচার্স কোয়ার্টারগুলো প্ল্যাটফর্মের কাছেই। কোন দিদিমণি জানলা দিয়ে তাকালেই তাকে একটি ধুতি-পরা ছেলের সঙ্গে দেখতে পাবেন। এটা ঈশ্বরীতলা নয়। এটা সীতাকুণ্ড। সবাই জানে—স্বতপা বসু, ক্লাস নাইন, রোল টেন ট্রেনে করে পড়তে আসে।

তোমাকে আমার রোজ দেখতে ইচ্ছে করে।

টুকু কোন জবাব দিল না। সে পরিষ্কার দেখতে পেল, নিমগাছের পাতার ছায়া তার শাড়ির সাদা জমির উপর তিরতির করে কাঁপছে। প্ল্যাটফর্ম দিয়ে এক-একটা কুকুর হেঁটে যাচ্ছে। তার নিজের কান লাল হয়ে যাচ্ছে। আস্তে বলল, আপনি লেট হয়ে যাবেন কলেজে—

ফার্স্ট পিরিয়ডটা ডুব দিলাম।

কেন ? তা দেওয়া যায় বুঝি ?

কলেজে তা হয়। সব পিরিয়ডেই আলাদা করে রোলকল হয় তো।

বাঃ। বেশ মজা তো।

তাছাড়া প্রক্সি আছে।

সেটা কি জিনিস ?

খুব গর্ব হচ্ছিল বিকাশের। বলল, ক্লাসে একজনকে বলে রাখি। আজ ভাই যেতে দেরি হবে। আমার রোল ডাকলেই সে ইয়েস স্যার বলবে।

যদি ধরা পড়ে যায়?

সাবধানে বলতে হয়।

কলেজ জিনিসটাকে সুতপা ইদানীং খুব সমীহ করে চলে। সেখানে যারা পড়ে সবাই হায়ার সেকেণ্ডারি পাস। কেমন স্বাধীনভাবে তারা পড়তে যায়। তারপর প্রক্সি বলে একটা নতুন জিনিস শুনলো আজ। কলেজ সম্পর্কে তার জ্ঞানভাণ্ডার একটু একটু করে বেড়ে উঠছে। আজ আরও কিছু তাতে জমা পড়লো। সে যে কবে নিজে কলেজে পড়বে!

আমার চিঠি তুমি এক লাইনও দেখোনি?

দেখেছি। বাবা কাগজখানা রেখে দিয়েছিল তাঁর টেবিলে। আমি দুপুরে একা একা পড়েছি পরে।

ওসব কি দোকা পড়ার জিনিস? একাই পড়তে হয় সুতপা।

টুকু দেখলো, বিকাশের মুখখানা সোজা রেল কোয়ার্টারের দিকে। চোখ নিমগাছের ছায়ায়। কোন এক জায়গায় দৃষ্টি দাঁড়িয়ে নেই বিকাশের। গম্ভীর। ক্লান্ত।

টুকুর মজাই লাগছিল। ওসব লিখেছেন কেন? আমায় তো রাস্তায় বেরোলেই দেখা যায়। কোম্পানি বাঁধে বিকেলবেলা লিলিকে নিয়ে আমি প্রজাপতি ধরি। বাঘাও আমাদের সঙ্গে থাকে।

বাঘাকে সঙ্গে রাখো কেন? ওর জন্যেই তো যাওয়া যায় না বাঁধে।

বাঘা খুব ভালো। আমরা ছাড়া ওর আর কেউ নেই। নিজের বাবা মায়ের কথাও ও ভুলে গেছে। এত ছোট এসেছিল আমাদের কাছে।

খুব বাজে কুকুর। আমাকে দেখলেই গরগর করে।

আমায় খুব ভালবাসে।

আমিও তো তোমায় ভালবাসি।

থাক। ও কথা বলবেন না। আপনার ট্রেনের ডাউন দিল।

॥ এগারো ॥

উঠোনের বাতাবি গাছের মোটা ডালে হ্যাজাক ঝুলিয়েছে বদন। আশপাশের কচি ডালগুলো তাই ছেঁটে দিতে হয়েছে। আলো দেখে পোকা হলে তারা গিয়ে গাছের সবুজ পাতায় বসবে। তাহলে খানিকটা উপদ্রবও কমবে।

বরযাত্রী আসার কথা ছিল বারোজন। এসেছে একুশজন। ভদ্রেশ্বর চটে লাল। বাকী ক'জনের যোগাডযন্ত্র এখন কোত্থেকে হবে? ছেলে বংশী কাপালিকে বেশ দেখাচ্ছে। বদন সাইকেলখানা গামছা দিয়ে ভালো করে মুছে হ্যাজাকের নীচে রেখেছে।

ভদ্রেশ্বর বংশীর দাদা বরকর্তা হরিদাস কাপালির সঙ্গে একচোট লাগিয়ে দিল। জোরে জোরেই বলল, এই কি কথা ছিল? এ বাজারে এরই নাম ভদ্রতা?

পুরোপুরিই লেগে যাচ্ছে দেখে মদন তার দাদাকে একরকম জোর করেই সম্প্রদানের পিঁড়িতে বসিয়ে দিল। হ্যাজাকের আলো যেখানে ফিকে হয়ে পড়েছে —সেখানটায় অন্ততঃ বারো-চৌদ্দটা কুকুর দাঁড়িয়ে। ওদিকটা বিপজ্জনক দেখে বাঘা এখন বরযাত্রীদের একজনের শু জুতোর গোড়ালি দাঁতে কাটা যায় কিনা দেখছিল। সেখানটায় ঘরের ছায়া বলে কিছু দেখা যায় না। বরের বড় ভাইয়ের পাশে বসেছে অনাথ মদনের ধরাধরিতে সে এসেছে। খানিক বসে বাড়ি ফিরতেই হবে। এখন রাতে রাতে পাম্প চালাতে হয়। সব দাগে জল পৌঁছোলো কিনা চাষীরা তা ঘুরে ঘুরে দেখবে। যার পৌঁছয়নি সে আল কেটে জল নেবে। বরের পিঁড়িতে বংশী। তার বকজিতে অনাথের হাতঘড়ি।

মাটির উঁচু দাওযায বাচ্চাদের একটা ব্যাচ খেয়ে উঠলো। বিয়ে চলছে, রাত ন'টা-দশটা হবে। অনাথ উসখুস করছিল। সে জামিন দাঁড়িয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়েছে। সেই টাকায় ইলেকট্রিক পাম্প, বীজ-ধান, সার, বিষ, বিষ ছড়াবার মেশিন এসেছে। এখন প্রায় তিনশো বিঘের পঁয়তাল্লিশ দিনের ধান-চারা কালো হয়ে উঠেছে। জল থাকা চাই—কম করেও আধ ইঞ্চির মত। এই সময়টায় ধা ধা করে চারাগুলো বাড়ে। থোর আসতে শুরু করে। প্রতিটি চারার গর্ভ-থোড ফুলে গোল হয়ে যাবে কয়েক সপ্তাহের ভেতর। এখন নজর না রাখতে পারলে ভরাডুবি।

অনাথ উঠি-উঠি করছিল। বদন এসে বলল, আর আধঘণ্টা বাবু। বিয়েটা হয়ে গেলেই তুমি বরযাত্রীদের সঙ্গে পাত পাতবে।

হ্যাজাকের আলোর বাইরেই গাঁয়ের পুকুরগুলো, ঢেঁকিঘর, বাঁশবাগান, টিউবয়েল নির্জনে পড়ে আছে। বসতি ফাঁকা হতে হতে গিয়ে ধানক্ষেতে মিশে গেছে। সেখান থেকে দূরে তাকালে এখন জ্যোৎস্নাকেও ঝাপসা কুয়াশা লাগবে। এইভাবেই ঘন বসতি নিয়ে এক-একটা বড় বুদ্বুদ হয়ে গ্রাম জিনিসটা পৃথিবীর গায়ে লেগে আছে। আবার বসতি কমতে কমতে চাষের জায়গায় গিয়ে একদম

শূন্য। এই হল গিয়ে জগতের ব্যবস্থা। অনাথ আজকাল জানে—দূরে গাছ-পালার ঘন জটলা মানেই তার পেছনে ঘন বসতি আছে। মানুষ না হলে এত গাছপালা পুঁতবে কে?

ঈশ্বরীতলার ভরদ্বাজ পণ্ডিত যা-কিছু সংস্কৃত মন্ত্র পড়ছিল—তার কোনটাই ওষ্ট কিংবা বংশী উচ্চারণও করতে পারছিল না। একখানা লাল শাড়িতে ওষ্ট একদম পুঁটুলি। ভদ্রেশ্বর লাল উড়ুনি গলায় দিয়ে তান্ত্রিকের চেহারা পেয়েছে।

বরযাত্রীদের ভেতর গাঁয়ের নিমন্ত্রিতরাও আছে। তাদের সামনে একথালা ভরতি বিড়ি আর দুটো দেশলাই সাজিয়ে বদন সাধাসাধি করছিল।

এমন সময় জুতোর আওয়াজ। কুকুরদের পরিত্রাহি ডাক। টর্চের আলো এসে থামলো উঠোনে। সবাই উঠে দাঁড়ালো। কি ব্যাপার? পুলিস কেন?

রাসবাড়ির আদালত-হাটের গায়েই থানা। সেখানকার মেজোবাবুকে দেখে অনাথ এগিয়ে গেল। কি মনে করে স্যার?

আরে। আপনি? এখানে?

একটা বিয়ে হচ্ছে।

এটা ভদ্রেশ্বর প্রামাণিকের বাড়ি?

অনাথের আর 'হ্যাঁ' বলতে হল না। সম্প্রদানের পিঁড়ি থেকে তড়াক্ করে উঠে এল ভদ্রেশ্বর। আমি হুজুর।

তুমি? এই কেশব, সন্তোষকে আন তো এদিকে—

বরযাত্রীরা উঠে দাঁড়িয়েছে। বাঘাও জুতো ফেলে ভিড়ের ভেতর ঢুকে গেল। গাঁয়ের কুকুরগুলো তাকে কাছাকাছি পেয়ে আবার চেঁচাতে লাগলো। একজন কনেস্টবল বুটসুদ্ধ একটা কুকুরকে লাথি মারতেই বাকীগুলো একটু দূরে সরে গিয়ে আবার চেঁচানো ধরলো। বাবা ভিড়ের ভেতর অনাথকে খুঁজছিল।

হাতকড়া পরানো সন্তোষকে দু'জন পুলিস গুঁতো দিয়ে সামনে নিয়ে এল।

সে সন্তোষ আর নেই। দক্ষিণা চক্কোত্তির ইদানীংকার লোক হয়েও তার মুখের একটা দিক ফুলে উঠেছে। খালি গা। পরনের ধুতিখানা আধো-খোলা। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। দু'জন পুলিসের কনুইতে ভর দিয়ে কোনক্রমে দাঁড়িয়ে সন্তোষ টাকি বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

মেজোবাবু ভদ্রেশ্বরের কাঁধে একটি থাবা বসালেন, ইদিকে আয়—

আমার বোনের বিয়ে হচ্ছে হুজুর।

তোরও বিয়ে হবে এখন! মেজোবাবুর আরেকখানা থাবা পড়লো কাঁধে।

ওই উঠে দাঁড়িয়েছে বিয়ের পিঁড়িতে। বড়দা—। তার মাথার ঘোমটা খসে পড়লো। মন্ত্র থামিয়ে ভরদ্বাজ পণ্ডিতও পিঁড়িতে বসে আছে। পাত্র বংশী কাপালিও বসে।

দু'জন পুলিস ভদ্রেশ্বরের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। ভদ্রেশ্বর চেঁচিয়ে উঠলো, হুজুর। পায়ে পড়ি। কাল সকালে আমায় নিয়ে যাবেন। আমি নিজে গিয়ে থানায় হাজির হব—

কী একটা ভালো কথা বলল একজন পুলিস। শোনা গেল না গোলমালে। তারপর একটি গুঁতো।

ওই ছুটে আসছিল। অনাথ গিয়ে ধরে ফেলল। এখন বিয়ের পিঁড়ি ছেড়ে উঠতে নেই। বোসো

মেজবাবু চেঁচিয়ে বললেন, জগেন যাত্রার জুতোর দোকানের তালা ভাঙার সময় মনে ছিল না এসব কথা?

টচের ফোকাস। বুটের শব্দ। কুকুরদের কোরাস দূরে চলে যাচ্ছিল। অনাথ ছুটে গিয়ে মেজোবাবুকে ধরলো, আজকের রাতটা ওকে ছাড়া যায় না! আমি জামিন—

হাসালেন আপনি। জামিন কোর্টে হয়। আজ রাতে তো আর কেস উঠছে না। থানা লকআপে থাকবে। কাল বেলা দশটায় আলিপুর চালান দেব। তখন আসবেন অনাথবাবু।

আপনাদের হাতে ডেফিনাইট প্রমাণ আছে?

না থাকলে এতটা পথ এই রাতে আসি আমরা? সন্তোষ টাকিকে পেলাম ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের ওখানে। শেয়ালদায় যে জুতোর দোকানে বাহাত্তর জোড়া কাবলি বেচেছে তার প্রোপ্রাইটার ধরা পড়েছে কাল বিকেলে।

কথা দিচ্ছি মেজোবাবু, ভদ্রেশ্বর পালাবে না। কাল সকালে আমরা গিয়ে ওকে দিয়ে আসবো থানায়।

কেন ছেলেমানুষি করে সময় নষ্ট করছেন অনাথবাবু। এফ. আই. আর করেছে ব্যাঙ্ক। জগেনের দোকান হাইপথিকেট করা ছিল—

পুলিসদের পিছু পিছু কুকুরের পালও চলে গেল। ছাদনাতলায় এখন ভাঙা বিয়ের চেহারা। ভদ্রেশ্বরের বউ সেই যে ঘরে গিয়ে ঢুকেছে আর বেরুলো না। ওই একা বিয়ের পিঁড়িতে বসে। মাথায় ঘোমটা তুলে দেওয়ারও কেউ নেই কাছাকাছি।

ঘরের উঁচু দাওয়ায় গাঁয়ের নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে বরযাত্রীদের কয়েকজনের তর্কাতর্কি বেধে গেল। মদন ছুটে এসে অনাথকে বলল, বাবু বাঁচাও! যা হয় একটা বুদ্ধি করো। বিয়ে যে ভেস্তে যায়—

বদনও কাছে এসে দাঁড়ালো। এক কাঁড়ি টাকা খরচা হয়ে গেল বাবু। তোমার হাতঘড়িটাও গেল। যা হয় একটা কিছু করো।

হ্যাজাকটা ঠিক কর আগে।

মদন ছুটে গিয়ে পাম্প করতে লাগলো। ভেতরের শিখা খাবি খেতে শুরু করেছিল। আবার সোজা হয়ে উজ্জ্বল আলো দিতে লাগলো।

বংশী চুপ করে পিঁড়িতে বসে। অনাথ বলল, শুরু করুন পণ্ডিতমশায়।

সম্প্রদান করবে কে?

আমি করবো।

আপনি? তা বেশ। খুব ভালো কথা। আমাদের ওষ্টর তো মহাভাগ্য। মা, ঘোমটা তুলে নাও মাথায়—

সবে এক লাইন লম্বা শ্লোক শেষ হয়েছে এমন সময় বংশীর দাদা দাওয়া থেকে ছুটে এসে বংশীর পাশে দাঁড়ালো, এ বিয়ে হবে না। উঠে আয় বংশী—

পণ্ডিতমশায় শ্লোক থামিয়ে চোখ তুলে তাকালেন। তাকিয়ে তিনি দেখলেন, বাঁশবাগানের মাথায় সাদা রঙের ভোকাটা একখানা চাঁদিয়াল ঘুড়ি বাতাস পেয়ে আপনা-আপনি উড়ছে। এমন গুরুগম্ভীর পরিবেশে তাঁর মন ওদিকে যাওয়া উচিত নয়: তিনি বালক নয়। পুরোহিত হিসেবে তাঁকে এখন বিয়ে দিতে হচ্ছে। কিন্তু তবু উড়ন্ত ওই ঘুড়িখানার দিকেই মন চলে যাচ্ছে। ভারী জ্বালা তো!

সম্প্রদানের পিঁড়ি থেকে অনাথ বসে বসেই বলল, মেয়ে আমাদের ভালো। ওষ্ট তো কোন দোষ করেনি।

বংশীর দাদা আরও চেঁচিয়ে উঠলো, চলে আয় বংশী।

বংশী তখনো বিয়ের পিঁড়িতে গ্যাঁট হয়ে বসে।

এই মাসেই তোর আবার বিয়ে দেব আমি। মেয়ের আকাল নাকি?

বংশী কাপালি ঘটকপুকুরে বাস স্টপে আলুর চপ, ঘুগনি, পেঁয়াজি, বেগুনির কারবার করা লোক। বয়সটা কম। কিন্তু চারদিকে নজর আছে। সে পিঁড়িতে বসেই মাথা তুলে দাদাকে বলল, যাও না। দাওয়ায় গিয়ে বোসো। বিয়ে তো অর্ধেক হয়ে গেছে।

তাহলে আমার কথা শুনবি নে? বেশ, থাকলো তোর বিয়ে। চোরের

ভগ্নীপতি হও বসে বসে।

মদন বদন ছুটে গিয়ে বংশীর দাদাকে আটকাতে গেল।

বংশী পিঁড়িতে বসেই হাসতে হাসতে বলল, যেতে দিন না। এখন কোন বাস নেই।

বংশীর দাদা তেজে বেরিয়ে যাবার মুখে বলল, কুমড়োর লরি ধরে চলে যাবো। নয়তো হাঁটবো।

রাত তিনটে নাগাদ অনাথ বাড়ি ফিরলো। বলাই এখন আর জেগে নেই। থাকলে এখন অনাথ পাম্প চালাতো। চাষীরা যারা জল নিতে এসেছিল তারা নিশ্চয় পুকুরের দিককার বারান্দায় ঘুমোচ্ছে। দেরিতে ফিরে অনাথ নিজেই কথার খেলাপ করেছে।

বাঘা এখন তার সঙ্গী। বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখলো বারান্দায় বিড়ির আগুন জ্বলছে। তবে কি চাষীদের কেউ কেউ এখনো জেগে বসে আছে তার অপেক্ষায়। বাঘা ডেকে উঠতেই এক চড় কষালো অনাথ, থাম বলছি। শান্তা, টুকু, লিলি ঘুমোচ্ছে। এ ডাকে নিশ্চয় জেগে উঠবে।

আজকাল অনাথের ফেরার কোন ঠিক নেই। রাস্তা থেকেই কাদা পায়ে এসে বারান্দায় বসে। সেখানেই বসে জামা খোলে। জল খায়। কথাবার্তা বলে। মনে মনে সব সময় একটা অঙ্কই কষে। বিঘায় গড়ে পনের মণ করে ফলাতে পারলে এক চাষেই দেনা শোধ। ব্যাঙ্ক খুশী। জমি-মালিকরা খুশী। খুশী চাষীরাও। উপরন্তু বাড়তি ধানের টাকায় চাই কি একটা পাওয়ার টিলারও কিনে ফেলা যেতে পারে। তাহলে হালের গরুর সমস্যা অনেকটা মেটে। এখন অনাথের মনে হয়—সারা ঈশ্বরীতলাই তার সংসার।

পুঁটে নস্কর একদিন বলেছিল, আপনি অনাথবাবু গতজন্মে এদেশেই ছিলেন। অল্পবয়সে মরে গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন। জন্মান্তরের টান না থাকলে সবার সঙ্গে অ্যাতো ওঠাবসা করতে পারেন!

এখন কে জেগে থাকতে পারে? একদম বারান্দার কাছাকাছি এসে অনাথ বলল, কে জেগে আছো?

আমি বিরজা।

কে?

আমি বিরজা দত্ত।

অনাথের একদম মনে পড়লো না। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার মুখে টর্চ ফেলে চমকে গেল, এ কি চেহারা হয়েছে আপনার ডাক্তারবাবু?

আর বলেন কেন! বেঁচে আছি এই ঢের।

শান্তা জানে আপনি এসেছেন?

না। ডাকিনি আর। আপনার চাষীরা বললে, এখন তো বাস নেই, থেকে যান। বাবু ঠিক ফিরবে।

বেশ করেছেন। কিছু খাবেন তো?

এত রাতে আর না। অম্বল হয়ে যাবে। একটা দরকারে এসেছি অনাথবাবু। আপনি হয়তো পারতে পারেন।

এমন কি দরকার পড়লো যে জন্যে এত রাতে আসতে হয়েছে! বসুন। জামাকাপড় ছেড়ে আসি।

খানিক পরে ডাক্তার বিরজা দত্ত যা বলল তা হল, মেয়ের শ্বশুরবাড়ির গিয়ে স্ত্রী সেখানেই গত হয়েছেন। চাকরিবাকরির আর দরকার নেই বলে তিনি বনগাঁয় গিয়ে এক জ্ঞাতি ভাইয়ের বাড়ি ছিলেন এতদিন। সেখানে একঘেয়ে লাগছিল বলে দু'দিন হল রাসবাড়ির আদালত-হাটের বাড়িতে আসেন। পিওন দু'খানা চিঠি ফেলে গেছে জানলা দিয়ে।

খুলে দেখেন একখানা ১৩৭০ টাকার চেক। এল. আই. সি. পাঠিয়েছে। আত্মঘাতী ছেলের নামে হাজার টাকার ইনসিওর করেছিলেন—ছেলে জন্মাতেই। বোনাসসুদ্ধ ওই জমেছে। টাকাটা অনাথকে নিতে হবে। রাসবাড়ি ফিরে তক তিনি অনাথের ক্রিয়াকর্মের কথা লোকমুখে শুনেছেন। তাই অনাথকে তার বড় বিশ্বাস। যে ছেলে নেই—তার টাকা রেখে কি লাভ! অনাথ তার পছন্দমত কোন ভালো কাজে লাগিয়ে দিক টাকাটা।

প্রস্তাবটা শুনে অনাথ চমকে গেল। বিরজা ডাক্তার এমন কিছু চাকরি করে না। অতগুলো টাকার মায়া কাটালো কি করে? মুখে বলল, খবর না দিয়ে ডুব দিয়েছেন, আপনার চাকরি আছে এখনো?

সে কথায় আসছি অনাথবাবু। ওই টাকার চেকখানা আপনি রাখুন। তারপরে বলছি।

এখন আপনিই রাখুন। পরে ঠিক করব।

বিরজা একটু যেন মিইয়ে গেল, আপনি তাহলে নিচ্ছেন না? তবে আর আমি এতক্ষণ বসে থেকে বকবক করে মরছি কেন?

যা বলছিলেন বলুন না।

আপনার গাই কেমন আছে ?

ভালো।

অফিস যাইনি বলে চাকরিটা গেছে। দু'নম্বর চিঠির খাম খুলে দেখি গ্রাচুইটি, পি. এফ. পেনসনের কাগজপত্তর ঠিক করছে বলে লিখেছে।

গিয়ে বলুন, ঘাট হয়েছে। চাকরিটা ছেড়ে দেবেন না। তাহলে খাবেন কি ?

না অনাথবাবু, তা বলব না। আমি আরেকটা অনুরোধ করব আপনাকে। রাখতেই হবে। আমি ক'দিন থেকে কাগজপত্তর সব রেডি করে আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাব। আপনি দেখাশুনো করে টাকাটা তুলবেন। ভালো কাজে লাগাবেন। এসে চাষীদের কাছে শুনছিলাম, আপনি কি করে এতটা জায়গায় একত্রে চাষ করিয়েছেন। ও টাকার ঝামেলা আপনিই একমাত্র বইতে পারেন।

আপনার চলবে কিসে ?

সে একরকম চলে যাবে। এই ক'মাসে একটা অভিজ্ঞতা হল। একটা পেট চালিয়ে নিতে তেমন কিছু লাগে না। সারা দেশে কত লোকের গাইবলদের অসুখবিসুখ আছে। যেখানেই থাকি—লোকে খোঁজ পেয়ে ডেকে নিয়ে যায়। কেউ চাল দেয়। কেউ দুধ দেয়। কেউ পয়সা। কেউ আলু। দিব্যি চলে যায়। আপনি টাকাটার ভার নিন।

দাঁড়ান। সবে একটা ভাঙা বিয়ে জোড়া দিয়ে এলাম। এখন আমার মাথার অবস্থার ঠিক নেই। আমি বলছিলাম—আপনি বরং আমার এখানেই থেকে যান না। চাষীদের গরুবাছুর দেখবেন। অসুখ হলে সারাবেন।

না অনাথবাবু। রাসবাড়ির আদালত হাটের এত কাছাকাছি আমি থাকতে পারবো না। এখানকার অনেক গরু, অনেক মানুষকে আমি চিনি। এখানে আমার মন টিকবে না। ফিরে ফিরে অনেক কথাই মনে পড়বে।

সকাল হয়ে যাবে খানিকক্ষণের ভেতর। হরিতকি গাছটায় পাখিরা উসখুস করছে। অরুণ বরুণ একবার ডাকলো বোধ হয়।

তাহলে আপনি যাবেন কোথায় ?

যে কোন একটা ট্রেন ধরে কলকাতা। যাবার আগে আপনাকে সব অথরিটি দিয়ে যাবো। আমার তো আর টাকার কোন দরকার নেই।

অসুখ করলে আপনার দেখাশুনো করবে কে ? বয়স তো বসে থাকবে না।

মানুষ মানুষকে দেখে। ও নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। কেউ তো আর হাজার বছরের আয়ু নিয়ে এখানে আসিনি।

ও কি! উঠছেন? চা খেয়ে যাবেন না?

থাক। আমি ভোররাতের বাতাসে ঘুরতে ভালবাসি। হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে যাবো। তারপর ফার্স্ট ট্রেনে কলকাতা।

অনাথের আর ঘরে ঢোকা হল না। এখন ভেতরে ঢুকলে সবাই জেগে উঠবে। তার চেয়ে বারান্দায় বসে থাকাই ভালো। চাষীরা আলো ফোটার আগেই এসে হাজির হতে থাকবে। যে যার জায়গায় নিড়েন দেবে। ঘাঁটা-ঘাঁটি শুরু করবে। বাজিকরের এক কথায় সে নতুন এক পরীক্ষায় মেতে উঠেছে। অন্যের জমি। অন্যের গতর। অন্যের টাকা। মাথাটি তার নিজের। বুদ্ধি তার নিজের। সব মিলিয়ে এক খণ্ডে প্রায় তিনশো বিঘের চাষ। অন্ততঃ একশো মাইলের ভেতর এরকম চাষ এদেশে আগে কখনো বছরের এ সময়টায় করেনি। দূর দূর থেকে লোকে দেখতে আসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। ধানের বিয়েনকাঠি গোনে। কেউ বলে পাশকাঠি। হাত দিয়ে ধানের গোছ দেখে দূর গাঁয়ের চাষী 'বাঃ!' বলে স্পষ্ট তারিফ দেয়। অনাথ নিজেও গুনে দেখেছে। কোথাও কোথাও একগোছে আশিটা পযন্ত বিয়েন ছেড়েছে। এর সব ক'টিতেই ধান হবে না, কিন্তু সিকি ভাগেও ধান ধরলে ছয়লাপ কাণ্ড হবে।

একই রাতে অনাথ ভদ্রেশ্বরের বোনের ভাঙা বিয়ে জোড়া লাগিয়ে এখন বিরজা ডাক্তারের ধরিয়ে দেওয়া দু'খানি লেফাফা হাতে নিয়ে বসে আছে।

আকাশ ফিকে হয়ে ফরসা হচ্ছিল। অনাথ নিজের ভেতর থরথর করে কেঁপে উঠলো। এ আমি কি করছি? সত্যি-সত্যিই কি এত কাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার দরকার ছিল। নতুন কিছু বানিয়ে তার ভেতরে জগৎ-সংসারের প্রাণ-স্পর্শ পাওয়ার মানে কি এই? জমির পরচা, ব্যাঙ্কের বন্ধকী দলিল, সুদ, সারের পড়তা—কত কি এখন তাকে মনে রাখতে হচ্ছে। এর চেয়ে বিন্ধেশ্বরীর বাওড়ের তীরে বটতলায় বসে ভোর ভোর সূর্য ওঠার সাক্ষী হওয়া কি অনেক মধুর, অনেক গাঢ় ছিল না! জীবনের একটা জায়গায় এসে পেছনে তাকাতে যেমন ভালো লাগে—আবার তাকিয়ে ভয়ও ধরে যায় মনে।

অফিস থেকে একটা ট্রেন আগে এসে অনাথ কোন কাজই করতে পারলো'

না। চোখে ঘুম জড়িয়ে এসে তাকে কাবু করে ফেলল। লিলি এখানকার স্কুল থেকে ফিরবে একা একা রাস্তার দু'ধারের গাছপালার সঙ্গে কথা বলতে বলতে। হাতে লাঠি থাকলে গাছেদের মেরে বলবে, ব্যথা লাগলো? টুকু সীতাকুণ্ডুর স্কুল থেকে ফেরে ট্রেনে।

অনাথ অবেলায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লো। তার ঘুমের ভেতর আগেকার কয়লার ইঞ্জিন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাঁশী দিয়ে একটা লোক্যাল ট্রেনসুদ্ধ প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো। পেছনের একখানা কামরা থেকে বাবা নামলেন। হাতে দড়িবাঁধা ছাতা। নেবেই তাকে ডাকলেন, খোকা! খোকা। এই আমের বোঝাটা ধর্ তো।

অনাথ নিজের বারো বছরের চেহারাটা অনেক কাল পরে দেখতে পেল।

ছুটে আয়। ট্রেন ছেড়ে দেবে।

হাফপ্যাণ্টের বাইরে অনাথের লম্বা লম্বা পা বেরিয়ে। বৃষ্টিতেই ভিজতে ভিজতে গিয়ে আমের ঝুড়িটা টেনে নামালো। •

বৃষ্টি ভেজা বাঁশী দিয়ে ট্রেনটা বেরিয়ে গেল।

খাঁটি বেনারসী ল্যাংড়া। রিকশা ডাক্। আমি পাহারা দিচ্ছি।

বারো বছরের অনাথ যে রিকশাটাই ডাকতে যায় সেটাই ভাড়া হয়ে যায়। আস্তে আস্তে স্ট্যাণ্ড ফাঁকা হয়ে গেল। সে একা বৃষ্টিতে ভিজছে।

এখানে এসে তার ঘুম আপনাআপনি ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে দেখলো, তখনো সন্ধ্যে হয়নি। এখনো কানে লেগে আছে ইঞ্জিনের বৃষ্টি-ভেজা বাঁশীর আওয়াজ। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটায় সে বাঁশী থেঁতলে যাচ্ছে। ট্রেন বাতাসের উলটো দিকে ছুটতে ছুটতে হুইসেল দিচ্ছে। সে-আওয়াজকে বাতাস ঢেউ করে পেছনে ছড়িয়ে দিলো। তার সঙ্গে ইঞ্জিনের মাথা থেকে নীলচে ধোঁয়া বৃষ্টির পরোয়া না করেই আকাশে লম্বা সুতোর ছিপ ফেলেছে।

কতকাল পরের ছবি আজ ঘুমের ভেতর উঠে এল। বাবা অনেকদিন নেই। মা নেই। মাথার ওপর লোক না থাকলে বড় ফাঁকা লাগে।

আকাশে এখন লালচে মেঘ। অন্ধকার হয়ে এলেও সারা বাড়িতে আলো জ্বালায়নি কেউ। বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখলো—সে একাই বাড়িতে আছে। শান্তা টুকু আর লিলিকে নিয়ে কোম্পানির বাঁধের একদম শেষ মাথায়। পেছন পেছন বাঘা। অসময়ে বাড়ি ফিরে অনাথ ঘুমুচ্ছে দেখে শান্তা মেয়েদের নিয়ে বেরিয়েছে। পাছে কোন গোলমালে অনাথের ঘুম ভেঙে যায়।

বিকেলের বাতাসে তেজী ধানচারার গোছগুলো হেলে গিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছিল।

মাঠের প্রায় মাঝখান থেকে মদন ছুটতে ছুটতে এলো। হাতে যেন কি। সন্ধ্যার আগের নির্জন নিস্তব্ধ মাঠ। দূরে দূরে এক এক দাগে দু'জন তিনজন চাষী উবু হয়ে জল দেখছে। কেউ বা দেখছে গর্ভ-থোড় এলো কিনা। কোন শব্দ নেই। শুধু কালোর দিক ঘেঁষা ঘন সবুজ ধানচারার চাল। বাতাসে কোন তাপ নেই। তার ভেতর দিয়ে বাঘে পাওয়া মদন খালি পায়ে ছুটতে ছুটতে অনাথের সামনে এসে মাটিতে বসে পড়ল। তখনো হাঁপাচ্ছিল। হাত উঁচু করে কোন রকমে বলল, বাবু পোকা!

অনাথ নেমে এসে হাতে নিল। ক্রিমি ক্রিমি দেখতে ঢেউখেলানো একটা খোলোস। আগাগোড়া মাংসের।

কি পোকা রে?

ধানের যম বাবু। মাঠ ফাঁক করে দিয়ে চলে যাবে। মাজরা।

অনাথ মেঝেতে পোকাটাকে ফেলে গোড়ালি দিয়ে ডলে ফেললো।

চাষীরা সবাই চলে গেছে। শান্তাও মেয়েদের নিয়ে ফেরেনি। ঠিক এই সময় একখানা জিপ এসে কোম্পানি বাঁধে দাঁড়ালো। তার সারা গায়ে পোস্টার। ড্রাইভারের পাশ থেকে দক্ষিণা চক্কোত্তি নেমেই বলল, এই তো অনাথবন্ধু, চাষ তো ভালই দেখছি—

নাঃ, এখনো কিছু বলা যায় না। বলতে বলত অনাথ দেখলো, জিপের পেছন থেকে সন্তোষ টাকি নামছে।

জামিন দিয়েছে ওকে?

ছাড়িয়ে আনতে হল।

আমাদের ভদ্রেশ্বরকে ছাড়বে?

সে তো বলতে পারবো না।

হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে জমির কাছাকাছি এল। দক্ষিণা চক্কোত্তি, জনতার প্রার্থী। এ স্লোগান শুনতে শুনতে ঈশ্বরীতলার লোকের কান পচে গেছে। ভোট দু-দুবার পিছিয়ে যাওয়ায় এ স্লোগান যে আরও কতকাল শুনতে হবে!

দক্ষিণা তাকে কখনো আপনি কখনো তুমি বলে কথা বলে। এখন বলল, তোমার এই চাষের পেছনে মতলবটা কি অনাথবন্ধু? খুলে বল আমায়—

কোন মতলব নেই।

হা হা করে হাসলো দক্ষিণা। তার সঙ্গে যোগান দিতে গিয়ে সন্তোষ টাকি

আরও বিটকেল করে হাসলো। দক্ষিণা বলল, আহা, অত তাড়াতাড়ি আমি কোন জবাব চাইনি। দু-চারদিন ভেবে তবে জানিও।

ভাবাভাবির কিছু নেই। এতটা জায়গা পড়ে থাকে। সবাই মিলে কোন কাজ করা যায় কিনা তাই দেখছি।

এই তো! পথে এসো। সবাই মিলে!

কি ব্যাপার? এতে এত রহস্য দেখছেন কোথায়?

বুঝি ভাই—সব বুঝি।

না। এ আপনার বোঝার কথা নয়। আমি চাষী নই। আমার তেমন কোন জমি নেই যে জোতদার হয়ে যাবো রাতারাতি। টাকাপয়সাও নেই।

সেজন্যেই তো বলছি। ঠিক পথ বেছে নিয়েছো।

কিসের ইঙ্গিত করছেন জানি না। আমি যেটুকু জানি—একসঙ্গে চাষে নেমে এই অল্প ক'দিনে ঈশ্বরীতলাকে আমি অনেকখানি জানতে পেরেছি। সব মানুষই সুন্দর। দেখতে জানা চাই। সেরকম চোখ থাকা চাই।

এইভাবেই তো লোকে জানে আস্তে আস্তে। তারপর পুরো কন্সটিটুয়েন্সি জানতে পারবে।

ওঃ, বুঝেছি আপনি কি বলতে চাইছেন! না দক্ষিণাবাবু—আপনি ভুল করেছেন। আমি ভোটে দাঁড়াবার লোক নই।

না চাইলেও লোকে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেবে। তখন কি করবে?

দাঁড়াবো না। ও রাস্তা আমার নয়।

তাই বা বলি কি করে অনাথ? তুমি কি আমারই চাষীদের আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছো না? এই সন্তোষ, বল্ না—

সন্তোষ এগিয়ে এসে বলল, চরের সবজি চাষীদের আপনি ডাকেননি?

সবাইকে ডেকেছি। যে খাটবে সে ধানের ভাগ পাবে। গতর দিয়ে ধান নিয়ে যাও।

তাতে আপনার লাভ কি বাবু?

আমার কোন লাভই নেই। শুধু বেগার খাটুনি।

ভালো অনাথবন্ধু ভালো। আমি ভুল বলিনি। পথ তুমি ঠিকই বেছে নিয়েছো। সবাই জানবে তুমি নিঃস্বার্থ হয়ে দেশের মানুষের জন্যে খাটছো। এই চাষই তোমার সবচেয়ে বড় পাবলিসিটি। লোকে চোখে দেখে যাবে। লোকমুখে শুনবে। আর ভোটে তুমি ড্যাং ড্যাং করে জিতে বেরিয়ে আসবে।

এ কাজ করতে গিয়ে তুমি আমাদের সবার ক্ষতি করছো।

ক্ষতি!

হুঁ, ক্ষতি। আমরা কাজের লোক পাই না। আমার বাড়ির পেছনের জমিটায় মাদা কেটে কুমড়োর দানা বসাবো ভেবেছিলাম। তা লোক কোথায়? সবাই যে তোমার এখানে! দুর্গোৎসব শুরু হয়ে গেছে এ মাঠে। পরে কি ওরা আমাদের কথা শুনবে ভেবেছো!

আমাদের বলতে কাদের বোঝাচ্ছেন?

এই আমি তুমি। যারা কিছু সভ্য-ভব্য হয়েছি। ঘরবাড়ি, জমিজমা, চাকরি-বাকরি আছে।

অর্থাৎ আপনি বলছেন—আমরা যারা জুতো পায়ে দিয়ে শেয়ালদা যাই। কলকাতায় চাকরি করি। খবরের কাগজ পড়ি। রেডিও বাজাই। তাই তো?

শুনতে খারাপ লাগলেও তাই। ঠিক ধরেছো। তোমার বুদ্ধির অভাব আছে এ কথা এ চাষ দেখে এখন আর কে বলতে সাহস পাবে?

ঠিক বলেছেন। কিন্তু আপনার একটা ভুল হযে গেছে। এ হিসেব আপনি বুঝবেন না।

তবু শুনি।

আমি চাষী নই। আমি ভোটের লোক নই। কোন দলেও নেই আমি। আমি চাল কিনে খাই। মনে রাখবেন—আমার মত লোকেরাই সংখ্যায় সব চেয়ে বেশী। আমাদের অসুবিধে আমরা কোথাও কখনো একত্র হই না। দেখাসাক্ষাৎ নেই। সবাই আমরা একা একা। তাই আপনারা আমাদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরানোর চান্স পাচ্ছেন।

অনাথ, এ যে দেখছি তুমিই ধমকাচ্ছো! ও সন্তোষ?

হ্যাঁ। বাবু—

দাঁড়ান। আমার সব কথা বলা হয়নি। সব বলতেও পারবো না। বললে বুঝবেন না।

বলে ত্যাখো না!

জানি আপনি ঠাট্টা করছেন দক্ষিণাবাবু। আমি জীবনে কোনদিন এভাবে চাষ করিনি।

এ কি বলছো অনাথ! এত বড় একটা চাষ চালু করে দিলে, আর এখন বিনয় করছো! ভালো, ভালো। বিনয় মানুষকে বড় করে। এক চালে তুমি

বাজিমাৎ করেছো অনাথ। যে অঞ্চলেই যাই—চাষীবাসী মানুষজন তোমার চাষের কথা তোলে। তারা তোমার কথা যা সব বলে তা তো আমিই জানি না। অথচ তোমার সবচেয়ে কাছে থাকি আমি। নির্দল দাঁড়াচ্ছো তো? না পার্টি-নমিনেশন পাবে?

আপনি বার বার একই ভুল করছেন। আমি ও লাইনের লোক নই। লোক-মুখে সব বাড়তি কথা শুনে এসেছেন। আমি সত্যিই চাষের কথা কিছু জানি না। চাষীদের কাছ থেকে শিখছি। ওদের সঙ্গ আমার ভালো লাগে। ওরা যদি আমাদের কথা কোনদিন না শোনে—সে দোষ আমাদেরই। ওদের নয়।

তোমাকে তো ভালো উকিল ধরেছে ওরা। এর পরেও বলবে—তুমি এই ইলেকশনে ওদের ক্যাণ্ডিডেট নয়?

না। ওদের কোন পার্টি নেই। ওরা মানুষকে বিশ্বাস করতে ভালোবাসে। কারও বাড়ি গেলে এক গ্লাস জল আর বাতাসা দেয়। ওদের মনে ধরবার মত করে বলতে পারলে ওরা যে কোন কাজে এগিয়ে আসবে।

তুমি তো গাঁয়ে গাঁয়ে চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছো!

সে তো ব্যাঙ্কের মারজিন মানি। এ সব কাজ তো আমার করার কথা ছিল না। আপনি তো জনতার প্রার্থী, দক্ষিণা চক্কোত্তি। আমি তো বাইরের লোক। এ জায়গায় আপনি জন্মেছেন, আপনারই তো করার কথা এসব।

তাই তো অবাক্ হচ্ছি। তুমি করছো কেন? কোন লাভ নেই যখন? শুধুই বেগার খাটুনি?

ধানচারা রোজ বড় হচ্ছে। তার শব্দ শুনতে পাই। যারা হাল দিলো, রুয়ে দিলো—ওদের ঘামে ভেজা মুখের হাসিতে আমি মেঘ, বাতাস, জ্যোৎস্নার জলছাপ দেখতে পাই।

আজকাল খালি চোখে বাতাসও দেখতে পাচ্ছো? বাঃ! শুনে খুব খুশী হলাম। তোমার অনেক উন্নতি হয়েছে দেখছি। তা রোজ কতখানি করে তাড়ি খাও ওদের সঙ্গে বসে বসে?

এক ঝাঁপার মত। কেন?

লোকে এ কথাও বলাবলি করে কিনা!

কারা? আপনার লোক মানে যারা জুতো পায়ে দিয়ে কলকাতায় চাকরি করতে যায় তো? আপনার কথা অনুযায়ী ওরা তো আমায় ভোট দিচ্ছে না, কি বলেন?

দক্ষিণা চক্কোত্তি কোন জবাব দিল না। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। কালো-পেড়ে ধুতি। কোঁচায় ধুলো ভরতি। হাড়-হাড় চেহারায় ফাইন আদ্দির পাঞ্জাবিটা এঁটে বসেছে। খাভাই কোম্পানি বাঁধ ঠেলে উঠতে গিয়ে ঘাড়ের দুটো মোটা রগ্ ফুলে উঠলো দক্ষিণার। আলো থাকলে দেখা যেত, মাথা-ভরতি কাঁচাপাকা চুল।

এরকম কড়া কথা বলার ধাত নয় অনাথের। জিপখানা ব্যাক করে হুস করে চলে যেতেই দক্ষিণার জন্যে কষ্ট হল। মানুষটা প্রায় তার বাপের বয়সী। অতগুলো কথা দক্ষিণার মুখের ওপর ঠাস ঠাস করে না বললেই চলতো। আসলে মানুষটা তাকে বলতে বাধ্য করলো।

অবেলায় ঘুমিয়ে এমননিতেই মনটা কেমন ভারী হয়ে ছিল। ঘুমের ভেতরে বৃষ্টিভেজা কয়লার ইঞ্জিন থেকে নীলচে ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছিল। তার সঙ্গে হুইসেলের টানা চাপা আওয়াজ। এই খানিক আগে ঘুম থেকে উঠে অনাথ বিকেল ঘনিয়ে আসা মাঠ দেখতে পেয়েছে। তার ভেতরে একমাত্র হরিতকি গাছটাই ডালপালা নিয়ে সন্ধ্যের বাতাসে দুলে যাচ্ছিল। নীচে চাক বেঁধে ধানচারার গোছ ঘন কালো হয়ে থেমে ছিল।

শান্তা এখনো ফিরছে না কেন? সন্ধ্যেবেলা কোম্পানি বাঁধে অনেক সময় সাপ বেরোয়। টুকু যা অসাবধানী। কোথায় পা দিতে কোথায় দেয়। বলাই কোথায় গেল? বাঘা—বাঘা—

কোন সাড়া নেই। আবার পাড়া বেড়াতে গেছে।

সাড়া দিল উমা। প্রথমে কান লটপট করে। তারপর খুব গম্ভীর গলায় বলল, হাম্বা—আ—

অনাথ শুনতে পেল, অত খেটো না। শরীর খারাপ হয়ে যাবে—

অনাথ বলল, হা-ম-বা—

উমা শুনলো, ধন্যবাদ।

কালো অন্ধকারের ভেতর উমার সাদা ফুটফুটে বাছুরটা একেবারে যেন কুঁদে রাখা হয়েছে। ঝমমক করছে।

বলাই তুলে আনেনি বলে অরুণ বরুণ পুকুরপাড়ে উঠে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। অনাথকে দেখে তারা বিউগিল বাজিয়ে দিল।

অনাথ বললো, আয়। দরজা খুলে রেখেছি।

ওরা দু'জনে দুলে দুলে এসে ঘরে ঢুকে পড়লো। গুরা গরম সহ্য করতে

পারে না বলে ও একাই আজকাল বাড়ির সামনের মাঠটুকুতে রাতে শুয়ে থাকে। সেখানটায় ডালা-ভরতি কাঁঠালপাতা। তাতে কয়েকটা জোনাকি এসে বসলো। দেখাদেখি আরো কয়েকটা এলো। তারপর অনেকগুলো। অন্ধকার উঠোনটায় এখন এক ডালা আলোর কুচি। বুড়ী শুক্লা উঠে দাঁড়িয়ে সাহস করে মুখ দিতে পারছে না।

অনাথও ফিরে বাড়ির ভেতর যেতে পারছে না। একটা আস্ত ফাঁকা বাড়ি ঠিক তার পেছনে ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে। হরিতকি গাছে পাখিরা ফিরে এসে সবে চুপ করেছে। পায়ের সামনে এক ডালা আলোর কুচি। শুক্লা বুড়ী এগোবে কি পেছোবে বুঝতে পারছে না। অনাথ যত জোরে পারে চেঁচিয়ে উঠলো, শান্তা—আ—আ।

সে আর পারছিল না। এত একা অনাথ থাকতে পারে না। এই নির্জনতার একটা ওজন আছে। তার নীচে অনাথ চাপা পড়ে যাচ্ছিল। আবার ডাকলো, শা—ন—তা—আ—

ও কি। অমন চেঁচাচ্ছো কেন?

সেই কখোন বেরিয়েছো। ফেরার নাম নেই—

তাই বলে চেঁচাবে? যদি অন্য জায়গায় থাকতাম! চেঁচিয়ে শোনাতে পারতে?

অনাথ কোন কথা বলতে পারছিল না।

টুকু আর লিলিও অবাক হয়ে গেছে তাদের বাবার এই কাণ্ডে। তারা একদম বারান্দায় উঠে তবে সুইচ টিপলো।

শান্তার পিছু পিছু ঘরে ঢুকে অনাথ বলল, আজকাল সন্ধ্যে দাও না বুঝি?

এখন দেবো। কি হয়েছে বল তো তোমার?

কিচ্ছু না। বলাই কোথায়?

বাজারে পাঠিয়েছি। এই সময় মেয়েরা টাটকা মাছ ধরে এনে কচুপাতা পেতে বেচতে বসে।

॥ বারো ॥

দক্ষিণা যেদিন অনাথের চাষবাসের খবর নিতে এসে সন্ধ্যে-সন্ধ্যে কিছু কাঠ কাঠ কথা শুনে চলে গেল—সেদিন মাঝরাত পেরিয়ে বাঘা কোম্পানি বাঁধ দিয়ে

একা একা ফিরে এল। অন্ধকারে টর্চ ফেললে যে-কেউ দেখতে পেত—বাঘার মুখখানা গম্ভীর। চোখের সাদা জায়গা ঘোলাটে। লেজ ছ'পায়ের ফাঁকে বারে বারে জড়িয়ে যাচ্ছে।

ভোরবেলা বাঘাকে দেখে অনাথ একচোট বকাবকি করলো। বাঘা বারান্দার কোণে গুটি পাকিয়ে শুয়ে ছিল। একবার শুধু মুখ তুলে তাকিয়ে আবার মাথা নামিয়ে নিল।

ভোর ভোর অনাথকে জমিতে নামতে হয় রোজ। আলে আলে ঘুরে জল দেখে। পাতা হলদে রোগ হল কিনা তাও দেখে রোজ। পাতা পচা, পাতা ধসা রোগও তো আছে। আজও দেখছিল। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি থেকে অনেকটা চলে এসেছে। দূর থেকে দেখলো, শাস্তা বড দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। হাতে যেন কি।

অনাথ জানে কি। শাস্তা এখন তাকে বাডিতে পাতা দই খাইয়ে দেয় অনেকটা। কারণ আর থানিক পরেই সে তাডির ঝাঁপা নিয়ে বসবে। তার আগে দই পেটে পডলে নাকি পাকস্থলী জখম হবার ভয় থাকে না কোন।

দই খেতে যাবার আগে অনাথ সন্দেহবশে এক জাযগায় মোটা ধানগোছের ভেতর থেকে মাঝের কয়েকটি পাতা গোডাসুদ্ধ টানলো। টানতেই দিব্যি উঠে এল।

সেগুলো হাতে নিয়ে বারান্দায় ফিরে আসতে আসতে তার খচ করে মনে পড়লো, মাঝের পাতা তো এত সহজে উঠে আসে না। বেশ জোর লাগে তুলতে। অনেক সময় গোছ উপডে তবে তুলতে হয়।

অনাথ সাবধানে আলে পা ফেলে ফেলে বারান্দায় চলে এল। ভালো ঘুমিয়ে শাস্তার মুখখানা পুরু। ভেতর থেকে নন্দবাবুর গলা পাওয়া যাচ্ছে। লিলি বোধ হয় মার খেয়ে কাঁদছে। টুকুর আজকাল টিকিও দেখতে পায় না অনাথ। স্কুল পালটাবার পর মেয়েটার যে কি হল।

দই খেয়ে খানিক চুপচাপ বসে থাকলো অনাথ। বারান্দায় চা নিয়ে এসে বসলো শাস্তা। বাড়িতে সবার আগে ওঠে অনাথ। তখন শাস্তা ঘুমের ভেতর-কার স্বপ্নে সাঁতার কাটে। সেই সময় উঠে এসে বাডির বাইরে বাঘার সঙ্গে রোজ তার প্রথম দেখা হয়।

এই বাঘা—বাঘা—

মাথা তুলে তাকালো বাঘা। তারপর আবার মাথাটা পায়ের ভাঁজে গুঁজে

দিল। শান্তা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বলল, কি সেই সকাল থেকে ঘুমোচ্ছে! কাল রাতে একবারও ডাকেনি!

অনাথ বলল, কখন যে ফিরেছে কাল রাতে জানিই না। ভয়ংকর পাড়া-বেড়ানি হয়েছে।

চায়ের কাপ হাতে শান্তা ভেতরে চলে গেল। শান্তা উমার গোবর কাড়াচ্ছিল। বালতি বোঝাই দিয়ে বকফুল গাছের গোড়ায় স্তূপ দিল।

অনাথ অভ্যেসমত ভাল করে ছেঁকে চার গ্লাস ঢক ঢক করে ভেতরে পাঠিয়ে দিল। তারপর ধানের ছিঁড়ে আনা মাঝের পাতাগুলো নিয়ে পড়ল। নখ দিয়ে ভালো করে চিরে ফেলে তো অনাথের সামান্য ভালো লাগাটুকুও কেটে গেল। যে-পাতাই চিরে ফেলে—তার ভেতরেই সেই একই পোকা। মাংসল ঢেউ-তোলা ক্রিমি। শেষের একটা গর্ভথোড় পড়ে ছিল। সেটাও চিরে ফেললো নখে। সেখানেও রসস্থ থোড়ের ভেতর একই ঢেউ-তোলা ক্রিমি। মাজরা পোকা।

অনাথ ঝাঁপার মুখে ন্যাকড়া ভালো করে বেঁধে ছোট কলসীটা উঁচু করে ধরলো। তারপর নিজের মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দিয়ে হাঁ করল। এক দমে ঝাঁপা ফাঁকা করে তবে কলসীটা ঠক করে মেঝেতে রাখলো।

একটু একটু করে মাথাটা এবার পাথর হচ্ছে। নীচের পাটির মাড়িতে এক সেকেণ্ডে আগুন লেগে গেল। চিবুকের বাঁ দিকে ঠোঁটের নীচে খিচুনি এবার ধরবে। ঠিক এই অবস্থায় অনাথ এসে মাঠের সামনে দাঁড়ালো। নেশা তখন তার শরীরের দখল নিতে গিয়ে বার বার মার খেয়ে ফিরে যাচ্ছে।

ভোরবেলাকার মাঠ। ধানচারার ঘন সবুজ চওড়া পাতায় রোদ পিছলে পড়ছে। অনাথ লক-লক চওড়া পাতার দিকে তাকিয়ে বুঝলো, তার মৃত্যুবাণ এখন সারা মাঠে ছড়িয়ে আছে। যে মাঠ দেখে দূর দূর গাঁয়ের চাষীরা তাকে তারিফ দিচ্ছে, দক্ষিণা যা দেখে ভেবেছে—এটা তার ভোটে দাঁড়াবার ফিকির—সে মাঠ ফোঁপরা করে দিতে ক্রিমিরা অনেকদিন হল কাজে নেমে পড়েছে। কেউ টের পায়নি।

আল ধরে দুলতে দুলতে এগোতে লাগল অনাথ। মোটা গোছের যেখানেই হাত দেয়—সেখান থেকে শ্বেত প্রজাপতির দল উড়ে যায়। অনাথ এখন জানে, এদের ভেতর যাদের বাঁ পাখনায় একটা করে কালো ফুটকি আছে তারাই মাদী। তারাই এই ক্রিমিদের জননী। ধানের শিষ বেরোনোর থোড়টুকু এই ক্রিমিরা চুষে খেয়ে ফেলে। তারপর যা বেরোয় তা হল মরা শীষ—চিটে।

শেষমেষ পড়ে থাকে শুধু খড়।

অনাথ কয়েক জায়গায় থাবা মেরে দেখলো। সেই একই প্রজাপতি উড়ে উড়ে গাছ পালটালো। অনাথের মাথাটা টলছিল। তার ভেতরেই সে বুঝতে পারলো, এই সুন্দর চেহারার মাঠখানা আসলে পোকায় কাটা। থোড খোর ক্রিমিতে বোঝাই।

এরকম টলতে টলতেই অনাথ এক দাগের আল থেকে আরেক দাগে যাচ্ছিল। যাত্রিকপোতার কালো মোড়ল পরিশ্রমী চাষী। ভাগেই চাষ করে। এ সময় জমি পেয়ে খুব খুশী। যত্ন করে ধানগোছের গোড়া ঘেঁটে দিচ্ছিল। অনাথকে অমন দুলতে দুলতে যেতে দেখে হা-হা করে হেসে উঠলো, ও অনাথদা। তোমার হোলোটা কি?

অনাথ দূর থেকে কালো মোড়লের হাসি দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু কথা শুনতে পেল না। অনাথ টের পেল, নেশা তাকে কাবু করতে না পেরে এবারে ফিরে যাবে। সারা মাঠের একটা ম্যাপ করতে হয়েছে। নম্বর দিতে হয়েছে। বারান্দায় বসে এখন নম্বর বলে বলে অনাথ সার, বিষ, জল কন্ট্রোল করতে পারে।

সে ঈশ্বর জানে না। শুনেছে সেরকম একজন আছেন তাঁর সঙ্গে অনাথের কোন ঝগড়া নেই। লড়াই নেই। তর্ক নেই। এমন কি তাঁর বদলি অন্য কোন জিনিসও সে খাড়া করতে পারবে না। তবু অনাথ এখন সরাসরি নীল রঙের থালার সাইজের আকাশখানার দিকে তাকিয়ে মাথাটা উঁচু করে ধরলো। ভেতরকার ঢিলেঢালা চিন্তাগুলো টান টান করে মনের মধ্যে বাঁধতে বাঁধতে অনাথ নিজেকেই বলল, আমি তো ভূগোল জানি না। ইতিহাস জানি না। যেমন জানি না ভগবানকে।

আমি জানি বিকেলবেলার আকাশের শান্ত। বাতাসে একা একা একটি গাছকে আমি দুলতে দেখলে সুন্দর ভাবি। কোম্পানি বাঁধের গায়ে খালটা খানিক গিয়ে ট্রেন লাইনকে পথ ছেড়ে দিয়ে বাঁয়ে বেঁকেছে। সেখানকার মাটিও বাঁধের ধারায় উঁচু। সেই উঁচু বাঁধে অনাথের সামনে এই মাত্র একটা ছবি ফুটে উঠলো। যার ছবি তাকে সে যে ভীষণ ভাবে খুঁজছিল। শুধু নামটাই মনে পড়েনি তার। কিন্তু চেহারার আভাস এই পাথরভারি মাথার ভেতরেই এতক্ষণ একটু একটু করে ফুটে উঠছিল।

অনাথ তাকে দেখেই দৌড়ে তার সঙ্গে চলে যাবে ভাবছিল। কিন্তু পা ফেলে বুঝলো পারবে না। পুরো এক ঝাঁপা তাড়ি এখন তার পেটের ভেতর

চলকাচ্ছে।

বাতাসে চাপদাড়ি গায়ের আলখাল্লার সঙ্গে উড়ছে। মাথার কাঁচাপাকা চুলের ঢাল বাঁ হাতে একপাশে সরিয়ে দিয়ে হেঁটে আসছে। মহম্মদ বাজিকরও তাকে দেখতে পেয়েছে।

অনাথ চেঁচিয়ে বলল, বারান্দায় আসুন।

দু'জনে মাদুরে মুখোমুখি বসে প্রথম যা কথা হল তার বেশির ভাগই আজকের ভোরবেলাকার আকাশের সৌন্দর্য নিয়ে। অনাথ আর অপেক্ষা করতে পারছিল না, বলেই ফেলল।

সব শুনে বাজিকর বলল, তাহলে তো বসে থাকা চলবে না। প্রকৃতি তাঁর নিদান হেঁকে বসে আছে। আগে থেকে সাবধান হননি।

সবাই আমরা মাঠের রূপ দেখে ভুলে বসেছিলাম।

উচিত হয়নি অনাথবাবু। ওরই নাম তো মায়া। মহামায়া ওভাবেই ভুলায়। এখনো নিশ্চয় করার কিছু আছে।

আছে। তবে একদম বন্ধ করা যাবে না। যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে। বাকীটুকু রোখা গেলেও যেতে পারে।

ক্রিমিগুলোরও তো বেঁচে থাকার খাবার চাই। ওদের শরীর থেকেই নতুন প্রজাপতির জন্ম হবে। তা কি করবেন ঠিক করেছেন?

বিষ দেব। মারাত্মক বিষ। সিসটেম পয়জেন। মাঠময় দানা ছড়িয়ে দিলে জল বিষাক্ত হয়ে যাবে। জল থেকে ধানের গোছ সে বিষ শরীরে টেনে নিয়ে যাবে। ধানগাছের গায়ের বিষ শুষে খেয়ে ক্রিমিগুলো যদি সাবাড় হয় তবে আমাদের ভাগ্য।

আরে, আপনার বাঘা তো আমায় দেখে কাছে এলো না। কি হয়েছে ওর?

কিছুই না। শেষ রাতে ফিরে সেই যে বারান্দায় গুটি পাকিয়ে শুয়ে আছে—

আজকাল বটতলায় আমার খোঁজেও যায় না অনেকদিন। আগে তবু খোঁজ-খবর নিত। কি হয়েছে? এই বাঘা—

বাঘা চোখ তুলে তাকাতেই বাজিকর ছুটে তার কাছে গেল। বাঘার মুখখানা ভালো করে দেখলো। তারপর দেখলো তার সামনের দুই থাবা—কতক্ষণ এরকম শুয়ে আছে?

কত রাতে ফিরেছে তা তো ঠিক জানি না। এসে তক এভাবেই শুয়ে

আছে। ডাকলে কোনরকমে মাথা তুলে তাকাচ্ছে শুধু।

আপনার বাঘাকে মুখুণ্ডী করেছে কেউ।

মুখুণ্ডী !

হ্যাঁ। ওকে বাণ মেরে বোবা করে দিয়েছে। আরো কি ক্ষতি করেছে এখনো বুঝতে পারিনি। আপনার কোন শত্রু আছে এদেশে। দেখি ওর মুখুণ্ডী কাটাতে পারি কিনা। বড দেরি হয়ে গেছে। বলতে বলতে বাজিকর কোম্পানি বাঁধে উঠে খালে নেমে গেল। খাল পেরিয়ে একদম ওপারে। ইটখোলার গর্তের গায়ে মাটি হাতড়ে হাতড়ে কি সব লতাপাতা ছিঁড়ে নিয়ে এল। ওদিকটায় কেউ মাডায় না বলে চওড়া পাতার পাতি ঘাসে সবুজ হয়ে আছে। ভিজে আলথাল্লা শুধু বারান্দায় লেপটে বসে বাজিকর কী সব লতাপাতা থেঁতো করে তার রস বাঘার মুখ ফাঁক করে ভেতরে পাঠিয়ে দিল। মুখের ফাঁক দিয়ে খানিক রস গডিয়ে বেরিয়ে এল। বাঘা একবার চোখ তুলে ছোট্ট করে কাশলো শুধু।

নির্ঘাত বাজবরণের আঠা খাইয়ে দিয়েছে।

সর্বনাশ! বলেন কি ?

ঠিকই বলছি অনাথবাবু'

বাঘা মাথা সামান্য তুলে আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে আছে। ঈশ্বরীতলায় ফণীমনসা ধাঁচের গাছ আগানে-বাগানে অঢেল। এখানে ধারণা, বাজ পডলে এ গাছ তা বরণ করে নেয়। বাজবরণ ভাঙলেই সাদা কষ বেরিয়ে আসে। ভীষণ বিষ।

কেন খাওয়াবে ? কে খাওযাতে পারে ?

হিংসে। পিত্ত কফের মত ও জিনিসটিও শরীরে থাকবে মানুষের। একটু লক্ষ্য রাখবেন।

চললেন কোথায় ?

আমার কি বসে থাকার উপায় আছে!

আমিও তো অফিসে বেরোবো। আপনি যে আমায় কিসের ভেতর জড়িয়ে দিলেন—

কেন ? বেশ তো আনন্দে আছেন!

আনন্দ এবারে ধোঁয়া হয়ে যাবে।

বাঃ, ঝুঁকি থাকবে না কোন ? চললাম অনাথবাবু। বাঘা বোধ হয় টিকবে না।

অনাথের মাথা এখন পুরোপুরি পাথর হয়ে গেছে। ভারী। নেশা তার শরীরে খানিক দখল পেয়েছে এতক্ষণে। বাজিকর কোম্পানি বাঁধ দিয়ে পথচলতি দরবেশের মতই চলে যাচ্ছে। তার শেষ কথাটার মানে এতক্ষণে অনাথের মাথায় ঢুকলো। সে বাঘার দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টিতে পড়ার চেষ্টা করলো। পারলো না। বাঘা কোন এক জায়গায় তাকিয়ে নেই। সব জায়গা নিয়ে সে সুদূর চোখে দেখছিল। দেখাটা ক্লান্ত।

বাঘার কাছাকাছি এগোতে না পেরে অনাথ পুকুরে গিয়ে পড়লো, চান করবি না টুকু?

বারান্দা থেকেই টুকু বলল, কখোন বাথরুমে চান করে নিয়েছি।

অনাথের মনে পড়ে গেল, মেয়েটা অনেকদিন তার কাছে আসে না। আগের মত আজকাল আর 'বাবু' বলে ডাকে না। তার বদলে 'বাবা' বলে।

দুপুরবেলা অফিস তাকে অনেকদিন পরে হাতে পেয়ে ভালো মত রগড়ে নিল। অন্ততঃ তিনজনের কাজ। লোক কম বলে অনাথের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল। অনাথ এক এক সময় অবাক্ হয়। তার শরীরে ক্লান্তি নেই কেন? অফিসের কাজ তার কাছে জলভাত লাগে কেন? দেরিতে ঘুমোয়। রাত থাকতে ওঠে। মাথা ধরে না। ঘুম পায় না। ইলেকট্রিক ট্রেনের মেটাল বডি দুপুরে তেতে থাকে। তার ভেতরে বসে সেদ্ধ হতে হতে কলকাতায় আসে। পাখার হাওয়ায় ফ্রেশ হয়ে আবার যে কে সেই। কোন কাজকেই কাজ বলে মনে হয় না আজকাল। ধরে আর শেষ করে ফেলে। দশ মাইল রাস্তা সুন্দর হেঁটে যেতে পারে। সারাদিন না খেয়ে রোদের ভেতর বসে জলের পাম্প সারাতে পারে ঠাণ্ডা মাথায়। হাফ-সেদ্ধ আধ কে জি মাংস তো নিমেষে উধাও করে দিতে পারে প্লেট থেকে। যা খায় তাই হজম। বিছানায় শুলেই ঘুম এসে যায়। রেকর্ড প্লেয়ারে আমির খাঁ চাপিয়ে দিয়ে মেঘ রাগের সঙ্গে বসে বসে দিব্যি তিনশো বিঘার চাপান সার হিসেব করে ফেলে। দীঘিতে ডুব দিয়ে মাটি তুলতে পারে। পা ওপরদিকে পাখনার মত দাপাতে দাপাতে সিধে পুকুরের বুকে ঠাণ্ডা পাঁকে গিয়ে মাথা ঠেকাতে কোন অসুবিধাই হয় না অনাথের। এ কি চাষের গুণ? এ কি তাড়ি খেয়ে নিয়মিত সাঁতারের মহিমা? না অন্য কিছু? সে কি এইভাবেই তৈরী? শরীরটা যেন এখন তার নিজের হাতে চেঁছে নিয়ে তৈরি করা কোদালের হাতল। দিব্যি লাগসই।

বেলা চারটের আগেই কাজের পাহাড় ছাতু করে দিয়ে অনাথ বেরিয়ে

পড়ল। ডালহৌসিতে অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই বিষ কোম্পানিতে গিয়ে সব বলতে তারা ওষুধের নাম, দাম বলে দিল। রাসবাড়ির আদালত-হাটে সব পাওয়া যায়। ডিলার আছে।

সন্ধ্যে-সন্ধ্যে বাড়ি ফিরে অনাথের কাছে সব কালো হয়ে গেল। টুকু সীতাকুণ্ডুর স্কুল থেকে ফিরে বিকেল থেকেই বিছনায় উপুড় হয়ে কাঁদছে। লিলিকে শান্তা কিছু খাওয়াতে পারেনি। ওরা দু'জনই বুঝতে পেরেছে—বাঘা বাঁচবে না।

বাঘা কোথায়?

শান্তা আঙুল দিয়ে পুকুর দেখিয়ে দিল। অনাথ বাইরের আলোটা জ্বেলে পুকুরপাড়ে গেল। বলাই জলে ডোবা একটা সিঁড়িতে প্যান্ট ভিজিয়ে বসে আছে। তার পাশে বাঘা। সে নিঃশব্দে লেজসুদ্ধ পুরো তলপেট জলে ডুবিয়ে দিয়ে হাঁ করে বাতাস টানছে। চোখে ছন্ন ভাব। ইলেকট্রিকের আলোয় বলাই চোখ মুছলো। নিজেই এসে জলে বসেছে। কিছুতে পেটের ভেতর কষ্ট হচ্ছে বাঘার। বুঝিয়ে বলতে পারছে না। একা অনাথ থাকলে বলতো, ঘেউ। অনাথ বুঝে নিত।

কাকে ডাকবে? অনাথ কিছু ঠিক করতে পারলো না। আকাশ অন্ধকার। বাড়ির সামনের লাইট পোস্টটায় আলো ঘিরে গাদা গাদা শ্বেত প্রজাপতি। অনাথ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে পা ব্যথা করে ফেললো। সে নিজে একচল্লিশ ক্রস করেছে। বাঘা লিলির চেয়েও ছোট অনেক ছোট। বছর চারেকের হবে। প্রথম এসে রাত হলে কাঁদতো। দুধও খেতে শেখেনি তখন এত ছোট।

রাতে কারও খাওয়া হল না। শান্তা রান্নাই চাপায়নি। মেয়েদের চেষ্টা করেও চিঁড়ে-দুধ খাওয়াতে পারলো না। জানে বলাই কিছুই খাবে না। বাঘা নিজে নিজেই পুকুরঘাট থেকে উঠে এসে বারান্দায় আবার গুটি পাকিয়ে শুয়ে পড়লো।

আজ আর বাড়িতে কেউ আলো জ্বালালো না। অন্ধকার বাড়িটাকে দেখা যাচ্ছিল রাস্তার লাইটপোস্টের আলোয়। বারান্দায় সে-আলোর একখানা তেকোণা লাফিয়ে পড়ে বিঁধে গেছে। তার খানিকটা আচ্ছন্ন বাঘার গায়ে লেগে গেল।

অনাথ আর শান্তা দু'জনে মিলে একজোড়ে বাঘাকে কোলে তুলে নিতে গেল। বাঘা অন্ধকারে ঘাড় তুলে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখের জায়গায় দু'টি নীলচে মার্বেল ঝলকে গেল। বাঘা আবার মেঝেতে মাথা পেতে দিল।

শান্তার গলা বুজে এলেও অনেক জোর দিয়ে কেশে গলা পরিষ্কার করতে গেল। ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে এল।—আয়। কোলে আয়—

বাঘা প্রমাণ সাইজের এখন: শান্তার সাধ্য কি কোলে নেয়! তার ওপর আজ যেন আরও ভারী হয়ে গেছে। না পেরে শান্তা সরে গিয়ে বসলো।

রাস্তার ওপরের আলোর ডুমটা ঘিরে শ্বেত প্রজাপতিদের জটলা। ওরাই সারা মাঠে কালান্তক ক্রিমি ছেড়ে দিয়ে গেছে গোছে গোছে। তারা এই এখনো মাঝের গর্ভথোড় জুড়ে শুষে নিচ্ছে ধানের প্রাণটুকু। মরা শিষ বেরোচ্ছে। তাতে ফুল ধরলেও দুধ আসবে না। দানা শক্ত হবার প্রশ্নই নেই। স্রেফ চিটে। সোমবার থেকে মাঠে বিষ দিতে হবে।

বাঘাকে তুলে নিয়ে যদি বিছানায় শুইয়ে দেওয়া যেতো! ক্লান্ত নিঃশ্বাস ভারী শব্দ করে উঠছে পড়ছে। মাথা একটু তোলায় এইমাত্র ওর চোখ দুটো নীলচে মার্বেল হয়ে আলো ঠিকরে দিচ্ছিল।

কতদিন যে গভীর রাতে কোম্পানি বাঁধে অনাথ অন্ধকারে বাঘার চোখের এই আলো দেখেছে! সন্ধ্যেরাতে এক চক্কর মেরে ফিরতো বাঘা। কখনো বাজার। কখনো রেলের প্ল্যাটফর্ম। কখনো বা বিন্ধেশ্বরীর বাওড়ের তীর। নয়তো সাদা গির্জার মাঠ।

একটা দিন বেশ পরিষ্কার মনে আছে অনাথের। বাঘা বড়টি হয়ে গেছে। সন্ধ্যের চক্কর মেরে ফিরছিল। ফেরার কায়দাটা হাঁটা-চলা ডেলি প্যাসেঞ্জারদের মত। বাজ ডেকে বৃষ্টি এলো। সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস। অন্ধকার। দোর আটকাবার আগে অনাথ বা—ঘা—আ বলে ডাকলো। যত জোরে পারে। দূরে কোম্পানি বাঁধে দু'টো নীলচে মার্বেল শূন্যে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসতে থাকলো। ঝড়, জল, বিদ্যুৎ, বাতাসে নীলচে মার্বেল দুটোর এগিয়ে আসার দুলকি চাল একটুও পালটালো না। নিরুদ্বিগ্ন। ঝড়জল না, যেন পরিষ্কার আকাশের সকালবেলায় বাঘা বাওড়ের বটতলায় বাজিকরের সঙ্গে দেখা করে ফিরছে। আসলে তখন কিন্তু সারা চরাচর জুড়ে অন্ধকারে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। ঈশ্বরীতলায় ঘরের বাইরে কেউ নেই তখন। শুধু একা বাঘা বাইরে। এমনি ডাকাবুকো। ও অন্ধকার বুঝতো না। ঝড়বৃষ্টি বুঝতো না। সারা শরীর অন্ধকারে ক্ষয় হয়ে গিয়ে নীলচে চোখ দুটো ভেসে থাকতো।

বলাইকে পুকুর থেকে ডাকো তো! অতক্ষণ জলে বসে থেকে জ্বর বাধাবে শেষে—

তুমি ডাকো না।

অনাথ জোরে ডাকলো, ও বলাই ! আয় বাবা আয়—

বলাই কোন জবাব দিল না।

অনাথও চুপ করে গেল।

এক সময় লাস্ট ট্রেন চলে গেল। দুজনেই বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে। মট্ করে আওয়াজ হতেই অনাথের ঝিমুনি কেটে গেল। অবাক্ হয়ে দেখলো, বাঘা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার ফলেই পায়ের হাড়ের শব্দ হয়েছে—মট !

অনাথ চেঁচিয়ে উঠলো। ও শান্তা—শান্তা! ত্যাখো কি কাণ্ড! ও বলাই দেখে যা—বাঘা সেরে উঠেছে। বলতে বলতে অনাথ উঠে দাঁডিয়েছে।

ভিজে প্যাণ্টে বলাই ছুটে এলো। কোথায় ?

শান্তা উঠে দাঁডিয়ে বারান্দার আলোর সুইচ জ্বেলে দিল। সামনে অন্ধকার মাঠ। তার গায়ে ভিজে প্যাণ্টে বলাই। চোখ দুটো লাল। ফুলো-ফুলো।

বাঘা কারো দিকেই তাকালো না। রোজকার মত যেন চক্করে বেরোচ্ছে। দুলকি চালে হেঁটে গিয়ে কোম্পানি বাঁধের লাইটপোস্টের নীচে দাঁড়ালো। সেখান থেকে ওর লম্বা ছায়া পড়েছে। সেই ছায়াতেই ও শুয়ে পড়লো। লম্বা হয়ে। কোনদিকে না তাকিয়ে।

অনাথ, শান্তা, বলাই দৌড়ে কোম্পানি বাঁধে এসে দাঁড়ালো। যে আশায় ওদের তিনখানা মুখ এইমাত্র ঝকঝক করে উঠেছিল তা আবার নিভে গেল।

বাঘা লম্বা হয়ে শুয়েছে। পা ছড়িয়ে। গলা তুলে। চারদিকে ফাঁকা মাঠ। এখানে বসতি বলতে নেই। তার ভেতর বাঘাকে ধরে ওরা চার প্রাণী। কোম্পানি বাঁধে মাত্র এই একটি পোস্টেই ডুম জ্বলে।

অনাথ পাঁজাকোলে বাঘাকে তুলবার চেষ্টা করল। বাঘা অনেক কষ্টে মুখ তুলে অনাথকে দেখে মাথা নামিয়ে নিল। ওকে কোলে তুলতে সাহায্য করার মত শক্তিও বাঘার গায়ে নেই।

বলাই চোখ মুছে বলল, ঘরে চলে এসো তোমরা।

একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছে। বাঘা বাইরে পড়ে থাকবে আর আমরা ঘরে যাবো এখন ?

বলেই চুপ করে থাকলো। বৃষ্টির গুঁড়ো বাতাসে উড়ে এসে বাঘার গায়ে পড়ছিল। সেই সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টির মতই দু'চারটে ক্লান্ত শ্বেত প্রজাপতি আলোর ঝাঁঝ থেকে পিছলে গিয়ে বাঘার মাথায় এসে পড়ছিল।

শান্তা বলল, একটা ছাতা এনে দিই বরং—

বলাই যা কোনদিন করে না—ধমকে উঠলো দু'জনকেই, মাঝখান থেকে ছাতাটাই চুরি যাবে। চলো তো, ঘরে চলো।

কেন রে? আরেকটু থাকি না। ও একা একা থাকবে—

লাভ নেই কোন। বাঘা মারা যাবে। খানিক বাদেই—

শান্তা প্রায় কেঁদে উঠলো, কি করে বুঝলি বলাই?

মরবার আগে কুকুর বেড়াল বাড়ির বাইরে চলে আসে। এ-সময় খোলা আকাশের নিচে এসে শোবে। গেরস্থর ঘরে ওরা কখনো মরবে না।

কলকাতা থেকে ট্রেন এসে এখানে খালি হয়ে যায়। তারপর আরও আট-দশটা স্টেশন পার হয়ে একটা রোগা নদীর গায়ে লাইনের শেষে গাড়ি গিয়ে জিরোয়। ঈশ্বরীতলা থেকে শেষ স্টেশন আরও আধ ঘণ্টা।

এই পথটুকু পার হয়ে এসে বিকাশ আর টুকু শেষ স্টেশনে নামলো। ভোর-বেলার ফাঁকা ট্রেন। বিকাশ বলল, চলো যাই লঞ্চঘাটে। যাবে সুতপা?

কেউ যদি দেখে ফেলে?

তোমার যত ভয়! এখানে কে চিনবে আমাদের?

লঞ্চঘাটটা দেখবার মত। নদীর ভেতর অনেক দূর কাঠের পাটাতন ভাসানো। ঝিনুক বোঝাই দিয়ে নৌকো যাচ্ছে মেদিনীপুর। চুন হবে। পর পর চার-পাঁচখানা লঞ্চের সাজো সাজো ভাব।

চলো না—কোথাও আমরা চলে যাই।

এরই ভেতর এত সাহস পেলে কোত্থেকে সুতপা? আমরা তো ঈশ্বরীতলার প্ল্যাটফর্ম থেকে আলাদা আলাদা ট্রেনে উঠেছি, কত ভয় তোমার—

ভয় অবশ্য যায়নি সুতপার। শাড়ির আঁচলটা দিয়ে ডানদিকের কাঁধ ভালো করে ঢাকলো। ঢেকে মনে হল, সে জবুথবু কাপড়ের পুঁটলি হয়ে গেছে। সামনেই একটা বিশাল অশ্বত্থের ডালপালা রাস্তার দিকে হেলে আছে। নদী এসে মাটি খেয়ে নিয়ে গাছটার শেকড়বাকড় একদম বের করে ফেলেছে।

কাল বিকেলে টুকু কোম্পানি বাঁধের পাড়ে চুপ করে বসেছিল। কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে টের পায়নি। সে-সময় কলেজ-ফেরত বিকাশ তাকে দেখতে পায়। এই সময়টায় বাঘা রোজ তাদের সঙ্গে ঘুরতো। কুকুর নিয়ে খেলা করার বয়স আর তার নেই টুকু জানে। ইদানীং না খেললে বাঘা বরং আশে-

পাশে ঘুরঘুর করতো। আশায় আশায়। যদি খেলা হয়। টুকু জানে—তারও এরকম হয়। এক সময় বাবা রোজ অফিস থেকে ফিরে তার গালে চুমু দিত। আস্তে আস্তে তা বন্ধ হয়ে যেতে টুকুর মনে খুব কষ্ট হয়েছিল। বাবা আজকাল তাকে মাঝে মাঝে 'তুমি' বলে। এটা তো ভালো লক্ষণ নয়। আগেকার 'তুই' কত ভালো ছিল। একদিন তো স্বপ্নই দেখে ফেললো, বাবা অন্য একটা অচেনা মেয়েকে কোলে নিয়ে ঈশ্বরীতলার সংক্রান্তি মেলায় ঘুরছে। অনেক পুতুল কিনে ফেলেছে ধাড়ি মেয়েটার জন্য। টুকুর বুকের মাঝখানটায় কী কষ্টই হচ্ছিল।

বাবার কথা মনে পড়তেই আবার চোখে জল এসে গেল টুকুর। বাঁধ এখন ফাঁকা। বিকাশ বলল, যে গেছে তার জন্যে কাঁদছো কেন? ফিরে তো আসবে না। তার চেয়ে চল যাই—কাল ভোরে আমরা লঞ্চঘাটে ঘুরে আসি। জায়গাটা তোমার খুব ভালো লাগবে স্নতপা।

কোথায়? আমি তো কোনদিন নদী দেখিনি।

রেল লাইন যেখানে শেষ সেখানেই তো নদী। কত নৌকো। পাখি। মাছ।

লিলিকে নিয়ে যাবো কিন্তু।

তাহলে তোমায় একদম পাবো না স্নতপা।

এসব কথার কোন জবাব দিতে পারে না টুকু। শুনলেই তার সারা গা শিরশির করে ওঠে। বিকাশ কত উঁচুতে পড়ে। হায়ার সেকেণ্ডারি পাস। তবু এক এক সময় এত ছেলেমানুষ লাগে। এসব সময় টুকুর মন সব কিছু থেকে সরে গিয়ে হালকা হয়ে ওঠে। সে পরিষ্কার দেখতে পেল—এক ঝাঁক টিয়া ভোরবেলার নদীতে নেমে পাখনায় জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে সবাই মিলে চান করে নিল। তারপর দল বেঁধে সবজিক্ষেতের দিকে ছররার মত ছুটে গেল। একটা আলাদা আনন্দের ছিটে তার গায়েও এসে পড়লো।

লঞ্চঘাটের বাতাসে মিহি জলের গুঁড়ো মিশে ছিল। তাতে দু'জনেরই চোখমুখ সামান্য সামান্য ধুয়ে যাচ্ছিল।—চল স্নতপা, ওপারে যাই। খেয়া নৌকোয়।

না। বেলা হলে ধরা পড়ে যাবো। আমাদের দু'জনকে সবাই চেনে। তোমাকে তো সবাই। তোমার বাবা ভোটে দাঁড়াচ্ছেন। ফিরে যাই চলো।

স্টেশন অব্দি সুন্দর পথটুকু যাতে তাড়াতাড়ি না ফুরোয় সেজন্যে দু'জনেই

খুব আস্তে হাঁটছিল। ট্রেনে উঠে ঠিক করলো, দু'জনে পাশাপাশি বসে খানিক দূর যাবে। তারপর ঈশ্বরীতলার আগেই বিকাশ অন্য কামরায় চলে যাবে। পথে চেনাশুনো কেউ পড়লে টুকু বলবে, সীতাকুণ্ডুতে জিওগ্রাফির টিচারের কাছে গিয়েছিল। বাড়িতে ডেকেছিলেন। কে আর খোঁজ নিতে যাচ্ছে!

ট্রেনে উঠে টুকুর মনে হল—আরেকটু থাকলে হোত। এখন তো ট্রেন ফাঁকা। অফিসের ভিড় নিয়ে তার যত ভয়।

ছুটন্ত ট্রেনের জানলায় বাতাসের ঝাপটা। ফাঁকা কামরা। দু'জনের কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছিল না। বাতাস ঢুকে পড়ে সব শব্দ গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল। এর ভেতর তিনবার টুকু চুল ঠিক করেছে। বিকাশের সামনে তো আর মাথা আঁচড়ানো যায় না। চিরুনিও নেই সঙ্গে। ট্রেন লাইনের পাশে একটা বড় ভেড়ির জল বের করে দিয়ে মাছ ধরা হচ্ছে। দূরে উচ্ছেক্ষেত জলের অভাবে হলুদ।

পরের স্টেশনে ক'জন চালওয়ালা উঠলো। উঠেই কামরার ছাদের ফুটো জায়গায় চালের পুঁটুলিগুলো লুকোতে লাগল। একজনের পায়ের ধুলো এসে ওদের গায়ে লাগতেই বিকাশ উঠে দাঁড়ালো।—কি হচ্ছে? টিকিট নেই, স্মাগালং—তারপর আবার প্যাসেঞ্জারদের গায়ে পায়ের ধুলো লাগাচ্ছো?

বাঁ চোখের নীচে কাটা দাগ ছেলেটা ধীরেসুস্থে নিজের কাজ সারলো। তারপর সিটের ওপর থেকে নেমে এসে প্রায় তালি বাজিয়ে দু'হাতের ধুলো ঝেড়ে নিল।—খুব তো ফুর্তি হচ্ছে ফাঁকা কামরায়। অসুবিধে হোল?

বিকাশ বসেছিল টুকুর পাশে। টুকু জানলায। কামরার বাইরে এত সুন্দর মাঠ। এক একটা গাছ এত সুন্দর। সট্ করে চোখের বাইরে চলে যাচ্ছিল। আহা রে!

আর কামরার ভেতরে? টুকু ভেতরে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেও সাহস পাচ্ছিল না। কিন্তু এবার আর না তাকিয়ে পারলো না। বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেও উঠে দাঁড়ালো

প্রথম ঘুঁষিটা মারলো বিকাশ। চোখের নীচে কাটা দাগ ছেলেটা মাথা সরিয়ে নিয়ে হাসলো। তারপর হাঁ করে মুখের ভেতর জিভটা এক পাক ঘুরিয়ে, নিয়ে ধাঁই করে বিকাশের কানচলে এক চড় কষালো। ঘুঁষিও হতে পারে। বিকাশ ঘুরে দু'সারি সিটের মধ্যে পড়ে গেল।—উঃ, বাবা গো!

ছেলেটা আরো এগিয়ে এল। বিকাশকে শার্ট-সুদ্ধ টেনে তুললো। টুকু হাতে কিছু না পেয়ে ছেলেটার বুকে এলোপাথাড়ি চড়ঘুঁষি চালাতে লাগলো। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আরেক ঘুঁষি কষালো বিকাশকে। তারপর আরেকটা।

আরও একটা।

শেষবারেরটায় বিকাশ ঘুরতে ঘুরতে পড়ছিল। দু'সারি সিটের মাঝখানে। চোখের নীচে কাটা দাগওয়ালা ছেলেটা এবার টুকুর দিকে ফিরে তাকিয়ে হাসলো। ওর সঙ্গীরা দোরে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে। আসলে এই নিঃশব্দ মারামারির বাইরে দাঁড়িয়ে তারা পাহারা দিচ্ছে। বিকাশ যাতে তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে না পারে বাইরের লোক না ডাকতে পারে।

এসব এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছিল! ফাঁকা ট্রেন যেন অন্যদিনের চেয়েও জোরে ছুটছে। ছেলেটা এসে টুকুর হাত মুচড়ে ধরলো। ঠিক সেই সময় বিকাশ দু'সারি সিটের মাঝখানে পাটাতনের ওপর ডাবওয়ালাদের একখানা বাঁক পেল। সেখানাকে লাঠি করে উঠে দাঁড়িয়ে একরকম টলতে টলতেই চোখের নীচে কাটা দাগের ছেলেটার কাঁধে সেখানা যত জোরে পারে ধাঁই করে কষালো।

টুকুর হাতখানা আলগা হয়ে গেল চালওয়ালা ছেলেটার হাতে থেকে। সেই সময়েই কোঁক্ করে শব্দ করে ছেলেটা পাটাতনে বসে পড়ল।

কি হোল রে বিষ্টু? বলেই বাকী তিনজন দরজা থেকে ছুটে এল।

তার ভেতরেই বিকাশ টুকুকে তার পাশে টেনে নিল।—এক পা এগোলে মারবো। বিকাশ বললো বটে, কিন্তু তখন তার ধুতির কাছা খুলে গিয়ে পাটাতনে লুটোচ্ছে। গায়ের ছেঁড়া শার্টের ওপর মুখ থেকে রক্ত পড়ে কালো দাগদাগালি হয়ে গেছে। মাথার চুল সামনের দিকে ঝুলে পড়ে বাঁ চোখটা ঢাকা। ডান চোখের ভ্রূসুদ্ধ অনেকটা জায়গা টোম্বল। টলছে তবু হাতের বাঁকখানা শক্ত করে ধরেছে বিকাশ। আর এক পা এগোলে—

টুকু কাঁদছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। শেষের তিনজনের ভেতর বড় সাইজের লোকটা কচাৎ করে চাকু বের করলো।—তাই নাকি!

বিকাশও মরীয়া হয়ে বেঁকে দাঁড়িয়েছে।

ট্রেনটা ঘটাঘট শব্দ তুলে অনেকগুলো ডবল লাইন পার হল। টুকু বুঝল তারা কোন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। কেন যে আজ সকালে বেরোতে গেল!

বাঁকের বাড়ি খাওয়া সেই ছেলেটা এতক্ষণে উঠে দাঁড়ালো। সিট ধরে। এবার চারজনে মিলে বিকাশদের কোণঠাসা করে তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।

—এবার? মার খাওয়া ছেলেটাই চেঁচিয়ে উঠলো।

টুকু চোখের জল সামলাতে পারছে না। সে অবস্থাতেই তার মনে হল— এতক্ষণে যদি সীতাকুণ্ডুও আসতো!

বড় সাইজের লোকটা চাকু তুলেছে, এমন সময় জানলার বাইরে দিকে ঝুলতে ঝুলতে কামরায় যে ঢুকলো সে সন্তোষ টাকি। ঢুকে তো হতভম্ব!
—কি ব্যাপার? ছোড়দা যে!

বিকাশের হাত থেকে বাঁক পড়ে যাচ্ছিল। সন্তোষ বিকাশকে ডাকে ছোড়দা। তার বড় প্রকাশকে বড়দা।

পেছন থেকে গলা শুনে ওরা চারজনই ফিরে তাকালো। ওদের একজনের হাতে চাকু দেখেই সন্তোষ গন্ধ পেয়ে গেল।—তবে রে হারামজাদা! আমাদের লোককে একা পেয়ে—

কথা শেষ হল না সন্তোষের মুখে। তার সারা শরীরটাই আস্ত একখানা লাথি হয়ে গিয়ে বড় সাইজের লোকটার পেটে সেঁধিয়ে গেল। তারপর এলো-পাথারি রদ্দা, চড়, ঘুঁষি, লাথি। বোতাম-টেপা যন্ত্রের মতই। চারজন একদম ছিটকে গেল। একজন সিটে এলিয়ে পড়েছে। দু'জন ছুটে দরজার কাছে। গোড়ায় মার খাওয়া সেই ছেলেটা লোহার রডে ঠুকে গিয়ে বসে পড়েছে। তার কোঁকে একটা লাথি কষিয়ে সন্তোষ টাকি বিকাশের হাত থেকে বাঁকখানা কেড়ে নিল।—চাল পাচার করিস বিনে টিকিটে, তার ওপর ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ের গায়ে হাত? মোক্ষম মার দেবে বলে বাঁক তুললো সন্তোষ।

মাথা ঠুকে গিয়ে বসে পড়া ছেলেটা ওরই ভেতর নিজের মাথাটা বাঁচাতে দুখানা হাত তুলেছে।

টুকু এগিয়ে গিয়ে সন্তোষ টাকির হাত চেপে ধরলো, মরে যাবে—

সন্তোষ থমকে গেল।—আমি ভাবি কে না কে! অনাথদার বড় খুকী না?

ট্রেন তখন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। টুকু মাথা নীচু করে দাঁড়াল। চোখের জল গালে গড়িয়ে নেমেছে।

এত কাণ্ডের ভেতর সন্তোষ টাকি হেসে বলল, শাড়ি ধরলে চিনবো কোত্থেকে দিদি? তুমি যে এত বড়টি হয়ে গেছো জানতাম না মোটে।

গাড়ি দাঁড়াতেই প্রথমে তিনজন ছুটে পালালো। পাটাতনের ওপর গড়াতে গড়াতে মার-খাওয়া ছেলেটা দরজায় পৌঁছে গেছে।

তখনো টুকু মাথা তুলতে পারছে না। বিকাশ এবার ফাঁকা সিটে ধপ করে বসে পড়ল। কাছা দেওয়ার কথা মনেই নেই তার। বাঁ চোখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে নিল।

তা অ্যাতো সকালে কোত্থেকে ফিরছো তোমরা টুকুদিদি?

গঞ্জঘাটায় বেড়াতে গিয়েছিলাম।

আমায় বললেই পারতে। সব ঘুরিয়ে দেখাতাম তোমাদের।

অনাথের সঙ্গে শাস্তা কখনো বাওড়ের দিকে আসেনি। ঝড়ে লাইন কেটে গিয়ে ইলেকট্রিক আজ তিনদিন বন্ধ। পুকুরের অল্প জল রোদে তেতে আগুন। আজ ক'দিন ধরে ধানের গোছে বিষ দেওয়া গিয়েছে সকাল-সন্ধ্যে। মাজরা আটকাবার শেষ চেষ্টা। আজই অনাথ ফ্রি। অফিস বন্ধ। জৈনদের জন্যে কি একটা পাবলিক হলিডে।

গাছের ছায়া ধরে ধরে দু'জনে বটতলার উল্টোদিকে বাওড়ের আরেক তীরে এসে পৌছলো। সেখানে দাঁড়িয়ে বটতলা পেনসিলে আঁকা ছবি।—এদিকটায় জল ঠাণ্ডা হবে না শাস্তা। আরেকটু এগিয়ে যাই—

আর হাঁটতে পারছি নে। ঠাণ্ডা জলের লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে এতটা এনেছো। ইলেকট্রিক লাইন ঠিক না হলে তো বাথরুমে জলই আসবে না। আর কদ্দুর যাবো।

আরেকটু এসো।

সামনে তো জঙ্গল। আমি আর এগোতে পারবো না।

চলে এসো শাস্তা। সামনেই গাছের ছায়ার নীচে ঠাণ্ডা জল।

বেলেমাটির ওপর মানুষপ্রমাণ ঘাস আর ভাটগাছের জঙ্গল। তাতে অজানা লতা ফুলসুদ্ধ বেয়ে উঠেছে। একটা শঙ্খচিল ছায়া দেখে নেমেছিল। ওদের পায়ের শব্দে ভারী ডানা ভাসিয়ে বাওড়ের আরেক কোণে চলে গেল।

কে? অনাথ বলতে বলতে একটা নীল শার্ট পেছন ফিরে ছুটে চলে গেল। ভাট আর ঘাস জঙ্গল মাড়িয়ে। অনাথ মনে মনেই বলল, সন্তোষ টাকি না? কিন্তু একদম নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। জায়গাটা ছায়ামত।

শাস্তাও চমকে উঠলো। তার সামনে রিনি উঠে দাঁড়াচ্ছে। দক্ষিণাবাবুর মেজো মেয়ে রিনি।—এই রিনি? তুই এখানে কি করছিস?

বৌদি, তুমি!

আমরা চান করতে এসেছি। তুই কি করছিলি? তোর সঙ্গে ও কে ছিল?

অনাথ অন্যদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে জলে নেমে গেল। সে পরিষ্কার দেখেছে। সন্তোষ না হয়ে পারে না। অমন বাঁকা বাঁকা পা আর কার হবে?

কেউ না তো। অনাথদা কোথায় গেল ? তুমি ভুল দেখেছো।

না। ভুল দেখিনি। তুমি দক্ষিণাবাবুর মেয়ে মনে রেখো, যা ইচ্ছে করে গিয়ে ঈশ্বরীতলায় পার পাবে না। কেউ ক্ষমা করবে না।

আমি তো মাছ ধরতে এসেছিলাম এখানে।

তোর ছিপ কোথায় পোড়ারমুখী ?

আজকাল হাতেই মাছ ধরছি বৌদি। আচ্ছা তুমি আমার জন্যে এত ভাবো কেন বল তো ?

শুধু হাতে ? তা তুই পারিস। মুখখানা যে কি সুন্দর তোর। আমি পুরুষ হলে তোকে জোর করে বিয়ে করতাম। নে, চান করে নে আমাদের সঙ্গে। আমাদের বাড়ি খাবি আজ।

জোর করে বিয়ে বসলে যদি ছুরি চলতো ?

তা তোর মত মেয়ের জন্যে ছুরি-মারামারি আশ্চর্য নয়। ঈশ্বরীতলায় তোর যোগ্য পুরুষ নেই যে—

তুমি আমার দিকে অমন করে তাকিও না বৌদি। আমার ভীষণ লজ্জা করছে।

তোর যা গড়ন না তাকিয়ে উপায় নেই রিনি। এদেশের পুরুষগুলো কি ? চোখ নেই একটারও ?

আমার বাবাই তো অন্ধ বৌদি। ইলেকশন ইলেকশন করে মেতে আছে।

তোর সঙ্গের ছেলেটা কে ছিলো রে রিনি ?

এসো জলে নামি বৌদি।

অগত্যা অনাথকে আরও দূরে গিয়ে সাঁতরাতে হোল। বাওড়ের এদিকটা গভীর অনেক। নদীর খাত ভেঙে গিয়ে বাড়তি জল যেখানে বাসা বাঁধে—সে জায়গাটাই বাওড় হয়ে দাঁড়ায়। নদী মুছে গেলেও পড়ে থাকবে।

এঃ ? বৌদি, আমি তো গামছা আনিনি।

তাতে কি। আমার গামছা নিবি। কে ছিলো রে ছেলেটা ?

সন্তোষদা। সবাই বলে সন্তোষ টাকি।

ও সর্বনাশ। তোমায় আমি কি করি দেখো। জল থেকে ওঠো একবার। সে তো শুনি ডাকাত।

একসময় ডাকাতি করতো। এখন বাবার ভোট দেখে। ইলেকশন হয়ে গেলে আমায় বিয়ে করবে বলেছে।

কি সর্বনাশ! কত দূর এগিয়েছিস পোড়ারমুখী?

ভুস করে একটা ডুব দিয়ে রিনি মাথার চুল ঠিক করে নিল।—আমরা আর কি এগোবো বৌদি! বাবা তো আমাদের পড়ালেন না যে একটা যা-হয় তা-হয় কাজ খুঁজে নেব। আমার এই ভালো। আমাকে একদিন না দেখলে সন্তোষদার চোখে জল এসে যায়—

তলায় তলায় এতদূর?

স্নান সেরে অনাথকে আগে আগে হাঁটতে হচ্ছিল। এখানে এই-ই নিয়ম। মেয়েরা পেছন পেছন হাঁটবে ভিজে কাপড়ে। তাই সহবৎ।

শান্তাদের বাড়ি গিয়ে শান্তারই একখানা শাড়ি পরলো রিনি। খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প জুড়লো। কলেজে পড়া হলে রিনি এসব গল্প বলতো না। শান্তাদের বিছানায় আসন করে বসে রিনি তার বুদ্ধিমত মজা খুঁজে খুঁজে গল্প বলে গেল। কোন্ গাইয়ের এবো হয়েছিল। সে কী ভাবে সারলো। পঞ্চানন-তলার বাবা পঞ্চানন কত জাগ্রত। আর 'সুন্দর' কথাটাকে বার তিনেক 'সোন্দর' বললো। এখানকার উচ্চারণে।

শান্তা আর অনাথের ভালোই লাগছিল। টুকু আর লিলি তো এ-ঘর থেকে নড়লোই না। হাসলে এত সুন্দর দেখায় রিনিকে।

বিকেলের চা খেয়ে তবে রিনি গেল।

তোকে খুঁজবে না? অ্যাতো দেরিতে যাচ্ছিস।

সবাই ভাববে আমি বাড়ির বাগানের পুকুরে ছিপ ফেলে বসে আছি। আর সত্যি সত্যি আমি থাকিও তাই। আমার তো কেউ খোঁজ নেয় না।

নেবে কি। ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে ডাকাতের গলায় মালা দিবি। ওসব ছাড়্ রিনি। ওসব হয় না। আমি একটু-আধটু কলেজে পড়েছি। আমি জানি।

রিনি কোন কথা না বলে কোম্পানি বাঁধে উঠে গেল। একবার ফিরেও তাকালো না। বাড়ির লাল বারান্দায় তখন শান্তার পাশে টুকু আর লিলি দাঁড়িয়ে।

লিলি বলল, রিনি পিসীকে আরেকদিন আসতে বলো মা। বড় সুন্দর গল্প বলে। হাসলে ওকে আমার খুব ভালো লাগে।

রিনির হেঁটে যাওয়া তখনো দেখা যাচ্ছিল।

অনাথ মাঠে। এক একটা গোছ ধরে পরীক্ষা করে দেখছে। যদি মাজরা

থাকে—থাকলে বিষের দাপটে ফৌত হয়েছে কিনা। না হয়ে থাকলে কেন হয় নি? সঙ্গে তার এখন মদন বদন।

আধমরা কিছু ক্রিমি পাওয়া গেল। কিছু মারাও গেছে। দু'একটি পুরোদস্তুর জ্যান্ত। বেশির ভাগ ক্রিমি বিষের চাপে পড়ে গাছের থোড় ধরে নীচের দিকে কুরে কুরে নেবে গিয়ে মাটির তলায় আশ্রয় নিয়েছে।

একটা কথা বলি বাবু, বড়দার কোন খবর রাখো?

অনাথ মন দিয়ে পোকা দেখছিল। গর্ভথোড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে। মাথা তুলে মদনের দিকে তাকালো।

নত্রেশ্বরের কথা বলছি বাবু। বৌদিদি তো খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়ে বসে আছে।

জামিন দিচ্ছে না তো!

কোন্ জেলে আছে জানো বাবু? বৌদিদিকে একবার দেখিয়ে আনতাম। তুমি পাস লিখিয়ে দিতে পারবে না?

পারা যায়। কিন্তু খোঁজ যে নেব তার সময় কোথায়? আমি যাবো কখন?

একটু যেতে হয় তোমায়। ওষ্টকে নিয়ে বংশী এসেছিল। ওরাও বড়দাকে দেখতে চায়।

বংশীদের খবর কি রে মদন?

ভালোই। এখানে উঠে আসবে বলছে। জায়গা দেখছি আমরা—

এসে করবে কি এখানে?

দোকান দেবে। আলুর চপ, বেগুনি—যা বিক্রি করে তাই করবে।

অনাথ টের পেল আবার চব্বিশ ঘণ্টা পরে জগতের আরেকখানি বিকেল ঈশ্বরীতলায় আকাশ থেকে এ মাঠে নেমে আসছে। শব্দ কম। আলোও কম। এইভাবেই রোজ বিকেলে বিকেলগুলো আসে। পাখিরা শেষবারের মত পোকা, কাঠকুটো খুঁটে নিচ্ছে ঠোঁটে।

ছাদনাতলায় ওষ্টর মুখখানা মনে পড়লো অনাথের। কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না মেয়েটা সে রাতে। ঘোমটা খসে পড়েছে। ভাঙা বিয়ের অধিকারী—তার নিজের বর বংশী কাপালি তখন উল্টো দিকের পিঁড়িতে বসে আছে।

অনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বুঝলো, ক'দিন ধরে ওষুধ দিয়েও মাজরা পোকা তাড়ানো যায়নি। সামান্য মরেছে। বেশির ভাগ আশেপাশেই আছে।

তার কপাল কুঁচকে উঠলো।

খাল কেটে সে মাটি তুলে কোম্পানি বাঁধ হয়েছিল। খালের জলেই এতখানি চাষ। এ খালের সঙ্গে এক সময় বিদ্যেধরীর যোগ ছিল। তখন খাল দিয়ে লঞ্চ চলতো। সে লঞ্চে চড়েছে এমন বহু লোক এখনও ঈশ্বরীতলায় ঘুরেফিরে বেড়ায়। নদী আসে অনেক বছর ধরে। বয়ে যায় আরও অনেক বছর। যখন সে নদী মুছে যাওয়ার—তা কেউ ঠেকাতে পারে না। পেছনে পড়ে থাকে বাওড় আর কিছু স্মৃতি। সে-সব গল্পকথাও একদিন মুছে যায়। তারপর নদীর কাহিনী থাকে খালে—কোন বিরাট শুকনো খাতে—বর্ষার রাতে সেখানে ফোঁটাগুলো চটাস ফটাস ফোটে। জ্যোৎস্নায় বিস্তীর্ণ চড়া ভেসে যায়। সন্ধ্যে অব্দি গরু চরে। ভালো চাষী তাতে ভুঁইকুমড়ো ফলায়।

অনাথ একদিন মদন বদনদের সঙ্গে দ্বারিকপোতা যাচ্ছিল। মাঠের ভেতর এক জায়গা দিয়ে কলকাতার ড্রেনের সাইজের একটা নালা জলে ভরে ছিল। লাফিয়ে পার হওয়ার সময় মদন বদন কপালে হাত ঠেকালো।

তাদের দেখাদেখি অনাথও ঠেকালো।—কি ব্যাপার মদন?

বিদ্যেধরী পার হলে বাবু।

এই বিদ্যেধরী!

এখন এটুকু আছে। আমাদের ঠাকুর্দা এখান থেকে খেয়া ধরে বিদ্যেধরী পার হোত। পারাপারের সময় পয়সা ছুঁড়ে দিত নৌকোডুবি ঠেকানোর মানত।

সেই বিদ্যেধরী এই!

হ্যাঁ, এই।

একটা নালা মাত্র!

ঠাকুর্দার আমলে কি আর তাই ছিল? তখন বড় বড় নৌকো যেত। পাল তুলে।

অনাথ নালার ওপারে দাঁড়িয়ে শিউরে উঠেছিল। নদী থাকলে সে এখন তার বুকের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। একটি বৃহৎ জলধারা তার প্রবল শক্তিসুদ্ধ সব রাজ্যপাট এখান থেকে তুলে নিয়ে গেছে।

ধানে ফুল এসে গেল। এখনো বোঝার উপায় নেই—মাজরার দৌলতে কোন্ শিষ ফলবতী হবে, কোন্টা চিটে। আরও মাসখানেক গেলে তবে চেহারা ছবি পরিষ্কার হবে।

সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে অনাথ দেখলো ঈশ্বরীতলার এই একজোটের চাষীরা সবাই তার জন্যে কোম্পানি বাঁধে বসে আছে।

অনাথ আসতেই তারা জানালো, পাম্প দিয়ে এখন শুধু পাতলা পাঁক-মেশানো জল উঠছে।

অনাথ পারলে বাঁধের ওপরেই বসে পড়তো। এখন এ ক'মাস জলের ভয়ংকর দরকার।

এর পরের দুটো দিন অনাথ ব্যাঙ্ক আর কলকাতায় ছুটোছুটি করলো। চারদিনের দিন এলাহি কাণ্ড। চার ইঞ্চি ডায়মিটারের পাইপ এসে গেল দশখানা। তার সঙ্গে ফিলটার। ড্রিল করে করে পাইপ বসলো। বালির দানা টেস্ট করে পাইপের নীচের ফিলটারের চারদিকে ছোট দানার স্টোনচিপ দু'শো ফুট নীচে নামিয়ে দেওয়া হল।

যে করেই হোক এত বড় চাষ বাঁচাতে হবে। চারখানা ফিলটার বসানো টিউবয়েল থেকে ইলেকট্রিক পাম্প যে জল টেনে তুললো তা দেখে তো সবারই চক্ষুস্থির। প্রায় তিনশো বিঘের মাঠে ধানে ফুল এসেছে। এখন প্রচুর জল চাই। টিউবয়েল থেকে সরু ধারায় জল বেরোচ্ছে। আর এ জল তো চাষেও দেওয়া যাবে না। যে ঘাসের ওপর পড়ছে তা-ই শুকিয়ে যাচ্ছে। চাষীরা মুখে দিয়ে বলল, বাবু, জলে কষা ভাব।

অনাথ ক'দিন অফিস যায়নি। ব্যাঙ্ক থেকে নতুন ধার এনে এই টিউবয়েল। তার এই অবস্থা। অনাথ বারান্দায় বসে পড়লো।

বেলা দেড়টা হবে। শান্তা বলল, চান করে এসো। খাবে না ?

খেতে ইচ্ছে নেই। তুমি খেয়ে নাও।

শান্তা দাঁড়িয়ে থাকলো। শেষে বলল, একবার এতগুলো টাকার জামিনদার হয়ে বাড়িটা বন্ধক দিলে। আবার টিউবয়েল বসিয়ে গুচ্ছের টাকার দায় তোমার ঘাড়েই চাপলো।

ধান তুলতে পারলে তো সব শোধ হয়ে যাবে।

উঠবে কি ধান ? দ্যাখো না—এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে, খেজুর গাছতলার মাঠের ধান কেমন হলুদ হয়ে উঠেছে!

অনাথ চুপ করে থাকলো। তারপর বলল, জল আমার চাই-ই চাই। না পেলে হবে না। তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরে যাবো। এই সময় কেন যে দক্ষিণভাগের নিকাশী পাম্প সব জল টেনে নিল! আমি যে কোন্ দিকে যাবো

বুঝতে পারছি না শান্তা। সবচেয়ে আগে চাই জল।

এক কাজ করো না। ইটখোলার বড বড় ডোবায় অনেক জল রয়েছে। নালা কেটে পাম্পের গোড়ায় নিয়ে এস।

অনাথ তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো। বারান্দায় দাঁড়ালেই ইটখোলার বড বড় গর্তগুলো দেখা যায়।

মন্দ বলোনি তো। কিন্তু ওরা কি জল দেবে?

ওদের আর কি কাজে লাগবে এ জল। জবেদ আলিকে গিয়ে বল।

পরদিন বিকেলের ভেতর জমিতে জল এসে গেল। জল আনাটা একটা উৎসবের চেহারা পেল। পঞ্চাশ-ষাটজন চাষীর পিঠ ঘামে ভিজে গেছে। কোদালে কোদালে নালা হয়ে গেল। শুকনো হলুদপানা ধানের গোছ দু'দিনে রসস্থ চেহারা ফিরে পেল।

অনাথের ভয় তবু যায় না। এ জল আর কতদিন। এখনো অন্ততঃ মাসখানেক জল চাই। ততদিন কি জল থাকবে? তারপর আছে অদৃশ্য মাজরা পোকার ঝাড়।

মাস কয়েক হোল টুকু আর লিলি পাশের ঘরে আলাদা মশারিতে শোয়। আগের মত আর ওদের নিয়ে শোয়া হয় না। ওরা নাকি বড় হয়ে গেছে।

রাতে এক এক দিন অনাথ উঠে গিয়ে দেখে, টুকু আগাগোড়া কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। লিলির বাঁ হাতখানা খাটের বাইরে ঝুলে আছে। নিঃশব্দে গিয়ে অনাথ হাত তুলে দিয়ে আসে।

মশারির ভেতরে শান্তা বলে, এ চাষে না নামলে হোত না তোমার।

অনাথ অন্ধকারেই বলে, চাষের আগে কি আমি এত জিনিস জানতাম? মাটির স্বভাব, গাছের ধর্ম, চাষীবাসী মানুষদের রুচি, ধানের দর, নানারকমের পোকার মরণযন্ত্রণা?

এ জানার তো দাম কম দিচ্ছো না।

কোক জিনিস বিনে পয়সায় পাওয়া যায় না শান্তা! পাতালের ভেতর থেকে শেকড় রস টেনে আনে। সেই শেকড়ের ভেতরকার খবর কতটুকু রাখি? এখন বুঝি, আমি তো এতদিন কিছুই জানতাম না। আমার চারদিকে এখন রসস্থ জগৎ। সবে দরজা খুলেছে শান্তা।

ওই বাজিকর তোমার মাথাটি খেয়েছে।

অনাথবন্ধু বসু বহুকাল পরে শ্রীমতী শান্তা বসুর ঠোঁটে যে কোন আকৃষ্ট

পুরুষমানুষের মতই বেশ জোরে একটা চুমু খেল।—তুমিও আমার মাথাটি খেয়েছো শান্তা।

আমি তো তোমায় জলের বুদ্ধি দিলাম। অত জোরে চুমু খেয়ো না, ব্যথা লাগে।

লাগবেই তো। আবার খাবো। কতদিন বউকে পাই না—

পেলেই পেতে পারতে। সব সময় ধান, পোকা চাষীদের নিয়ে থাকবে—

আজ শুধু বউকে নিয়ে থাকবো।

আমি কি ফুরিয়ে যাচ্ছি?

আজ মনে হচ্ছে সব ফুরিয়ে যাচ্ছে। আর পাবো না।

ও কি কথা!

অফিস-ফিরতি অনাথ বেলা থাকলে মাঠে নামে রোজ একবার করে। সেদিনও নামলো। ফকিরচাঁদ মোটামুটি প্রবীণ চাষী। কয়েক পুরুষের জমিজমা। তাকে মাঠে পেল অনাথ। একা একা বসে ফকিরচাঁদ শিষ গুনছিল। অনাথকে দেখে উঠে দাঁড়ালো।—ন-দশ মণের বেশি তো ফলবে না বাবু!

তাহলে তো খরচই উঠবে না ফকিরচাঁদ।

তা উঠবে না বাবু। তারপর তো আবার টিউকল বসালে। তার খরচ কে দেবে?

এই ধান থেকে ওঠার কথা।

এক মরসুমে তো উঠবে না বাবু!

অনাথের মনে পড়লো, ব্যাঙ্ক শেষবার টাকা দেবার সময় শর্ট-টার্ম লোন দিয়েছে। ধান উঠলে চাষের গায়ে গায়ে দাম দিয়ে দিতে হবে।

খড় বেচে তো কিছু পাবো!

তা পাবেন। কিন্তু সেই বর্ষাকালে। তখন খড়ের দাম ওঠে।

ততদিন ধরে রাখবো কোথায় এত খড়?

তাহলে তো সস্তায় ছেড়ে দিতে হবে বাবু। নইলে ফেলে রাখলে পয়লা বর্ষাতেই পচে যাবে।

অনাথ মনে মনে অঙ্ক কষে বিষণ্ণ হয়ে গেল। জমি-মালিকের ধান। মারজিন মানির জন্যে নেওয়া ধান। চাষীর ধান। তারপর ব্যাঙ্কের ধান। এত ধান তো মাঠে নেই। হোত যদি মাজরা পোকা এসে পৌঁছবার আগেই সাবধান হওয়া যেত।

ঈশ্বরীতলার সবাই জানে কোম্পানি বাঁধের গায়ে একটা বিরাট কাণ্ড হচ্ছে।

ট্রেনের কামরায় কামরায় অনাথের নাম। এতকাল সবাই জানতো—সে এ দেশে বাড়ি করে ঈশ্বরীতলার বাসিন্দা হয়েছে। এখন জানে অনাথবন্ধু একজন বড় চাষী। ব্যাঙ্কের বাবুরা তাকে সফল ভেবে প্রায়ই বলে, সামনের বার ট্রাক্টর কেনার টাকা নিন। লম্বা কিস্তিতে ফেরত দেবেন।

অনাথ একটা কিছু তৈরি করে দেখতে চেয়েছিল। তৈরি করার ভেতর দিয়ে সে এই পৃথিবীর ভেতরের ব্যাপার ধরতে চেয়েছিল। যেখানে গিয়ে মনে হওয়ার কথা—আমি মেঘ হয়ে আকাশে ভাসতে না পারি কিন্তু কাদা করে ধানচারা রুয়ে দিয়ে তার রঙ ঘন কালো করে তুলতে পারি। তিন চারা গিয়ে শেষ পর্যন্ত আশিটা বিয়েন কাঠি ছাড়বে—আমারই তাঁরবতে। এরকমই তো ভেবেছিলাম।

কিন্তু কি হয়ে গেল। এখনই সে পোকায় কাটা মাঠটাকে দেখতে পাচ্ছে। এত লোক আশা করেছিল—এবার ঈশ্বরীতলায় একটা ভালো কাজ হতে চলেছে। ধান উঠলে এরকম ব্যাপার সার ঈশ্বরীতলার মাঠে মাঠে গড়ে উঠবে। এরকম কথা এখন ঈশ্বরীতলার গাছতলা, পঞ্চাননতলা, স্টেশনবাজার—সর্বত্র শোনা যাচ্ছে। অথচ আসল জিনিসই বাপোট বাজার মুখে।

সন্ধ্যের দিকে চিলেকোঠার ঘরে উঠে দেখলো—মাটি তো অনেক নীচে। বাড়িটার চারদিকে ধানের মাঠ। দূরে দ্বারিকপোতা খাড়ুপাতাল, চন্দনেশ্বর—পর পর সব মৌজা সন্ধ্যের অন্ধকারে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টায় আছে।

মোট দেনা পঞ্চাশ হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেছে। অনাথ বুঝতে পারলেও তার সাহসে কুলোলো না। সে এখুনি যদি নীচে লাফিয়ে পড়ে আত্মঘাতী হয়—তাহলে কোন দেনাই তাকে ছুঁতে পারবে না। এখন আসলে তার বেরিয়ে আসার উপায় নেই। লোকসান জেনেও তাকে পুরোপুরি সব কিছু করে যেতে হবে। যা পাওয়া যাবে তা না কুড়োলে তো লোকসানের বহর আরও বাড়বে। হেরে যেতেই হবে আগাম জেনেও দৌড় থামানোর উপায় নেই।

কত বছর ধরে এই দেনার বোঝা টানতে হবে।

এখন এই মাঠবোঝাই ধানের গোছ আসলে খড়। ভবিষ্যতের খড়।

আরেক দিক থেকে অনাথ নিজেকে বোঝাতে গেল। হেরে গেলাম তাতে কি? আমি কত জিনিস দেখলাম। দেখতে দেখতে এগোচ্ছি। এখন আমি ভূগোল বইয়ের ঋতুকে প্রহর ধরে ধরে চিনি।

আসলে শেষ অব্দি থাকে কি? থাকে তো এই মানুষটা। এই আমি।

আমার দেখা। আমার চেষ্টা। আমার কষ্ট। আমার সুখ।

তাই কি সত্যি? নিজের প্রেমে পড়া কিন্তু সবচেয়ে খারাপ জিনিস অনাথ। বড় ঘেন্নার ব্যাপার।

জগেন যাত্রা এখন জগেন পাগল হয়ে একগাল মুড়ি খেয়ে দিব্যি কৈবল্যদায়িনী বলে গেয়ে ওঠে। যত দিন যাচ্ছে—তার তো বাড়তি জিনিসপত্র ঝরে যাচ্ছে। গোড়ায় গেল জুতোর দোকান। তারপর যাত্রা। এখন একে একে গায়ের জামাকাপড় কমে যাচ্ছে। বেড়েছে শুধু চুল, দাড়ি, নখ। আর গায়ের বোঁটকা গন্ধটা। নয়তো জিনিসপত্র কমতির সঙ্গে সঙ্গে জগেনের গলা তো দিব্যি খুলছে দিনকে দিন। ও যে কোনদিন গাইবে কে ভেবেছিল।

বাড়তি জিনিস ছাড়লে শরীরটা হালকা হয়। মনটা উড়ে বেড়াবার পাখা পায়। ভোরবেলা বিন্ধ্যেশ্বরীর বাগুড়ের জলেই সূর্যটা প্রথম লাফিয়ে পড়ে। তার ঠিক আগে অন্ধকার তরল হওয়ার মুখে পৃথিবী এত পরিষ্কার থাকে! বাজে ঘর-বাড়ি দেখা যায় না। সবটাই কুয়াশা আর অন্ধকারে মাখানো চিরকালের জগৎ বলে মনে হয়। কড়া আলোয় বাহুল্যগুলো ধরা পড়ে। পৃথিবীর স্বাদ আজকাল আর চিনে নিতে অসুবিধে হয় না অনাথের। খালি পায়ে ভোরের মাঠে হাঁটলে পা ভিজে যায়। গাঁয়ের ভেতরে কত বাড়িতে গেছে সন্ধ্যেরাতে। জ্যোৎস্না গোয়ালঘর, ধানের গোলা, উঠোন সর্বত্র সমানভাবে পড়ে আছে। সত্য-নারায়ণের সিন্নির দিন সবাই ফালি ফালি কলাপাতা পেতে বসে আছে। কখন বিচে কলা চটকে মেশানো গুড় আর আটার সিন্নি দিয়ে যাবে বাড়ির বড় গিন্নী। তাতে ঘরের গাইয়ের দুধ পড়েছে অনেকটা। এরকম কত জায়গায় জগৎ ছড়ানো। চিনতে আজকাল একটুও কষ্ট হয় না অনাথের। এর ভেতর মাঠ-ভরাত মিথ্যেই ধানের গোছ দাঁড়ানো। এগুলোকে পাকতে সময় দিতে হবে। তারপর কাটা, ঝাড়া, সারাই আছে। চিটে উড়িয়ে ধান বেরোবে। ততদিন শুধু বোঝা বয়ে যাও। কোন নিস্তার নেই।

ওপর থেকে অনাথ বিকল টিউবয়েলটি দেখতে পেল। ওর মতনই এই মাঠটাকেও তার এখন বিকল লাগছে। কিন্তু এই মুহূর্তে বেরিয়ে আসারও কোন পথ নেই।

রাসবাড়ির আদালত-হাটের গায়েই এদিককার বড় ছাপাখানা। সেখান থেকে পোস্টারের গাদা এসে পৌঁছলো ঘটকপুকুরের বাসে। ড্রাইভারের সিটের

পাশ থেকে পোস্টারের বোঝা নামিয়ে নিচ্ছিল সন্তোষ টাকি। পেছনের দরজার হাতল ধরে বউ-মত একটি মেয়ে নামতেই সন্তোষ পোস্টারের বোঝা রাস্তায় ফেলে এগিয়ে এল।

ওষ্ট না! কখন এলি?

দেখতেই পাচ্ছো বাস থেকে নামছি।

তোর বর কোথায়?

আঙুল দিয়ে বাসের ছাদ দেখালো। বংশী বিছানায় সুতুলি মোড়া বোঝাটা নীচে ফাঁকা দেখে ফেলল। তারপর হাঁড়িকুড়ি বোঝাই একটা কাঠের বাক্স নামালো।

তোরা চলে এলি নাকি?

থাকবো কিছুদিন এখানে—

একটা ভালো খবর দিচ্ছি। ভদ্রেশ্বর জামিন পাবে শুনলাম।

তাই নাকি? বড়দা আসবে?

তাই তো শুনছি। কোর্টে কিছুই প্রমাণ হয়নি এখনো। আমাদের পাকা হাতের কাজ, বুঝলি না—

পোস্টারের বোঝার ওপর দিয়ে রিকশা সাইকেলের চাকা চলে যাচ্ছে দেখে সন্তোষ হা-হা করে ছুটে গেল।

সেদিনই রাতে স্টেশন, বাজার, অয়েলমিল, ব্যাঙ্কবাড়ি, বটতলা, জগেনের বন্ধ জুতোর দোকানের গায়ে সর্বত্র পোস্টার পড়ে গেল। জনতার প্রার্থী—দক্ষিণা চক্কোত্তি। পোস্টার দেখে আর লোকে তাই বলে। আসলে কিন্তু লেখা আছে চক্রবর্তী। তবু লোকে বলে চক্কোত্তি। ভোট পিছিয়ে পিছিয়ে ইলেকশন মিটিংগুলোও কেমন মিইয়ে গেছে।

অনাথের সামনে দিয়েই ওষ্ট আর বংশী সাইকেল-রিকশা করে গাঁয়ের ভেতরে চলে গেল। দু'খানা রিকশায়। শেষেরটায় হাঁড়িকুড়ি, কাঠের বাক্স, হেরিকেন, তোলা উনুন—আরও কত কি।

অনাথ বাজারে এসেছিল কামারশালায়। ষোলখানা কাস্তে ধার দিতে দিয়েছে আজ তিনদিন। এখন পান মারা হচ্ছে। হয়ে গেলেই ডেলিভারি পাবে। সোমবার থেকে ধান কাটা শুরু। মাঝে আর দুটো দিন। ধান পেকে গাছ শুয়ে পড়েছে। আর দেরি করলে ঝরে যাবে। আকাশের চেহারাও তামাটে। কিছু বিশ্বাস নেই।

মিস্ত্রীদের মিষ্টির দোকানে নিজের হাতে রোজ পাঁচ কেজি করে দুধ মেপে পাঠিয়েছে শান্তা। আজ সাঁইত্রিশ দিন হল বড় মিস্ত্রী কোন টাকা পাঠায়নি। হিসেবের খাতা হাতে টাকা আদায় করে নিয়ে শান্তা ফিরছিল। বড় মিস্ত্রীর কত যুক্তি! বৌমা, দুধের দাম একটু কম করে নিন। বড গরুর দুধে ছ্যানা কম হয়। আর ছ্যানা নিয়েই তো আমাদের কারোবার। আপনি দরটা কম ধরুন।

শান্তা টলেনি। একটা কথাই বার বার বলেছে। এ-গরুর দুধ দিয়েই আমাদের সংসার চলছে। বাজারহাট হচ্ছে।

কেন? বাবু তো চাকরি করেন।

মাথার ঘোমটা আরও তুলে দিয়ে শান্তা বলেছে, চাষের খরচের জন্যে অনেক টাকা আগাম নিতে হয়েছে। মাইনের সব কেটে নেয়।

এখন তো ধান কাটা চলছে! ধান উঠলেই সব শোধ হয়ে যাবে! আমরা খবর রাখি বৌমা।

ভেতরের পোকা লাগার খবর, অপর্যাপ্ত চিটে-ধরার খবর—কিছু রাখে না ঈশ্বরীতলার মানুষজন। ধান কাটা চলছে। চাষীরা মালুম পাচ্ছে। রোজ রাতে অনাথ শুধু পায়চারি করে। শান্ত মুখে বলল, সে আপনাদের আশীর্বাদ। যাই, বৃষ্টি নামতে পারে।

রিকশা ডেকে দেব বৌমা? আকাশের গতিক ভালো না।

দরকার নেই। হেঁটে পৌঁছে যাবো।

হাঁটতে হাঁটতে শান্তা অক্রূরের মুদিখানার সামনে দাঁড়ালো। আজ কয়েক মাস সে নিজেই বাজারহাট করছে। অনাথ চাষ নিয়ে জড়িয়ে আছে। রোদের ভেতর এ ক'মাস আলে আলে ঘুরে চেহারাটা কালিবর্ণ। মাঝে মাঝে মাথা ঘোরে।

শান্তাকে দেখে অক্রূর বলল, এক নম্বর খোল আছে বৌমা। ভালো গুড়ও এসেছে। নেবেন নাকি?

আজ থাক। সৈন্ধব লবণ থাকে তো দিন এক কেজি। আপনার গাইয়ের ধাত তো জানেন। মাসখানেক অন্তর নুন না দিলে অরুচি হয় মুখে।

আপনাদের বাড়ি গিয়ে আরও সুখী হয়ে পড়েছে গরুটা।

ঠোঙাটা হাতে নিয়ে আর কোন কথা বলল না শান্তা। উমা এখন তাদের জিনিস। তাদেরই দেখতে হবে। সুখী হোক আর দুঃখীই হোক। মাসকা-

বাবি চুনিভুষি, গুড, খোল একবারে রিকশা বোঝাই দিয়ে নিয়ে যায় বলাই। উমা না থাকলে এ ক'মাস যে সংসার চলতো কিসের জোরে তা ভেবেই পায় না শান্তা। দুধের দামে কাঁচা বাজারের দেনা শোধ হয়। বাড়িতেই দই, সন্দেশ করে উমার দুধে মাঝে মাঝে। বাজার না হলে পায়েস রেঁধে রাখে টুকু আর লিলির জন্যে।

লেভেল ক্রসিং পার হতেই গেট বন্ধ হয়ে গেল। বিকেল চারটে কুড়ির কলকাতার গাড়ি আসছে। আলুর চপের তোলা উনুনের পাশ থেকে এক ছোকরা এগিয়ে এসে প্রণাম করলো। এই ঠোঙাটা নিয়ে যান বৌ দদি। আপনি বাজারে এসেছেন দেখেছি।

শান্তা দাঁড়িয়ে গেল। বেশ ছিমছাম চেহারা। ঠোঙা-ভরতি আলুর চপ, বেগুনি। গোটা চারেক চিংড়ির চপও আছে। গরম।

নিয়ে যান। খুকীরা খাবে। আমার নিজের হাতে ভাজা।

তুমি কে?

ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো।—আমায় চেনেন না?

না বলতে লজ্জা হল শান্তার। কিন্তু সত্যিই চিনতেও পারছে না। হঠাৎ হাতের দিকে তাকিয়ে চিনে ফেললো। ওই হাতঘড়ি শান্তার চেনা। ব্যাণ্ডও পাল্টায়নি। তুমি তো বংশী, তাই না? বলছিল আর শান্তা দেখছিল, এরই ভেতর বেশ গোছানো চেহারা।

ঠিক ধরেছেন।

এখানে কবে এলে?

এই তো ক'দিন। দোকান দিলাম। আমার হাতের জিনিস তো খাওয়াইনি কোনদিন আপনাদের। ওষ্টর মুখে আপনাদের কথা শুনেছি অনেক—

তা ঘটকপুকুরের দোকান?

তুলে নিয়ে এলাম এখানে।

আর যাবে না? ওষ্ট কোথায়?

ওষ্টকে নিয়ে এসেছি। দাদার অত্যাচারে ওখানে আর টেকার উপায় ছিল না বৌদিদি। চিংড়ির চপ আপনি একখানা খেয়ে দেখবেন। দাদাকেও দেবেন।

খালপোল পেরোবার সময় শান্তা দেখলো, কোম্পানি বাঁধে ওঠার মুখে তালগাছের গায়ে লাগানো দক্ষিণা চক্কোত্তির পোস্টার বাতাস এসে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে

আধখানা তুলে ফেলেছে। হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে গায়ে লাগছে।

বাড়ি ফিরে লাল বারান্দায় উঠে শান্তা দেখলো, চাষীরা বাইরে আলো জেলে দিয়ে কাটা ধানের বিচুলি বয়ে এনে গাদা দিচ্ছে। মাঠ থেকে সব তোলা যাবে না। এখনো শুকোয়নি। ক'জন মিলে সেই কাটা বিচুলি উঁচু জায়গা দেখে ফিরিয়ে ফিরিয়ে রাখছে। মাঠের বারোআনা ধান কাটা বাকী।

বৃষ্টির আসল খবর এল মাঝরাতে। ঘরের ভেতর বেতালের লড়াইয়ের মত আওয়াজ পেয়ে শান্তা উঠলো। আলো জেলে দেখে, খোলা জানলা দিয়ে ঘরের ভেতর একখানা মোটা এনামেল কাগজ ঢুকে মেঝেতে দাপাদাপি করছে। হরেক বিষের বাক্স মাঠে বসে খুলে তবে বিষ দেওয়া হয়েছে। তারই একখানা মোটা কাগজকে বাতাস তোল্লা দিয়ে ঘরে এনে ফেলেছে। তাতেই মাঝরাতে এই খচমচ শব্দ।

অনাথ ঘুমে অচৈতন্য। দরজা খুলে বাইরে এসে বুঝলো কি প্রবল বেগে বাতাস বইছে। তার সঙ্গে পায় মারবেল সাইজের বৃষ্টির ফোঁটা। শান্তা সাবধানে দরজা বন্ধ করে এসে শুয়ে পড়ল। এখন অনাথ জানলে বাইরে ছুটে যাবেই। গিয়ে অবশ্য কোন লাভ নেই। তবু না গিয়ে পারবে না। বিদ্যুৎ চমকালে দেখতে পাবে বাতাস ধানসুদ্ধ কাটা বিচুলি মাঠময় উড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সারাদিন ধরে গাদা দেওয়া বিচুলিতে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ছুটে এসে গেঁথে যাচ্ছে। বাড়ির সামনেই বিকল টিউবয়েলের কঙ্কালটা দাঁড়িয়ে। চারদিকে শুধু লোকসান আর লোকসান।

বাড়িসুদ্ধ সবারই ঘুম ভেঙে গেল ভোররাতে। সারা মাঠের ওপরকার আকাশ বৃষ্টিতে সাদা হয়ে আছে। যেদিকেই তাকাও বৃষ্টির দেওয়াল। ক'দিন আগে খাল শুকিয়ে গিয়েছিল। রাতারাতি সেখানে জল এসে গেছে।

অনাথ খাট থেকেও নামলো না। টুকুকে জানলাটা বন্ধ করে দিতে বলে শান্তার দিকে তাকালো। এত জল আসছে কোত্থেকে বলতে পারো? নদী তো সেই আট মাইল দূরে। চাষীরা কেউ আসবে না?

এ বৃষ্টিতে কেউ আসবে না। জল ধরলে তবে এক-একজন করে উদয় হবে।

বেলা বারোটার ভেতর আকাশ কালি হয়ে গেল। তখনই বোঝা গেল, বিন্ধেধরীর বাওড় ভেসে গেছে। অনাথের বাড়িটা ধানক্ষেত থেকে গেঁথে তোলা বলে বেশ উঁচু। চন্দনেশ্বরের দিক থেকে জল ছুটে আসছিল। বেলা তিনটে নাগাদ অনাথদের বাড়ির দু'খানা সিঁড়ির ধাপ ডুবে গেল।

বলাই দুপুরবেলাটা হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে মাছ ধরেছে। এই খানিকক্ষণ হল উমাকে বাছুরসুদ্ধ নিয়ে কোম্পানি বাঁধে তুলেছে। দূরে কোম্পানি বাঁধে গাঁয়ের মানুষরাও অনেকে উঠেছে। ঘর থেকে আবছা আলোয় অনাথ আলাদা করে কাউকেই চিনতে পারলো না।

ফলা ধানের মাঠ বিকেলের ভেতরেই জলে গলায় গলায় হয়ে গেল। কাল বিকেলের বিচুলির গাদা জল ঢুকে একদম মাখন। অনাথ আর ভাবতে পারছিল না।

সন্ধ্যের মুখে বলাই এসে খবর দিল, উমার খাবার আর তিনদিনের আছে। বল তো নিয়ে আসি। অক্রুর দোকান খুলেছে শুনলাম।

তিন দিনে জল নেবে যাবে দেখিস। বলতে বলতে টুকু চেঁচিয়ে উঠলো, ওমা, দ্যাখো! অরুণ বরুণ চলে যাচ্ছে—

জলের তোড় বেশ জোর। পাকা ধানের সবটাই ডুবুডুবু। পাগলা বাতাস। তার সঙ্গে বৃষ্টি। বিকেল শেষ হওয়ার আগেই অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে। সেই ফাঁকে বেউগিল বাজিয়ে অরুণ বরুণ ভাসতে ভাসতে বেরিয়ে গেল।

বলাই ছুটে গেল। কিন্তু দেখতে দেখতে অরুণ বরুণ অনেকটা চলে গেছে। ছাগলগুলো পাতিহাঁসের সঙ্গে বারান্দায় এসে উঠেছে। চারদিক ভিজে। অনাথ গলা অব্দি চাদর টেনে শুয়ে পড়লো।—কোত্থেকে জল আসছে বলতে পারো শান্তা।

বুঝতে পারছি নে।

কোথাও নিম্নচাপ হয়ে এই কাণ্ড। দ্যাখো গিয়ে দক্ষিণভাগ পাম্পিং স্টেশনের মুখে নদীর বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে পড়েছে। বাওড় কানায় কানায় ভরা ছিল, সেখানে জল ঢুকে এই কাণ্ড।

তাহলে তো তোমার বাজিকর ভেসে গেছে।

তা যাবে না। কোথাও ডাঙা দেখে উঠে গেছে নিশ্চয়। যাবার আগে ঝাঁপির সাপগুলো ছেড়ে দিতে হয়েছে হয়তো।

শান্তা এতক্ষণে কথাটা পাড়লো, ধান কি সব নষ্ট হয়ে যাবে?

কিছু হয়তো বাঁচবে। অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর অনাথ আবার মুখ খুললো, বেঁচেই বা কি লাভ হবে।

অসময়ে এমন বৃষ্টি আসবে কে ভেবেছিল?

কে ভেবেছিল নিকাশী পাম্প সব জল টেনে নেবে? কে ভেবেছিল মাজরা পোকা এভাবে সারাটা মাঠ দখল করে নেবে? কে ভেবেছিল শান্তা, টিউ-বয়েলটাই ফেইলিওর হবে?

ভিজতে ভিজতে বলাই এসে ঢুকলো। নাঃ! পাওয়া গেল না। মগরমপুরের দিকে ভেসে গেল। জলের তোড়ের উল্টো দিকে ফিরে আসবে কি করে? আমারই ফিরতে গিয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল।

নে। হেরিকেনগুলো মোছ্।

কেন? ইলেকটিরি গেছে। বাঃ! তেল আছে তো?

অন্ধকার ঘরের মেঝেতে বসে শান্তা আর বলাই দুটো হেরিকেন ধরিয়ে ফেললো। খাটের ওপর অনাথ, টুকু, লিলি। উমা বাছুর নিয়ে কোম্পানি বাঁধে ভিজছে। গোয়ালে এখন তার পেট ভিজে যাবে। বারান্দায় শুক্লা একবার কাশলো। বাইরে বাতাস থেঁতলে দিয়ে বৃষ্টি পড়ছিল। অনাথ আস্তে বলল, অরুণ বরুণকে আর পাওয়া যাবে না। তাই না?

শান্তা, টুকু, লিলি কাছেই ছিল। কেউ কোন কথা বলতে পারলো না।

সবাই হেরিকেনের আলোয় বসে। লিলি বলল, আমাদের পুকুরটাও ভেসে গেছে বাবু।

তা তো যাবেই। কারোটা বাদ যাবে না।

টুকু বলল, দ্যাখো গিয়ে মদনদা বদনদা নিশ্চয় মাছ ধরছে।

কত মাছ ধরবে। চারদিকেই এখন মাছ। এ ক'টা দিন কলকাতায় মাছ সস্তা হয়ে যাবে দেখো।

॥ চৌদ্দ ॥

জল নেমে গেছে আজ দশ দিন। অনেক ধানে কল বেরিয়ে তা আবার শুকিয়ে গেল।

রোদে সারা মাঠ ভাজা ভাজা। বাছুরটাকে বেঁধে রাখতে হয়েছে। পাকা ধান জল খেয়ে খেয়ে ভারী। তারপর রোদ খেয়ে আধ-সেদ্ধ অবস্থা। এ জিনিস খেলে নির্ঘাৎ পেট ছাড়বে। উমা মশমশ করে ধানসুদ্ধ বিচুলি খেতে খেতে এগোচ্ছিল। চাষীদের অনেকেই আর ধান কাটেনি। যা মাঠে আছে তা কেটে মজুরীতে পোষাবে না।

আবার অনেকে কেটেছেও। সেই সেই জমির মালিককে ধান পৌঁছে দিতে হচ্ছে। চাষীরা ভাগ নেওয়ার পর বাকী ধান বৈদ্যনাথের গোলায় যাচ্ছে। যেমন যেমন বিক্রি—তেমন তেমন ব্যাঙ্কে যাচ্ছে।

ক'দিন পর শান্তা বলল, তোমার উমাকে বাঁধো। আর ধান খেতে দিও না।

ওখানে ধান আছে নাকি যে খাবে?

বলাই বলল, আছে গো। আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি।

তবে চাষীদের খবর দে।

তারা আসবেনি। তারা বলছে, কতটাই বা পাবো ভাগজোথ করে। ও তোমরা নাও গে—

তাও তো ঠিক।

শান্তা উঠে বসল বিছানায়। না, তা ঠিক নয়। ও ধান লোক করে কাটাও।

মজুরীতে পোষাবে না শান্তা।

আমি বলছি পোষাবে। ওরকম ভাবে তিরিশ-চল্লিশ বিঘের ধান পাখি দিয়ে, গরু দিয়ে খাইয়ে কোন লাভ নেই। যা আসে তাই লাভ। তুমি ছাখোই না লোক লাগিয়ে।

মাস দেড়েকের মাথায় দেখা গেল, ভাগের ধানে ব্যাঙ্কের ধার শোধ হয়েছে সাতচল্লিশ হাজার টাকার মত। শান্তার কথামত লোক লাগিয়ে আরও আট হাজার টাকা শোধ হল। খরচখরচা বাদ দিয়ে। তবু প্রায় একাত্তর হাজার টাকা দেনা থেকে গেল। অনাথ গোড়ায় ভেবেছিল—ধার গিয়ে দাঁড়াবে পঞ্চাশ হাজারে। দেনা বাড়লো টিউবয়েলটার জন্যে।

এখন পুরো মাঠটা তার সামনে কবরখানা হয়ে পড়ে থাকে সারাদিন। বর্ষার চাষের বাকি এখনো মাস দেড়েক। মাঠটায় অনাথের নানা রকমের স্বপ্ন জ্যান্ত অবস্থায় মাটি চাপা পড়েছে। খাল—আবার সেই আগেকার খাল, মাঝখান থেকে দিন কয়েকের জন্যে জল এসে তছনছ করে দিয়ে গেল সব।

সন্ধ্যের মুখে অফিস থেকে ফিরে অনাথবন্ধু বাড়ির সামনের লাল বারান্দায় বসেছিল। শান্তা আলো জেলে সেখানে বসে টুকুর ব্লাউজের হাতার মুড়ি সেলাইয়ে ফোঁড় তুলছে খুব সাবধানে। বারান্দায় পাশের ঘরে টুকু পড়ার টেবিলে। লিলি পুকুরের দিকে বারান্দায় বসে বলাইয়ের সঙ্গে কিসের গল্প জুড়েছে। আষাঢ় পড়ে গেছে। গাঁয়ে গাঁয়ে এখন বর্ষায় চাষের পাঁয়তারা চলছে। গোহাটায় নতুন নতুন বলদ আমদানি হচ্ছে। এমন কি উমার কোলের খোকাটিরও দরদাম করে গেছে একজন চাষী।

শান্তা দুপুরে ঘুমিয়ে চুল বেঁধেছে। অনাথের জন্তে আলু-পটলের ডালনা

বানিয়েছে। জিনিসটি অনাথের খুব প্রিয়। ভাবছে, গা-হাত-পা ধুলেই মেয়েদের ডেকে একসঙ্গে খেতে দেবে।

অনাথের গা ধুতে যেতে ইচ্ছেই করছিল না। কি হবে গা ধুয়ে। সামনে তো তার কোন আনন্দই নেই। আজই বিকেলে অফিসে বসে হিসেব করে দেখছিল। এখনই যদি রিটায়ারের সময়কার টাকাগুলো পেয়ে যেত—তাহলে এক ঝটকায় দেনা শোধ করা যেত। নইলে সারাজীবন ধরে সুদ গুনতে হবে।

ভেতরের এই অবস্থা বাইরের কেউ জানে না। ঈশ্বরীতলায় সে এখন একজন কৃষি-বিশেষজ্ঞ। সবাই আসে। জানতে চায়—কী করে ব্যাঙ্কের টাকা পাওয়া যায়। কী করলে তারাও এখন অনাথের মত একত্রে চাষ চালু করতে পারে। এরকম হরেক প্রশ্ন। অনাথ তখন মনের ভেতরে বসে ব্যাঙ্কের সুদের পাহাড়টাকে দেখতে পায়।

বাজিকর মশায় এসেছিল শান্তা?

না তো।

সেই বৃষ্টির পর কোন খবর নেই লোকটার। আমার একবার যাওয়া দরকার।

যেয়ে কাজ নেই। বেশ আছো। অফিস করো। বই পড়ো। এই ভাবেই আমাদের দিন কেটে যাবে।

সুদে-আসলে তো ব্যাঙ্কের দেনা মাথা ঠেলে উঠছে শান্তা!

একদিন শোধ হয়ে যাবে দেখো'

ম্যাজিকে! শোধের কোন রাস্তা নেই শান্তা।

হবে। হবে। চিন্তা কোরো না। টিউবয়েলটা তোলাও তো তুমি। ওখান থেকেই তো অনেকগুলো টাকা পাবে তুমি। বেচে দিলেই টাকা আসবে।

ফিল্টার তো আর উঠবে না। মাটির নীচে থেকে যাবে শান্তা।

বাকীগুলো নতুন থাকতে থাকতে তুলে বেচে দাও।

আমি যে হেরে গেলাম—

হারোনি তুমি। পোকা। বিকল টিউবয়েল। তারপর আচমকা জল। যেন পর পর সাজানো ছিল। অথচ আমরা কিছু আঁচ করতে পারিনি আগে থেকে।

কত কি ভেবেছিলাম শান্তা—

লাভও তোমার কম হয়নি।

লাভ?

অনেক হয়েছে। এখন অন্ততঃ দু'শো লোককে নাম ধরে চেনো।

হ্যাঁ, তা চিনি। অন্ততঃ বিশ হাজার লোক আমায় চেনে। আমি অনেকের চোখে গল্পকথার মানুষ। কিন্তু এসব তো দক্ষিণা চক্কোত্তির কাজে লাগতো। জনতার প্রার্থী। আমি তো এলেবেলে লোক শান্তা। কেউ তো জানে না—আমি কি রকম মারটা খেয়েছি! চাষীরা কিছুটা জানে। আর জানে দু'চারজন।

জিতেওছো তুমি। কত লোক তোমায় ছাতার মত আশ্রয় ভেবে বিপদে পড়লে ছুটে আসে।

তুমি বিপদে পড়লে ওরা আশ্রয় দেবে?

আমাদের শক্তিশালী ভাবে।

আমি আত্মঘাতী হলে তোমাদের কে দেখবে?

বাজে কথা বোলো না। ভীতুর মত কথা আমি একদম ঘেন্না করি। খেতে চলো তো। শান্তা হাতের সেলাই বারান্দায় রেখেই উঠে দাঁড়ালো।

খাওয়া যখন প্রায় শেষ তখন উমার গলা পাওয়া গেল। গম্ভীর। ভারী। গাঢ়। অনাথ শুয়েই চমকে উঠলো। এ গলা তো তার চেনা। দুধ প্রায় শুকিয়ে এসেছে। উমার আন্দাজে। এখন আড়াই কিলো মত দেয়—দু'বেলায়। এ ক'মাস চাষ নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল—কোনো দিকে তাকাবার সময় পায়নি অনাথ।

উমা তখন গম্ভীর গলায় ডাকছিল, অনাথবাবু! ও অনাথবাবু! ষাঁড় আনুন।

বলাই পুকুরে কেলে হাঁড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছিল। ছুটে এলো। উমা ডাক নিয়েছে।

মুসুরির ডাল, নুন আর সরষের খোল ডলাডলি করে খাইয়ে দে। কাল সকালে দেখা যাবে।

উমা সারাটা রাত গম্ভীর মুখে অন্ধকার গোয়ালে দাঁড়িয়ে থাকলো। টুকু এখন বড়। নিয়মিত শাড়ি পরে। ক্লাস টেনের মেয়ে। সীতাকুণ্ডুর ডেলি প্যাসেঞ্জার। লিলিকে নিয়ে টুকু শুতে গেলো। শান্তা বলল, বিরজাবাবুও তো আর এখানে নেই!

কাঁহা কাঁহা মুলুকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভাখো গিয়ে।

ডাক্তারবাবুর চেক ভাঙিয়েছিলে?

পাগল নাকি! পরের টাকার দায় কে নেবে? সরকারের ঘরে আছে থাকুক। ফিরে এলে কাগজপত্র ফেরত দিয়ে দেব।

এখন থাকলে উমাকে দেখতে পারতেন।

এবার উমাকে চাকবেড়ের লেভেল ক্রসিংয়ে পাঠাবো।

সে তো পাঁচ-ছ' মাইল। এ অবস্থায় উমা এতটা হেঁটে যেতে পারবে?

খুব পারবে। বলাই যাবে। মদন বদন যাবে। পাল খাইয়ে নিয়ে ফিরবে।

উমার জোড়ের ষাঁড় আছে বুঝি?

রেলের এক পয়েন্টস্‌ম্যান্ দুটি ষাঁড় পুষেছে—

পরদিন ভোরে তিনখানা হাফ পাউণ্ডের পাঁউরুটি হাতে ওরা তিনজন রওনা হয়ে গেল। সঙ্গে উমা। পাল খাওয়ানোর দু'কিস্তি পার্বণী নগদ ছ'টা কাঁচা টাকা বলাইয়ের হাতে দিয়েছে অনাথ। উমা ক'পা যায় আর ঘাসে মুখ দেয়। মদন রাস্তার ধারের খালের জলে বুড়বুড়ি দেখলেই থামে। দু' ভাই মিলে লাফায়। নির্ঘাৎ শোল। তর্ক জোড়ে দু'জনে। বদন হয়তো বলল, না না, বোয়াল। সন্ধ্যেবেলা ডিমের খোলে জোনাকি ভরে টোপ দিলেই ধরা দেবে।

বলাই যখন উমা সমেত দু' ভাইকে নিয়ে চাকবেড়ের লেভেল ক্রসিংয়ে গিয়ে হাজির হল—তার অনেক আগেই তিনখানা পাঁউরুটি শেষ। সূর্য মাথায়। গেট বন্ধ করে দিয়ে রেলের সেই লোকটা রান্না চাপিয়েছে। মাথার ওপর বিরাট তেঁতুল গাছ। ঘন ছায়ার নীচে জায়গাটা ঠাণ্ডা। লাল রঙের রেলের ঘরের পাশেই খড়ের ছাউনিতে দুই ষাঁড় দাঁড়িয়ে। উমার কান খাড়া হয়ে উঠলো।

রেলের লোকটা দূর থেকেই হাতের তিনটে আঙুল দেখালো। মদন বলল, হবে হবে। চিন্তা কিসের। কিন্তু একটা সত্যি কথা বলতে হবে।

বল।

হিং খাওয়াও'ন তো ষাঁড় দু'টোরে?

হাবু রান্না ফেলে উঠে দাঁড়াল। কাঁচা কাঠের আঁচের সব ধোঁয়াটুকু ষাঁড় দুটোর চোখে যাচ্ছিল। নড়বার উপায় নেই। লোহার শেকলে বাঁধা। তাই চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে দু'জনেরই। নির্জন রেলের পাটি সাঁ করে ছুটে চলে গেছে। দু'পাশে বর্ষার আগের মাঠে সবে হাল পড়েছে। বাঁ হাতে একপাল শুয়োর কোনাকুনি মাঠে পার হচ্ছিল। তেঁতুলতলায় লেভেল ক্রসিং একদম ফাঁকা।

কিরে কাটলাম। ও কাজ এই হাবুরে দিয়ে হবার না।

বদন বলল, না, হয় না আবার! সেবার দক্ষিণে বাবুর গাই ছ'কিস্তি আনতে হল। তোমার হিংখোর ষাঁড়ের পাল ঝেড়ে ফেলে গাই।

তাহলে একটা টাকা বেশী করে দিও। পাল ঝাড়বে না গাই।

তবে? স্বীকার হলে তো! দুটো পয়সা বেশী নাও—বলে নাও। আপত্তি নেই। কিন্তু ষাঁড়েরে হিং খাইয়ে পয়সার লোভে বার বার হয়রান করে লাভ কি?

উমা ফিরে এল বিকেলবেলা। খুশী মনে। বেডাতে বেড়াতে। হাঁটে আর মুখ নামিয়ে ঘাস খায়।

রবিবার ভোর-ভোর অনাথ শুক্লার এক নাতির নাতিকে কাঁধে নিয়ে মাঠের পথে হাঁটা ধরলো। আগের রাতে শাস্তা যা ফিরিস্তি দিয়েছে—তাতে অন্ততঃ চল্লিশটা টাকা দরকার। লিলি টুকুর স্কুলের মাইনে। এক পালি চাল। কাঁচা বাজার। উপরন্তু ন'টাকা দশ পয়সার ইলেকট্রিক বিল। মাইনে পেতে এখনো পাঁচ দিন বাকী। কেটেকুটে মাইনেও বিশেষ পাবে না। পাম্পসেটের ধার শুধতে ছ'মাসের আগাম নিয়েছে অনাথ।

মাঝামাঝি মাঠে গিয়ে অনাথ তার বাড়ির দিকে ফিরে তাকালো। কাঁধের ওপর পাঁঠা। সে বেচারা ফাঁকা মাঠে ডেকে উঠলো। দূর থেকে নিজের বাড়িটাকে গল্পের বাড়ি দেখাচ্ছে। সাদা। নিশ্চুপ। মাঠটা উঁচু হয়ে নেমে গেছে ওদিকে।

নিজেকেই অদ্ভুত লাগলো অনাথের। সে কলকাতার কলেজের বি.এ. পাস। শহরের ঘিঞ্জি, একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে এসে ফাঁকায় গড়াগড়ি দেবে বলে ঈশ্বরীতলায় এসেছিল। এখন সাতসকালে উঠে পাঁঠা বেচতে বেরিয়েছে। বাজারে যেতে পারতো। সেখানে দর পাবে না বলে বুনোদের ওখানে যাচ্ছে। যাবে বিশ্বেশ্বরীর বাওড় পেরিয়ে। বুনোরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ার আগে পৌঁছতে হবে। ওরা জংশন স্টেশনে গিয়ে বেশী দরে মাংস বেচে। নিজেরা নাড়িভুঁড়ি রান্না করে খায়।

নিজের বাড়ির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না অনাথ। আজকাল সে জানে স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসার কোন শব্দ নেই। ভয়েরও কোন আওয়াজ নেই। এসব জিনিস মনের ভেতরে আপনাআপনি এক রকমের ঝড় তোলে। সে ঝড়ে কিছু ভেঙে পড়ে না। শুধু মাঝে মাঝে বুকে একটু-আধটু ব্যথা হয়। আকাশের নীচে ওই বাড়িটার ভেতরে সে সংসার বসিয়ে দিব্যি

কাটিয়ে যাচ্ছে। সংসারেরও আলাদা কোন শব্দ নেই। ওই জায়গাটায় সে বউ মেয়ে নিয়ে পৃথিবীর খানিকটা আঁকড়ে পড়ে আছে। অথচ বাইরে এই এত বড় আকাশ, খোলা মাঠ। বর্ষার আগের বয়ে শাকে মাঠ ভরে আছে। ভোর হতেই ডাক-ফড়িং হাজির।

বুনোপাড়া-ফেরত খালি হাতে অনাথ বাওড়ের বটতলায় এসে হাজির হল। বাজিকরের নামাজ শেষ হয়নি। অনাথকে অপেক্ষা করতে হল। সে কুঁজি আর নেই। শক্ত করে গেঁথে তোলা মাটির দেওয়াল। তাতে টালি চাপানো। ছাপানো ক্যালেণ্ডারের ছবির মতই, দূরে মদন, বদন রাতের বেলায় বসানো ছিপ তুলে তুলে দেখছে। ওরা কেন যে বড় মাছ পায় না অনেক দিন! হঠাৎ পাতায় খচমচ আওয়াজে অনাথ চমকে গেল। এতক্ষণ সে লক্ষ্যই করেনি। তার অনেক আগে আরেকজন এসে বসে আছে। বাজিকরের ভিজিটর। জগেন যাত্রা। অনাথকে দেখে চুলদাড়ির ফাঁক দিয়ে মধুর করে হাসলো।

অনাথ সে হাসিতে চমকে তাকিয়েও বুঝলো না, জগেন সেরে গেছে—না সে রকমই আছে। নামাজের পর খোলপেখানা গুটিয়ে রেখে মহম্মদ বাজিকর উঠে দাঁড়ালো। ঘর দেখলেন তো! শক্ত করে না বানিয়ে উপায় নেই। বাওড়ের জল উঠলো ডাঙায়। আমি আর কোথায় যাবো? তিন দিন গাছে। ওপর থেকে দেখি ঝাঁপি ভেসে যায়। শ্রীমান শেষে ঝাঁপি খুলে পালিয়েছে।

তাই বলে এমন পাকাপাকি ঘর বানালেন! তাহলে এখানে থিতু হচ্ছেন বলুন!

উপায় কি! এমন সুন্দর বটতলা। সন্ধ্যে সকাল সব দেখা যায়। কই গো জগেন, এসো।

জগেন যেখানে বসেছিল সেখান থেকেই বলল, মাস্টারমশাই, আজ কি আমার ছুটি?

একটুও পড়াশুনো হবে না? সারাদিন ছুটি?

দিয়ে দিন। একটা তো দিন।

তবে সাতসকালে এসে বসেছিলে কেন? খেয়েছো কিছু?

জগেন হা-হা করে হাসলো, আমি তো আজকাল হাওয়া খাচ্ছি। খুব পেট ভরে যায়। এক-একদিন ফেঁপে ওঠে। তখন বাওড়ের জল খাই—

তাহলে খাওয়াদাওয়া করে ঘুরে এসো এক দম। সারাদিনে তোমার মুখ না দেখলে সুখ পাই না।

জগেন চলে যেতে অনাথ বলল, এমন ছাত্তরটি কবে থেকে পেলেন ?

আসে। এসে বসে থাকে। দিব্যি আমার সঙ্গে ঘোরে। সাপ ধরতেও শিখিয়েছি।

বলেন কি! পাগল মানুষ। বেঘোরে প্রাণটা যাবে।

না অনাথবাবু। পাগলকে কাজ দিন, সে খুব মন দিয়ে করবে।

সাপ ধরতে পারে ?

খুব ভালো পারে। হাসতে হাসতে কথা বলে বলে ধরে। গান গাইতে গাইতেও ধরে। ওর ধরা একটি চন্দ্রবোড়া আছে, দেখবেন ?

না। থাক এখন।

বাজিকরের ঘর হাত-বিশেক দূরে। মাটির দেওয়াল। ওপরে টালি। চারদিক থেকে লতাপাতা এসে জড়িয়ে ধরেছে।—চাষ চলে গিয়ে আমাদের অনাথবাবু কাবু, কি বলেন।

অনেক দেনা ঘাড়ে। কি হবে জানি না।

দুনিয়া জানার ঝুঁকি আছে। তার সুদ লাগবেই। বুকে হাত দিয়ে বলুন —আপনি লোভ করেননি ?

বাজিকর মশায় একে আমি লোভ বলি না। ভেবেছিলাম ফলিয়ে সব শোধ করব এক মরশুমেই। বাড়তি যা থাকবে তা দিয়ে খালের ওপর ব্রিজ বানাবো। আমি খেটে জয় করতে চেয়েছিলাম।

একবার মার খেয়েছেন, আরেকবার খাটুন।

আর হয় না। সমুদ্র সরে যাওয়ার সময় এদেশের হাড়পাঁজরে নুন ফেলে গেছে। পাতালে নুন। খালের জলে নুন। কি দিয়ে লড়াই করবো বলুন তো! বর্ষায় নুন কেটে গিয়ে ভালো ধান হয়। তখন তো কেউ আমায় একত্রে চাষের জমি দেবে না। বোরো মরশুমে আবার সেই দক্ষিণভাগ পাম্পিং স্টেশন থেকে নোনা জল ছাড়তে পারে। তখন ?

আপনার কোন ক্ষতি হয়নি। এখান থেকে পৃথিবীটার দিকে তাকিয়ে দেখুন একটু। ভোরবেলাতেই কেমন রঙ ধরেছে।

অনাথের মন ভালো ছিল না। পাঁঠা বিক্রি হয়েছে সাতচল্লিশ টাকায়। চামড়ার জন্যে ধরে দিয়েছে পাঁচ সিকে। এটি শুক্লার নাতির ঘরের নাতি। ভোর-রাতে বের করে আনার সময় অনাথকে মুখ টিপে ধরতে হয়েছিল। বুড়ী ঠিক বুঝেছে। ব্যা-ব্যা করে ডেকে উঠেছিল। অনাথ শুনেছে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছো ?

অনাথ ছাগল-ঘর থেকে বেরোবার সময় বলেছে, ব্যা! তখনো শান্তা বা টুকু, লিলি কেউই ঘুম থেকে ওঠেনি। এতক্ষণে নিশ্চয় উঠে পড়েছে।

দেখতে পাচ্ছেন কিছু?

আজকাল আমার চোখে কোন রঙ আসে না।

আপনারই তো আসবে অনাথবাবু।

অনাথের চোখের সামনে বাওড়ের ছড়ানো শরীরটা পড়ে আছে। সকাল-বেলায় শান্তজলে বাতাস আছড়ে পড়ে একটু-আধটু ঢেউ তুলতে চাইছে। বাওড়ের মাঝামাঝি ডাঙা জায়গায় একটা ঝাঁকড়া বুনো গাছ। সাতসকালে আকাশ খালি করে বাওড়ের ঠিক মাথায় মাথায় মেঘগুলো জড়ো হচ্ছিল। ভোরের তেজী আলো খানিকক্ষণের জন্য মেঘলায় কালচে হয়ে এল।

অনাথ জানে, ঈশ্বরীতলায় যে কোন দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খানিক-ক্ষণের ভেতর সাইলেন্ট পিকচার দেখা যায়। দূরে উঁচু কোম্পানি বাঁধের ওপর দিয়ে নিঃশব্দ গো-গাড়ির দিগন্তযাত্রা। দুটি তালগাছের মাঝে নিঃসঙ্গ মহিষ মাথা তুলে ডাকছে। এত দূর থেকে তার গলার আওয়াজ পাওয়া যাবে না। হাটবারের ভিড় থালপোলে উঠলো। তাদের কথাবার্তা বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ফুরিয়ে গেল। এত দূর থেকে কে শুনতে পাবে?

এর একটা আলাদা রূপ আছে। সাইলেন্ট পিকচারের চরিত্রের মতই বাজিকর মশাইয়ের সাপগুলো নিজের নিজের গর্তে বিড়ে পাকিয়ে পড়ে থাকে। এরাই নিঃশব্দে আলের পর আল পেরিয়ে মৌজা পারাপার করে।

অনাথের দৃষ্টিতে বটতলার বনপথ দিয়ে দুই মূর্তি ভেসে উঠলো। ছেলেটিকে হাতের হাতঘড়িটি চিনিয়ে দিল। যৌতুক দেওয়ার সময় ব্যাও পর্যন্ত পালটায়নি মদন। বংশী কাপালি আর তার বউ ওষ্ট কাপালি।

তোমরা ভোরবেলা?

বংশীই জবাব দিল, নতুন দোকানটা দিলাম, বাজিকর মশাই আমাদের হয়ে যদি দরগায় একটু সিন্নি চড়ান—

বংশী বেশ সপ্রতিভ। দিব্যি ঘাসের ওপর বসে পড়ল। অনাথের পা বরাবর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আশীর্বাদ চাইলো। ওষ্ট কিন্তু অতটা খোলামেলা হতে পারছিল না। তাতে অনাথেরই খারাপ লাগছিল। এতদিন সংসারধর্ম করে সে এখন জানে উপকারীর সামনে উপকৃত কুঁকড়ে যায়। কৃতজ্ঞতা। লজ্জা। নানা জিনিস।

ওষ্ট, তুই এসে বস্।

অনাথ বললেও বসতে পারলো না ওষ্ট।

মহম্মদ বাজিকরের মুখে প্রসন্ন হাসি। বুক-খোলা কালো আলখাল্লার ওপর কাঁচাপাকা দাড়ি বাতাস পেয়ে উড়ছিল। দুই ভ্রূতে কয়েকটা রূপোলি তার। বংশীকে হেসে বলল, তাহলে দোকান দিলে।

দিলাম বাজিকর মশাই। কী হবে জানি না। মসলার গুণে, হাতের গুণে আমার বেগুনী, আলুর চপই দেখি এখন সব চেয়ে বেশী বিকোয়। সারাদিনে দু'পালি ব্যাসন লাগছে। আমাদের ঘটকপুকুর বাজার থেকে বিক্রিটা এখানে বেশী। অবিশ্যি লোকও অনেক বেশী এখানে।

আরও অনেক কথা বলল বংশী। বেশ খুশী-খুশী ভাব। বাজারের শেষ দিকে একখানা ঘর নিয়েছে। ওষ্ট তোলা উনুনে সেখানে রান্না করে। পথ দিয়ে গেলেই দেখা যাবে। বংশীর বড় ইচ্ছে এখানটায় কিছু জায়গা কিনে ঘর তোলে। এভাবে বিক্রিবাটা হতে থাকলে অবস্থা সে ফিরিয়ে ফেলবেই। আরও বলল, এদিকটা বেশ খোলামেলা।

অনাথ বংশীর ভেতর আগেকার অনাথকে দেখতে পেল। যে-অনাথ খোলা-মেলা খালপাড়, শান্ত বাওড়, ভেলভেট প্যাটার্নের দূর্বা ঢাকা মাঠ দেখলে খুশী হয়ে যেত।

আপনি আমাদের হয়ে একটু মানত করুন বাজিকর মশায়।

কিসের মানত বংশী? কি চাই তোমার?

আমার অবিশ্যি চাওয়ার কিছু নেই। সবাই ভালবাসে। বিশ্বাস করে। বাজারে যাওয়ার মুখে আমার কাছেই হাতের বোঝা জমা রেখে যায় লোকে। বাড়ির গিন্নীরা ছোকরা চাকর পাঠিয়ে বিকেলের জলখাবারের চপ, পেঁয়াজি নিয়ে যান। এখনই শুনছি লোকে বলে, বংশীর পেঁয়াজি, বংশীর আলুর চপ। ভগবানের দয়া না থাকলে এত তাড়াতাড়ি এটা হয়?

আমিও তো তাই বলছি। তোমার কি চাই? কি নেই তোমার?

তা তো ভেবে পাচ্ছি নে।

তবে এতটা পথ এলে কেন? কী মানসিক দেবে তা ঠিক করে আসোনি?

ওষ্ট এইবার কথা বলল, বড়দা কি ছাড়া পাবে না?

বংশী বলল, অন্ততঃ জামিন?

অনাথ বুঝতে পারছিল না কোন্ দিকে যাবে। চুরির শোকে জগেন যাত্রা

এখন জগেন পাগল। এদিকে ভদ্রেশ্বর যাই করুক—করেছে বোনের বিয়ের জন্যে। আসল ডাকাত সন্তোষ টাকিও কি আর ক্রিমিনাল এখন। বোঝা ভার। দক্ষিণা চক্কোত্তির বাড়িতে থেকে থেকে লোকটা এখন বদলে গেছে। ধুতি শার্ট পরে। শাস্তার সঙ্গে বাওড়ে নাইতে গিয়ে যে অবস্থায় অনাথ ওকে পেয়েছিল।

ঈশ্বরীতলা আর সীতাকুণ্ড স্টেশনের মাঝামাঝি মাঠের ভেতর দিয়ে পায়ে চলতি অনেক পথ চলে গিয়েছে নানান গাঁয়ে। উত্তর-দক্ষিণে। সন্তোষ কিছু-কাল হল জুতো পায়ে দিচ্ছে। লোকে আপনি আজ্ঞেও বলছে। ঝিনির জন্য কিছু গাঠি কচু তুলে নিয়ে যাবে মাঠ থেকে। জ্বর থেকে উঠে ভীষণ অরুচি মেয়েটার।

এখন ভোটটা হলেই বাঁচে সন্তোষ। দু'দুবার পিছিয়ে এবারে পাকা তারিখ বলেছে রেডিও। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটের জন্য ধর্না আর ভালো লাগে না সন্তোষের। তার চেয়ে এই মাঠেই কোথাও যদি ঘর বেঁধে সংসারী হতে পারতো। বেলা চারটে হবে। ফাগুন মাসের মেঠো বাতাসে ছোট ছোট গাছ-পালা শুয়ে পড়ে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। ঝিনির জন্যে একখানা লালপেড়ে শাড়ি কিনেছে সন্তোষ। দেবার সুযোগ পাচ্ছে না। দুপুরবেলা একা একা মাছ ধরে মেয়েটা। ছিপ ফেলে বসে থাকে ঘাটলায়। তখন গাঠি কচু আর শাড়ি নিয়ে হাজির হবে সন্তোষ। তাই ঠিক করেছে। একদম চমকে যাবে ঝিনি। খোঁপা ভেঙে ফেলে উঠে দাঁড়াবে মেয়েটা।

হাঁটতে হাঁটতে সন্তোষ দেখলো সে বিশ্বেশ্বরীর পয়োস্তি জমিতে এসে পড়েছে। ওই তো দক্ষিণা চক্কোত্তির ভাগে দেওয়া সবজি চাষের জায়গা। অনেকখানি জুড়ে সবুজ হয়ে আছে। এলাকাটা ফাঁকা। চাষীদের ঘর না বলে কুঁড়ি বলাই ভালো। নিকোনো উঠোন। লাউমাচা। তাতে বীজ রাখার হলদে বুড়ো লাউ।

অনেকদিন এদিকে আসেনি। ঢেঁড়স, কাঁচালঙ্কার সারি পেরিয়ে বউমতো একজনকে বলল, তোমাদের হাতদাখানা একটু দেবে। কচু খুঁড়বো।

দা নিয়ে আসছিল বউটি, বাড়ির উঠোনের ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসছিল, কেন যেন থেমে গেল। সন্তোষ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বর্ষায় ছড়িয়ে পড়া দানা থেকে আপনাআপনি মৌরীচারা ঠেলে উঠেছিল। সময় পেরিয়ে

গিয়ে তাতে এখন ফুল আসছে। কবে আর ফল দেবে!

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে তার চারদিকে একটা জটলা। কেউ কেউ মাঠে কাজ করছিল। একজনের হাতে লাঙল থেকে খুলে আনা ধারালো ফলা।

একজন দশাসই গুঁফো লোক এগিয়ে আসতেই সন্তোষ হেসে ফেলল, কি খবর পালান?

সন্তোষ বুঝে উঠতে পারছিল না কি হতে যাচ্ছে। লোকটার নাম পালান সর্দার তার মনে আছে। একবার দক্ষিণা চক্কোত্তির কাছে এক বিড়ে পুঁইশাক নিয়ে দেখা করতে এসেছিল। ভারী গলায় কথা বলে লোকটা। ভীতু ধরনের।

এখন কিন্তু তা মনে হল না। পালান গম্ভীর মুখে এগিয়ে এসে বলল, ও সম্বন্ধী, নতুন প্রজাপত্তন দিয়ে আমাদের ওঠাবার মতলবে আছো! ও ভবেন, ডানদিক দাঁড়া।

সন্তোষ ঘচ্ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। হাতে কিছু নেই তার। দূরে বিকেলের আকাশ কালচে মেরে গেল।

পালানদা, একটা কথা শোনো আগে। আমি গাঠি কচুর সন্ধানে—

ওসব কথা যাত্রা দলে গেয়ে বোলো। এবার যদি সুমুন্দী বেঁচে ফেরো তবে—

প্রথম ধাক্কাটা এসে তলপেটে লাগলো। লাঙলের ঈষখানা সেখানে তার ভোতাপানা লাগলো। সারাটা পেট এখন তার মাথা ময়দা। দু'হাতে চেপে ধরে সন্তোষ ছুটতে গেল।

পালানের পাশের অল্পবয়সী ছোকরাটি চেঁচিয়ে উঠলো, যেতে দিসনি!

পালান সর্দার বেশ নিরুদ্বেগ। সন্তোষ পরিষ্কার দেখলো, সে জায়গায় দাঁড়িয়ে বলছে, যেতে দে না এখন। কদ্দূর যাবে!

তারপর ফাঁকা মাঠের ভেতর বিকেলের পাতলা আলোয় দূরে দূরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পয়োস্তি জমির ভাগচাষীরা একটা নতুন খেলা খেলে ফেললো। অজান্তেই। প্রায় নিঃশব্দে।

সন্তোষ টলতে টলতে যেদিকেই ছুটতে যায় অমনি গদাম করে চাষীদের যতীন কিংবা ভবেন নয়তো ষষ্ঠী নায়েক কোদালের হাতল বা হাতদা যা পায় তাই দিয়েই সন্তোষের গায়ে হাতসুখ করে।

ততক্ষণে ধুতির খোট লাল হয়ে গেছে সন্তোষের। পায়ের কেদিশ

জুতোতেও লাল ছোপ। ঘাড়ের কাছে পিঠের চ্যাটালো মাংসতে একখানা লোহার আঁচড়া গেঁথে বসে গেছে। মাথার খুলি দিয়েও রক্ত গড়াচ্ছে।

সন্তোষ পরিষ্কার বুঝলো, তার কাঁধের জায়গাটা ফাঁক হয়ে হু-হু করে বাতাস ঢুকছে সেখানে। দূরের আকাশ উড়ন্ত পাখিসুদ্ধ তার চোখের কানাতে চলকে ছিটকে উঠলো।

যে বউটি হাতদা নিয়ে উঠোন থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি—সম্ভবতঃ ঘরের লোকজন সন্তোষ টাকিকে দেখেই তৈরি হতে হতে বউটিকে বেরোতে নিষেধ করেছিল—সে তখনো ভেতর-উঠোনে ফিরেও যেতে পারেনি। দাওয়ার তাল খুঁটি ধরে শিউরে শিউরে এ দৃশ্যের সবখানি সে এতক্ষণ নিঃশব্দে দেখছিল। এবার বউটি জায়গায় দাঁড়িয়ে খুঁটিতে মাথা দিয়ে হু-হু করে কেঁদে উঠলো। সন্তোষ টাকি তার হাঁটু থেকে মচ করে ভেঙে পড়ে গেল। তখন দ্বাবিকপেতা, চন্দনেশ্বর, থাড়ুপাতাল, ঈশ্বরীতলা মৌজার ওপর দিয়ে সন্ধ্যের বাতাস সমানে বয়ে যাচ্ছিল।

উমা পাল ঝেড়ে ফেলেছে। শেষরাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে টের পেল অনাথ। উমা পরিষ্কার থমথমে গলায় ডাকছে। অনাথবাবু, ও অনাথবাবু, ষাঁড় আনুন।

খুব তেতো মুখ নিয়েই বিছানা ছাড়লো অনাথ। টাকার লোভে চাকবেড়ে স্টেশনের হাবু পয়েন্টসম্যান এ কাণ্ডটা করতে গেল কেন? হিং খাইয়ে খাইয়ে ষাঁড় দুটোকে নিষ্ফলা করে রাখে। এখন তার কৈফিয়ৎ পোহাতে হবে অনাথকেই। এখন উমার যোগ্য ষাঁড়ের সন্ধান পায় কোথায়? বিরজা ডাক্তার থাকলে তবু একটা কথা ছিল। তিনি বেপাত্তা। তাঁর জায়গায় নতুন লোকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আজ দু'বছরের ওপর ঝুলে আছে।

সকালবেলা কার ভাল লাগে ষাঁড়ের খোঁজে মাঠে মাঠে ঘুরতে!

মদন খবর দিল, হ্যাঁ, একটা ষাঁড় আছে বটে সীতাকুণ্ডুর নস্করদের হেফাজতে। রোজ সকালে স্টেশনের পানের দোকানে রেডিওর খবর শুনতে আসবে সময়মত। টাইমের কোন হেরফের নেই। শুকনো বিড়িপাতা, বাসি খবরের কাগজেও কোন অরুচি নেই।

বদন বলল, মিশন মঠে গুরু ট্রেনিং স্কুলে তিনটি এই কেঁদো কেঁদো বিদেশী ষাঁড় আছে। পিঠ একদম লেবেল। লোহার চেনে বাঁধা থাকে সর্বসময়।

মহারাজদের বলে গাই নিয়ে যাওয়া যায়। যে সে ষাঁড় নয়। তেমন তেমন গাই ওনাদের তিনজনকে দেখলে কুঁজো হয়ে যায়।

মিশন মঠ এখান থেকে পাক্কা সাত মাইল রাস্তা। ঘরে-পাতা দইয়ের সঙ্গে চিঁড়ে ভিজিয়ে দিল শান্তা। মদন বদনকে নিয়ে রওনা হওয়ার মুখে শান্তা ডাকলো।

খুব নীচু গলায় বলল, রিনি এসেছিল।

কে রিনি?

আহা, আকাশ থেকে পড়লে! দক্ষিণাবাবুর মেয়ে রিনি। একবার তোমায় জংশন স্টেশনের থানা হয়ে যেতে বলেছে। সন্তোষ টাকির ডেড বডি পুলিস মর্গ থেকে নিয়ে পুলিসের লোকই পোড়াবে। ও বড় কাকুতি-মিনতি করে বলে গেছে—

কি?

উমার একটা ব্যবস্থা করে তুমি যদি একবার ওখানে যাও—

গিয়ে?

বেওয়ারিশ বডি। সন্তোষের তো কেউ নেই। তুমি যদি নিজে দাঁড়িয়ে থাকো দাহ করার সময়, তাহলে অভাগা মেয়েটার মনে শান্তি হয়। সেজন্যে এই পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে গেছে তোমাকে দিতে—

দাহ বোধ হয় হয়ে গেছে। তিনদিন হলো না!

যদি না হয়ে থাকে? রিনির চোখের দৃষ্টি পাগল-পাগল। কাঁদতে কাঁদতে ফুলে গেছে।

অনাথ কোন কথা বলতে পারলো না। টাকাটা পকেটে রাখলো। টুকু সবে পড়তে বসেছে। এখনো লিলি ঘুম থেকে ওঠেইনি।

উমাকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একদিন দুপুরের কথা বার বার মনে আসতে লাগলো অনাথের। সে আর শান্তা বাওড়ে চান করতে গিয়েছিল। সেদিন।

রিনির মুখে হাসি ছিল। ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জা ছিল। ভয় ছিল। অনাথ বলেই ফেলেছিল, বাঁদরের গলায় সোনার হার! দক্ষিণা চক্কোত্তির ওপর বার বার রাগ হচ্ছিল। ভোট ভোট করেই লোকটা গেল। ঘরে যে বিয়ের দিন পেরিয়ে গেল তিনটে মেয়ের সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। আস্তিকালের এক মোটরগাড়িতে চড়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ভোট ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে বক্তৃতা!

ইদানীং সন্তোষের পরিবর্তনও অনাথের চোখে পড়েছিল।

॥ পনেরো ॥

খালে চরতে গিয়ে তিনটি পাতিহাঁস উধাও। ঘরে ফেরেনি। বলাই বলল, ভাম কিংবা খটাসের কাণ্ড। ইটখোলার বাতিল পাঁজায় গর্ত করে ওরা বাস করে। চরতে চরতে হাঁসগুলো অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে ওরা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খালের কিনারে কিনারে বড় ঘাসের ভেতর লুকিয়ে থেকে ফলো করে।

বিকেলবেলা লাল বারান্দায় বসে চিঠি পড়ছিল অনাথ। বলাইকে বলল, কি আর করবি। যে ক'টা ফিরলো সে ক'টাকেই ঘরে তোল।

সন্ধ্যের মুখে মুখে টুকু কোম্পানি বাঁধে বেড়াতে গেল। শাড়ি পরছে কিছুকাল। অনাথের নজর এড়ায়নি। মুখখানা কিছুদিন গম্ভীর মেয়েটার। সেই আগেকার টুকু আর নেই। জোড়া বেণী বাঁধা মেয়েটা খালপাড়ে উঠে গেল। সারাদিন পড়ে। সামনে ফাইনাল।

অনাথ চোখ থেকে চশমা খুলে ইজিচেয়ারের হাতলে রাখলো। চশমার খাপের নীচে রাখলো চিঠিখানা। ব্যাঙ্কের চিঠি।

ওরা রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়েছে। ইংরাজিতে টাইপ করে।

'প্রিয় মিস্টার বসু,

আপনার কথামত ঈশ্বরীতলার কোম্পানি বাঁধের গায়ে ধানচাষে আমরা শর্টটার্ম ও লংটার্ম লোন দিয়েছিলাম। তার ভেতর—টাকা আপনি শোধ দিয়েছেন। —বাকী। কথা ছিল ধান উঠলেই ক্রপ-লোন আপনি ফেরত দিয়ে দেবেন। সবটা আপনি এখনো দেননি। পাম্পসেট ও টিউবয়েলের টার্ম লোনের কিস্তি আপনি যৎসামান্যই দিয়েছেন।

এ অবস্থায় আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, বিঘা প্রতি আপনার ফলন বেশ ভালো হওয়ারই কথা—আমরা দেখে এসেছি। আমাদের ফিল্ড অফিসারও সেরকমই রিপোর্ট দিয়েছিলেন। সেই অনুপাতে আপনি কিন্তু লোন রিপে করেননি। অতএব আপনাকে সুদসমেত শর্টটার্ম লোন অবিলম্বে রিপেমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে।

অনাথ আর মনে করতে পারলো না চিঠির কথা। হিজিবিজি যুক্তিহীন একগাদা কথা লিখেছে। চোখের সামনে কোম্পানি বাঁধ অন্ধকার হয়ে এল। দিনের তাপ বেড়েছে। রীতিমত গরম। অথচ মাঝরাতে চাদর টেনে গায়ে দিতে হয়। নয়তো শীত-শীত করে। কে ওদের বোঝাবে ধানচাষ সেলাই

কল নয়! ধানে পোকা লাগে। খরা আছে। বানভাসি আছে। ঠাণ্ডা ব্যাঙ্ক-বাড়ির ভেতরে বসে সুদ কষা যায়, ধান কিন্তু সে নিয়মে চলে না। তিন হপ্তার ভেতর এই নিয়ে ব্যাঙ্কের এ হল চার নম্বর চিঠি।

একবার ইচ্ছে হল আলো জ্বেলে ব্যাঙ্কের চিঠিখানা আরেকবার পড়ে। আলোর সুইচ দূরে। উঠতে হবে তাহলে। অনাথ চুপ করেই বসে থাকলো চেয়ারে।

গোয়ালের মুখে দাঁড়িয়ে বলাই উমাকে বকছিল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল, বেয়াড়াপানা ছাড়ো এবারে। এর চেয়ে ছোট করে খড় কাটা যায় না। এখন এই খেয়ে নাও বাবু। কাল সকালেই চাট্টিখানি কুচো করে কেটে রাখবো এখন।

অনাথ ক'দিনই উমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখছে। তাতে ঘন রহস্য ছায়া। দু'চোখেই গাঢ় কাজলের টান। চোখাচুখি হয়ে গেলে উমা এমন করে তাকায়! চোখে কৃতজ্ঞের দৃষ্টি!

এই ঈশ্বরীতলায় এসে অনাথ তার জীবন পাল্টে ফেলেছিল। ছোট্ট একটু জায়গা কিনে সেখানেই ডোবা কাটিয়ে তোলা মাটিতে ইট কাটিয়েছিল? লাখ-গঞ্জের পাঁজার ইট। শান্তা এখানকারই ভাড়াবাড়ি থেকে দিনে দু'বার এসে মিস্ত্রিদের কাজ দেখতো। ভিত ভরাটের মাটি না পেয়ে দিন-পনেরো পিছিয়ে গিয়েছিল কাজ। তখন লিলি বলাইয়ের কাঁধে চড়ে বাজার যেতো। 'ল' বলতে পারতো না। বলতো—'ন'

পাঁজা ভেঙে ইট গাছি দেওয়ার সময় পাঁজার ছাই গুছিয়ে রেখেছিল অনাথ। লোক করে। সেই ছাই চুনের সঙ্গে মেখে সাতদিন ধরে পচানোর পর গাঁথুনির মসলা হয়ে গেল। দরজা-জানলা পর্যন্ত গেঁথে নিয়ে অনাথ টানা লিনটেল করেনি। কাটা লিনটেল করে খরচ কমিয়েছে। গৃহপ্রবেশের দিন মিস্ত্রীদের মিষ্টির দোকান থেকে সাত ভাঁড় দই এসেছিল। সারাটা বাড়িই ফাঁকা লাগলো অনাথের। দক্ষিণের কোণের ঘরে শান্তা খুটখাট কি করছে। কোন ব্যাপারেই ওর কোন উদ্বেগ নেই। কোন প্রশ্ন করে না অনাথকে। টিউবয়েলের পাইপ, মোটর, পাম্পসেট ঘরে তুলে আনবার জন্যে ঈশ্বরীতলার একমেব হার্ডওয়্যার মারচেন্ট বিশ্বপতিকে খবর দিয়েছে। এসব কাজ এত নিখুঁতভাবে একা একা করে ফেলে শান্তা! বাইরের কেউ দেখলে অবাক্ হবে।

লিলি নিশ্চয় বিকেলে স্কুল থেকে এসে কলা দিয়ে খুব করে দুধ-ভাত খেয়েছে।

এখন অবশ হয়ে ঘুমোচ্ছে। উঠিয়ে পড়তে না বসালে সেই কাল সকালে একেবারে বিছানা থেকে উঠবে।

টুকু একা কোম্পানি বাঁধের কিনারায় বসেছিল। আর এক হাত নীচেই খালের জল। আগে এখানে কেউ বসতো না। তার বাবা অনাথবন্ধু বসু মদন বদনকে দিয়ে সাতদিন ধরে এসব জায়গা পরিষ্কার করে বসবার মত করেছে। বাবার হাতে পয়সা থাকলেই এসব কাজ করে বেড়ায়। লোকে ঘুরতে এলে যাতে নিরাপদে বসতে পারে সেজন্যে ঘরের পয়সা এভাবে কেউ অপচয় করে ? মা তো প্রায়ই খোঁটা দেয় বাবাকে ! মায়ের দিকে না গিয়ে এসব সময় টুকু তার বাবা কই সাপোর্ট করে। বাবাটা না আসলে—

অন্য অনেক কথা ভাববার চেষ্টা করেও টুকু রেহাই পেল না। সেই এক চিন্তা ; সেই এক সাবজেক্ট। আজ ক'দিন ধরেই তার মনের ভেতর চেপে বসে আছে। বিদ্যেধরী আর নেই। তার বুকে জেগে ওঠা এক সময়কার চর এখন মরা নদীর বুক। তার লাগোয়া টানা লম্বা মাঠ জুড়ে সবজির চাষ। সে চাষ চরেও ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে সন্তোষ টাকি—সন্তোষদাকে বিকেলবেলা—ফাঁকা মাঠে—

আবার জল এসে গেল টুকুর চোখে।

প্রথম প্রথম সবার সঙ্গে সেও লোকটাকে খারাপ বলে জানতো। নানা কথা শুনেছে। ডাকাতি, চুরি, গুণ্ডামি। কোন গুণের ঘাট ছিল না নাকি সন্তোষদার। কিন্তু এই তো গত বছর ট্রেনে সন্তোষদা না থাকলে কী যে হতো। বিকাশ তো মার খেয়ে খেয়ে মরে যাচ্ছিল।

টুকু চোখ মুছে সন্ধ্যার অন্ধকারে বসেছিল। পাশে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো—বিকাশ এসে দাঁড়িয়েছে। আজকাল সব সময় ধুতি-পাঞ্জাবি পরে।

কখন এসেছো ?

টুকু কোন জবাব দিল না। বিকাশ প্রায়ই গার্জেনের গলায় তাকে প্রশ্ন করে। যেন তার ছদ্মবেশী অভিভাবক। অন্য সময় হাসি এসে যায় টুকুর। আজ এলো না। দু'এক সময় বিকাশের অমন গলা তার ভালোও লাগে।

বিকাশ জলের দিকে নতমুখী টুকুর গালে পথচলতি রিকশার আলোয় জলের ফোঁটা দেখতে পেয়েই পাশে বসে পড়লো, কেঁদে কি লাভ টুকু !

কেন মারলো ? কে। মারলো সন্তোষদাকে ?

দু'চারজন ধরা পড়বে শেষ অব্দি। একজনকে পুলিস নিয়ে গেছে। কিন্তু

ওদের আর দোষ কি—

চোখ মুছে তাকালো টুকু, পটল চাষীদের তবে ধরবে কেন ?

ধরার কারণ আছে। ওরাই হয়তো খুন করেছে—

তবে যে বললে ওদের আর দোষ কি !

দোষ তো টুকু আসলে অন্য লোকের—

কার ?

শুনতে চাও ? দক্ষিণা চক্রবর্তীর। আমার বাবার। জনতার প্রার্থী ! আমি সব জানি টুকু। সন্তোষদার সঙ্গে বসে শলাপরামর্শ করতো। পাবলিসিটির টাকা আসবে কোত্থেকে ? চরের ভাগচাষীদের তুলে দিয়ে সেখানে নতুন করে প্রজাপত্তন দিলেই টাকা। বাবার লোভের দাম দিল সন্তোষদা।

ছিঃ ! হাজার হোক তোমার বাবা হন তিনি।

তা হোগ্ গিয়ে। আই উইল অলওয়েজ কল স্পেড এ স্পেড !

এ কথার মানে কি বিকাশদা ?

ও আমি বলতে চাইছি—অন্যায়কে সর্বদাই অন্যায় বলে চিনতে বিকাশ চক্রবর্তীর ভুল হয় না। জর্জ দি থার্ড পড়াবার সময় জে এন. 'স. কথাটা বলে-ছিলেন !

জে. এন. সি. !

ও, তুমি তো তাও জানো না টুকু। তোমার দোষ কি। কলেজে স্যারের নাম শর্টে বলে। প্রফেসর জ্যোতিনাথ চাকি। কি সুন্দর প্রোনানসিয়েসন ! ডায়াসে দাঁড়িয়ে পড়াবার সময় বাঁ হাতে থাকে সেক্সপীয়র—

সে তো একজন কবি, তাই না বিকাশদা ?

কবি তো বটেই। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার।

কলেজে শুনেছি প্রত্যেক ক্লাসে রোলকল হয় ?

হ্যাঁ। তাই দিয়ে পারসেন্টেজ ঠিক হয়। তুমি তো শীগগিরি কলেজে পড়বে—

টুকুর চোখের সামনে বিকাশ পালটে গেছে ক'বছরে। বছর দুই আগেও বিকাশদা হাফপ্যান্ট পরতো। এখন কেমন একটা ড্যাম কেয়ার ভাব সব সময় ! দু'এক কথার পর ইংরাজি চলে আসে। ঈশ্বরীতলার সঙ্গে কোন মিলই নেই।

সন্তোষদা একদিন আমাদের খুব বাঁচিয়েছিল।

হ্যাঁ টুকু। একদম দেবদূতের মত হাজির হয়েছিল এসে। আবার কাঁদছো ?

টুকু জলের দিকে তাকিয়েছিল। আস্তে বলল, ওর জন্যে কাঁদবার কেউ নেই।

সকালে উঠেই শান্তা দেওয়াল থেকে ছবি পেড়ে পেড়ে ঝুল-ময়লা ঝাড়ছিল। এক ফাঁকে অনাথকে চা দিয়ে গেল। টুকু সবার আগে উঠে পুকুরের দিককার বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে পড়তে বসেছে। লিলির উঠতে এখনো অনেক দেরি।

চা, বাথরুম সেরে অনাথ সবে তাড়ির ঝাঁপা নিয়ে বসেছে, এমন সময় ধুলোমাখা একখানা ফটো দেওয়াল থেকে পেড়ে শান্তা দেখাতে আনলো।

ঈশ্বরীতলায় সকালবেলার এই মাঠে চারদিকের গাছপালা ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপে। তার ভেতর অনাথের বাড়টা ছবির মত। সবে তিন গ্রাস হয়েছে অনাথের। সাতসকালেই নানান দলের মিছিল বেরিয়ে পড়েছে স্টেশনবাজারের রাস্তায়। এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে—ভোট ফর—ভোট ফর—

দ্যাখো চিনতে পারো কিনা।

শান্তার হাত থেকে ছবিখানা তুলে নিল অনাথ। এই তো সেদিনকার ছবি। খুব আস্তে অনাথ বলল, ছবির অনেকেই এখন এখানে নেই।

শান্তা চুপ করে থাকলো।

আরেক গ্রাস চোঁ চোঁ করে শেষ করে দিল অনাথ। ছবিতে বলাই বাবার পাশে দাঁড়িয়ে। বাবার চোখ ক্যামেরার দিকে। অরুণ বরুণ বানভাসিতে ভেসে গেল। কানাই বিক্রি হয়ে গেছে। ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ডে মুরগিরা পায়চারি করছে। তারা একজনও আর নেই।

ফটোখানা ধরিয়ে দিয়ে শান্তা বড় ঘরে ঝুল ঝাড়ছিল। অনাথ মন দিয়ে ছবির অনাথকে দেখছিল। শান্তা ঘর থেকেই বলল, বলাইকে সকাল সকাল বাজারে পাঠাও। টুকুর উইকলি পরীক্ষা আছে।

অনাথের মনে পড়লো, হাতে তো একটাও টাকা নেই। নিজের যা খুদ-কুড়ো ছিল তাও চাষে গেছে। ও বলাই, বলাই—

আমি বাজার যাবো না।

যা বাবা। আজকের দিনটা যা। আজই অফিসে কিছু টাকা পাবো। টিউবয়েলটা পাইপসুদ্ধ মাটি থেকে ওঠালে কিছু টাকা আসবে বিক্রি করে—

শান্তা বড় ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হাতে ঝাড়ন।—টিউবয়েল বিক্রির টাকা ব্যাঙ্কে যাবে। ও টাকায় আমি হাত দিতে দেব না। বাড়ি মর্টগেজ আছে, মনে আছে?

সব মনে আছে শান্তা। আরেক গ্রাস নিল অনাথ। খুচ খুচ করে এ দেনা কোনদিন শোধ হবার নয়। বছর বছর যে সুদের পাহাড় ঠেলে উঠছে। যা

শোধ করবে তাই খেয়ে নেবে সুদে।

তাহলে কি আমাদের বাড়ি ছাড়ানো যাবে না কোনদিন ?

আমার তো মনে হয় না শান্তা।

তাহলে আবার চাষ করো। বেশী করে ফলাও।

ফলিয়েও লাভ নেই। মজুরি, সারের দাম দিয়ে ধানের দর পাওয়া যাবে না। এবার দেখলে না ? ধানের কেজি সত্তর পয়সা। সারের কেজি প্রায় দু' টাকা।

তাহলে লোকে চাষ করছে কি করে ?

নিজে গায়েগতরে খাটলে তবে উসুল হবে। নয়তো নয়।

তাহলে চেষ্টা করো। বসে বসে তাড়ি খেয়ো না। সেই সময়টায় কিছু করো।

অনাথ দেখতে পেল, শান্তার মুখখানা কুঁচকে গেছে। নাকের দু'ধার দিয়ে বয়সের দাগ, পরিশ্রমের চাপ, চিন্তার ছাপ দুটি মোটা দাগ হয়ে নেমেছে। এই বাড়ি তোলার সময় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লরি থেকে ছাদ ঢালাইয়ের লোহা নামিয়েছে। মিস্ত্রীদের কাছ থেকে হিসেব নিয়েছে। এখন তো ও সুদের জাল কেটে বেরোবার পথ খুঁজবেই। অনাথ নিজেও বেরোতে চায়। কিন্তু টাকার অঙ্কটা অ্যাতোই বড যে একদম ভরসা হয় না। তাই মনে হয় তার চেয়ে বরং যা চলছে তাই হতে দেওয়াই ভালো।

বলাই ব্যাগ হাতে বেরিয়ে এসে বললো, আমায় আর বাজারে পাঠিও না বাবু। নগদ পয়সা না দিলে কেউ আর ধারে জিনিস দিতে চায় না। সবাই বলে, তোদের বাবুর কি হল রে ! আমি মুখ তুলে তাকাতে পারি না।

আজকের দিনটা করে দে। কাল থেকে তো নগদ পয়সায় বাজার হবে।

বাজারে বেরোবার সময় শান্তা দরকারী জিনিসের কথাগুলো বলে বলাইকে বললো, চাল তো নেই বাবা। তোর মায়ের কাছ থেকে এক পালি ধার নিয়ে আসিস। কালই সব দাম চুকিয়ে দেব।

বাজারে বেরোবার আগে বলাই দু'বার লিলিকে ডাকলো। ও ছোড়'দি, বাজারে যাবে নাকি ? আজকাল লিলিকে ছোড়দি বলে ডাকে। লিলি বিশেষ পাত্তা দিল না। সে এখন বড মেয়ে। বলল, তুই একা একা যা বলাইদা।

এই বলাইয়ের কাঁধে চড়ে সে একসময় বাজারে যেতো। সেকথা শুনেছে লিলি। তার কিন্তু মনে নেই।

বলাই আবার বলল, যাবে নাকি ছোড়দি! তোমায় লাল কাগজ কিনে দেব। শিকলি বানাবে।

তুই যা তো। আমার স্কুল আছে না।

শেয়ালদা থেকে পাঁচটা কুড়ির ট্রেন এসে সীতাকুণ্ডুর দিকে চলে গেল। কোম্পানি বাঁধে রোজকার মত আবার বিকেল এল। টুকু জোড়া বেণী বেঁধে খালপাড়ে পায়চারি করছে। দু'দিন বারণ করেছে শান্তা। ওভাবে একা একা খালপাড়ে বেড়াতে নেই। তুমি বড় হয়ে উঠছো টুকু। এখন তোমার সময়-অসময়ে বেরোনো ঠিক নয়।

বড় হয়ে ওঠা মানে কি মা?

হাসিমুখ এই নতুন কিশোরীকে শান্তার এখনই সব বলতে ইচ্ছে করেনি। বলে লাভ কি। আহা রে, ছোটবেলাটা ফুরিয়ে ফেললো। আর পাবে না। মুখে বলে, যাও ঘুরে এসো। তাড়াতাড়ি ফিরবে কিন্তু।

যাবো আর আসবো মা।

লিলি স্কুল থেকে ফিরে এক কাতে শুয়ে ছোটদের মোটামত একখানা পুজোবার্ষিকী পড়ছিল। সারা দুপুর আজ একটুও শুতে পারেনি শান্তা। বিশ্বপ তর হার্ডওয়ারের দোকানের লোকজন এসে হইহই করে মাটির নীচে থেকে টিউবয়েলের বারোখানা পাইপ তুলছে। এক-একখানা চার ইঞ্চি মোটা। সেগুলো এখন হরিতকিতলায় শোয়ানো। এমনই এক বিকেলে মৌমাছির ঝাঁক নেমে এসে ওই গাছতলায় বজ্জাতকে মুহূর্তে হলদে ঝাঁঝরা করে ফেলেছিল। একটা চোখ খুবলে যায় বেড়ালটার। ভীষণ ভয় করতে লাগলো শান্তার—ও বলাই, বলাই!

ডাকতেই বেরিয়ে এল বলাই। কাঁধে গামছা। হাতে পুঁটুলি।

কোথায় যাচ্ছিস?

আমি চলে যাচ্ছি।

কোথায় রে? বলেও ধচ্ করে উঠলো শান্তার ভেতরটা। বলাই এ বাড়ি এসেছিল খোকাটি। এখন গোঁফের রেখা পড়েছে।

একেবারে—

তার মানে?

শান্তার চোখের সামনে বিকেলের সবখানি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো।

বলাই চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না। মাথা নীচু করে বলল, তোমাদের কষ্ট আমি দেখতে পারিনে। বাবু যে কেন চাষে নামলো!

সে আমরা বুঝবো। তুই কোথায় যাচ্ছিস?

রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে যোগাড় দেব।

ইট বইতে পারবি? মাজা ভেঙে যাবে।

শিখে নেব।

উমাকে দেখবে কে?

দেখার কিছু নেই। চাট্টি খেতে দিলেই হবে।

বাবুকে বলে যাবি নে?

তার সামনে যাবো না।

তোর তিন মাসের মাইনে বাকী—চার পালি চালের দাম পাবি—

মা এসে নিয়ে যাবে।

না গেলে হয় না বলাই। এখন না-ই গেলি। ভর সন্ধ্যেবেলা আমি একা থাকবো?

আর অন্য সময় যাওয়া যাবে না।

তবে যা। আসিস মাঝে মাঝে। লিলি জানলে কিন্তু কাঁদবে খুব।

এখন বোলোনি। বোলো গোরুর পালার বায়না পেয়ে বাইরে গেছি।

মিথ্যে কথা বলতে পারবো না বলাই।

তবে যা ইচ্ছে বলে দিও। আমি চললাম।

হনহন করে বলাই চলে গেল। শান্তা শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো। পুকুরপাড়ে এক কাঁড়ি বাসন ভেজানো আছে। নিশ্চয় মেজে রেখে গেছে। শান্তার মনে হল, কিশোর-কিশোরীরা বড় নিষ্ঠুর হয়।

অনেক ভেবে ভেবে একখানা চিরকুট পাঠালো অনাথ। ব্যাঙ্কের সুদের কিস্তির তাগাদা এসেছে। চোখ বুজে থাকার উপায় নেই। চিরকুটখানা বংশীকে পাঠালো। লিলির হাত দিয়ে। স্কুলে যাবার পথে দিয়ে যাবে।

বংশীর তেলেভাজার দোকান এখন সাইড-বিজনেস। বছর না ঘুরতেই সে এখন হোলসেলের দোকান দিয়েছে। পাকা বাড়িতে উঠে গিয়ে সাইনবোর্ড টাঙাতে হয়েছে। কাপালি স্টোর্স। লোকে তবু তাকে বংশী তেলেভাজা বলেই ডাকে। তাতে আপত্তি নেই কোন ছেলেটার। সব সময় হাসিমুখ। সাবান

কোম্পানি, সিগারেট কোম্পানি, তেল কোম্পানির ভ্যান এসে দাঁড়ায় দোকানের সামনে। গলায় টাইবাঁধা বাবুরা তাকে মিস্টার কাপালি বলে। মোকামে মাল ওঠার সময় তাদের চা এগিয়ে দেয় দোকানের কাজের লোকজনরা।

লিলিকে দেখে বংশী এগিয়ে এসেছিল, কি চাই? পেনসিল? রবার?

না। বাবা এই চিঠিখানা দিয়েছে।

কাগজখানা হাতে নিয়ে দেখার ফুরসৎ হয়নি বংশীর। বেলায় দোকান বন্ধ করে বাড়িতে খেতে গেল। বাড়ি মানে মুখুজ্যেদের পত্তির পেছনে দু'খানা পাকা ঘর আর এক-বারান্দার বাড়ি। রাস্তার কল থেকে জল ধরে আনে ওষ্ট।

খেতে বসে বংশী চিরকুটখানা ওষ্টর হাতে দিল।—বসুমশায় দু'হাজার টাকা চেয়েছেন!

খেতে বসেও বংশীর আসন করে বসার ঢঙে একটা মস্ত লোকের ভাবভঙ্গী। দোকান থেকে বাড়ি—এটুকু রাস্তাও বংশী বিয়ের যৌতুকের সাইকেলে চড়ে ফেরে।

আমি পড়তে জানিনে।

ওঃ! শোন—পড়ে শোনাচ্ছি।

ওষ্টর সেদিকে কান ছিল না। বাজারের পচাধচা জিনিস এখন আর মুখে রোচে না। মাছের খোটির নীলামদাররা হপ্তা কড়ারে টাকা হাওলাত করে বংশীর কাছ থেকে। তাই ভালো মাছটা, টাটকা মাছটা বংশীর বাড়িতেই ভোর ভোর পাঠিয়ে দেয়। বংশীর ইদানীংকার একটাই আক্ষেপ, খরচ বেড়ে যাচ্ছে বড়! বাসা ভাড়া করে থাকতে গিয়ে গুচ্ছের টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। ওষ্ট বলে, যদ্দিন বাঁচবে—ভালো করে বাঁচবে। সে আর পেটে কিল মেরে থাকতে রাজী নয়। ছোটবেলা থেকে আতোই কষ্টেসৃষ্টে বড় হয়েছে—এখন আর তার ওসব ভালো লাগে না। পাকা রুইয়ের মাথাটি মুগের ডালের ভেতর থেকে তুলে মানুষটার পাতে দিল।

শুনলে?

হুঁ।

কানই দাওনি তুমি।

বল না কি লিখেছেন বিপদে পড়েই চেয়েছেন নিশ্চয়—

প্রিয় বংশী, চার মাসের কড়ারে এই টাকাটা যদি দাও তবে সম্মান থাকে। মাসকাবারি মাইনে পেয়ে কিস্তিতে শোধ দেব। যা সুদ চাও তাই দেব। ইতি—

তোমারই দাদা।...কি মনে হয় তোমার ?

কি আবার মনে হবে ? তোমার টাকা থাকলে দেবে।

ফেরত পাবো!

মেরে দেবার মানুষ না।

সবাইকেই তো তুমি ভালো চোখে ছাখো।

অনাথবাবু খুব ভালো লোক। বলে নিজের বিয়ের সময়কার কথা মনে পড়ে গেল ওষ্টর। তোমার ওই হাতঘড়িটা উনিই দিয়েছিলেন। আমার ভাইয়েরা কোথায় পাবে বল অত দামী জিনিস।

এই নিয়ে সত্তরবার বললে। এমন কিছু দামী জিনিস নয়।

সোনার হাতঘড়ি।

উঃ। কতবার বলেছি একে সোনা বলে না। সোনার জল লাগানো। দু'শো আড়াইশো টাকার বেশী দাম হয় না এ ঘড়িগুলোর। আরও ভাত ভাঙলো বংশী। ওষ্ট দুখানা পেটির মাছ নামিয়ে দিয়ে মনে মনে ভাবলো, দুশো আড়াইশো বেশী টাকা নয় ? খুব বড়লোকী ভাবভঙ্গী এসে গেছে মানুষটার। রাতে শুয়ে শুয়ে কত কথা বলে। পাকা বাড়ি বানাবে। দু'শো আড়াইশো টাকা—কম টাকা ? তেষট্টি টাকার জন্যে ওষ্টদের বাস্তু সাত বছর বাঁধা ছিল। যত্ত বড়লোকিপানা। আজকাল রাতে আদর খাবার সময় ওষ্ট বংশীকে আহ্লাদ করে হোলসেলার বলে ডাকে সময় সময়। বংশী খুশী হয় খুব। সাবান কোম্পানির ঘরে সে একজন বড় হোলসেলার। সেখানেই কথাটা শুনেছিল বংশী।

কি ঠিক করলে ? টাকা দেবে তো ?

বংশী অন্য কথা ভাবছিল। কাল বেলা বারোটার ভেতর বালিগঞ্জ গোডাউনে সাত হাজার টাকা জমা দিয়ে চালান নিতে হবে। তারপর টেম্পো ঠিক করে মোতিহারি তামাকের বস্তা বোঝাই দিতে হবে রেল ইয়ার্ডে। ঈশ্বরীতলার স্টেশনবাজারে এখন তার নামে যে কোন জিনিস কাটবে। দূর দূর হাটের দোকানদাররা তার মোকামে গস্ত করতে আসে। জায়গায় বসে খেয়াদা, মীনা খাঁ, নোনা-বিষ্টুপুর পর্যন্ত সব বাজারের দরদামের খবর পায় সে এখন। কলকাতা থেকে শতকরা দু'পয়সা ছেড়ে দেয় বলে সবাই তার দরজায় আসে। এমন সুবিধে পেলে কে আর কলকাতা যায়। তাই মালও কাটে বেশী বংশীর।

দেবো তো নিশ্চয়। কিন্তু কিসের বদলি ?

অনাথবাবুর সঙ্গে আর বদলির কারবার কোরো না। দোহাই তোমার—

বাঃ, টাকাটা ফিরবে কিনা তাও তো দেখতে হবে।

ফিরবে গো ফিরবে। তুমি চোখ বুজে দিতে পারো। আহা, বড় ভালো মানুষ। খুকী দুটি কি ফুটফুটে। গিন্নী মানুষটা যা মরাটে চটা। নয়তো নিখুঁত সংসার। বিপদে পড়েই তো চেয়েছেন। তুমি দাও। চোখ বুজেই দাও গো। মানী লোকের মান রাখতে হয় সংসারে।

আঁচিয়ে উঠে হা-হা করে হাসলো বংশী। পায়ে পাম্পশু। সব সময় জুতো পায় থাকে আজকাল। ঘটক পুকুরের তুলনায় ঈশ্বরীতলার স্টেশনবাজার শহর-বন্দর এলাকা। হোলসেলার বংশী যখন যেখানে থাকে তখন সেখানকার নিয়ম মানে। একদম ভদ্দরলোকদের মত।

পান মুখে দিয়ে বললো, মেয়েছেলেদের কথায় সব সময় চলে। টাকা বলে কথা।

রাতে দোকান বন্ধ করে বংশী টাকা সঙ্গে করে অনাথবন্ধুর বাড়ি গেল। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। হেসে বললে, আপনার তলব পেয়েই চলে এলাম। চুপ করে বসে থাকতে পারি?

ঘণ্টাখানেক গল্প করে টাকাটা দিয়ে চলে এল বংশী। আসার সময় বাছুরসুদ্ধ উমাকে নিয়ে গেল সঙ্গে। অন্ধকারের ভেতর হেট হেট করতে করতে। কোম্পানি বাঁধের ওপর দিয়ে।

বংশী চলে যেতে শান্তা বলল, দিয়ে দিলে?

ব্যাঙ্ক তো ছাড়বে না শান্তা।

তাই বলে গাভিন গাই? সন্ধ্যেরাতে? এত ভালো গাই—

আবার টাকা হলে কিনবো। বেশ জোর দিয়েই বলল অনাথ।

টাকা আর হবে না আমাদের।

কেন হবে না শান্তা! আমি এখনো বুড়ো হয়ে যাইনি। আবার রোজগার করব।

টাকা হলেও এমন গাই কিনে তুমি রাখতে পারবে না। কিনবে—বেচে ফেলবে।

তা কেন?

তোমার হাতে ভালো জিনিস টিকবে না। বলেই শান্তা ভেতরে চলে গেল। মেয়ে দুটো না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আজকাল সন্ধ্যেবেলা তার আর রাঁধতে

ইচ্ছে করে না। কী সন্ধ্যে কী সকাল—সেই আগের উৎসাহ তো আর পায় না শান্তা। অথচ এখানে জমি কেনা থেকে বাড়ি তোলা, ঘর সাজানো, গোয়াল বানানো—সবতাতেই কী পরিশ্রম করেছে একসময়! গায়েও লাগেনি। রোজ সকালটাকে তার মনে হতো এইমাত্র একটা টাটকা দিন শুরু হল। কত কাজ সামনে। খেটে খেটে সব কাজের মাথা ভেঙে দিত। কোন খাটুনিই টের পায়নি তখন।

বারান্দায় মাদুরে গুম হয়ে বসেছিল অনাথ। বংশীর লোক এসে কাল সকালেই গাইয়ের ছাড়পত্র নিয়ে যাবে। নিজের নাম সই করে লিখে রাখতে হবে। মবলক আটশো টাকা। বাকী বারোশো তিন মাসের কড়ারে নিতে হয়েছে।

যেভাবে ছোকরা সারা বাড়ি ঘুরে ঘরগুলো দেখছিল—যেন গাই সমেত বাড়িটাও দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে সঙ্গে। হেট হেট করতে করতে। তখন তারই হাতঘড়ি বংশীর কবজিতে।

অনাথ মাদুর থেকে উঠতে পারলো না। বারান্দায় বসে থেকেই বুঝতে পারলো—শান্তা মেয়েদের পাশে শুয়ে পড়লো।

ইলেকট্রিক আলো ঘিরে গরমকালের নতুন পোকা। রাত ন'টাও বাজেনি। শূন্য গোহাল। এসব সময় ফাঁকা বাড়িতে বসে উমার কান লটপটানি শোনা গেছে এতদিন। শান্তাও বুঝলো না! আমি একটা ভালো কাজের স্বপ্ন দেখেছিলাম। হয়নি। তাতে কি? আবার কি হতো না?

বন্ধুগণ! আমার উপস্থিত ভেয়েরা!! এবং বুনেরা!!!

আপনারা সবাই জানেন—সন্তোষ আজ আর আমাদের মধ্যে নেই।

স্টেশন আর বাজারের মধ্যে একটুখানি মাঠ। তাতে বর্ষায় জল জমে ব্যাং ডাকে। অন্য সময় রিকশা সাইকেল দাঁড়ায়। এখন সেখানে মঞ্চের মাইক ধরে জনতার প্রার্থী দক্ষিণা চক্কোত্তি। শ'তিনেক লোক ঠাসাঠাসি করে বসেছে। আর দিন-পাঁচেক পরেই ভোট। বক্তা দক্ষিণা। শ্রোতাদের বেশীর ভাগই রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে। ট্রেন এলে সে-ভিড় খানিকক্ষণ ফুলে উঠছে। আবার যে-কে সেই। তার ভেতর অনাথবন্ধুও দাঁড়িয়েছিল।

ভেয়েরা বুনেরা কথাটা তিনবার শুনে অনাথ বুঝলো, দক্ষিণা চক্কোত্তির এটা ঈশ্বরীতলার টান। বলতে চাইছে—ভাইয়েরা, বোনেরা।

মাইক গাঁক গাঁক করে উঠলো।

শহীদ সন্তোষ আপনাদের জন্যেই আত্মাহুতি দিল প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণে।

অনাথ মনে মনে বললো, সন্তোষকে দাহ করার সময় আপনাদের তো দেখা যায়নি। পুলিসের সঙ্গে শুধু আমি একা ছিলাম। রাজপুরের শ্মশানে। বডি কাপড-ঢাকা ছিল। লাশকাটা ঘর থেকে আমারই সামনে পুলিস ভ্যানে তোলা হয়। তখন তো কেউ যাননি আপনারা।

মাইক বলল, এই প্রতিক্রিয়াশীলদের যোগ্য জবাব দিতে হবে ব্যালট বাক্সে।

অনাথ বিডবিড করে বলেই ফেলল, ও হরি! তাই বল। এজন্যে শোকসভা। জগেন যাত্রা স্টেজে ওঠার চেষ্টা করছিল, ভলান্টিয়াররা ধরে ফেলল।

রিটায়ারের পর দক্ষিণার মুখে সামনের দিকে তিনটি দাঁতও রিটায়ার করেছে। তাই প্রতিক্রিয়াশীল কথাটা শোনাচ্ছিল প্রীতিক্রিয়াশীল। সবাই বুঝে নিচ্ছিল।

জগেন যাত্রাকে টানাহ্যাচডা করে সরিয়ে আনতে হলো ভলান্টিয়ারদের। তার ফলে মাইকের তার সরে গেল। দক্ষিণা নিজেই রেডিওর নকলে ঘোষণা করলো, বিদ্যুৎ-বিভ্রাটে বিঘ্ন ঘটায় সভা সাময়িক ভাবে স্থগিত থাকলো। আপনারা কেউ যাবেন না। সভার শেষে আমরা ঈশ্বরীতলার মেহনতী মানুষ সবাই একসঙ্গে শহীদ সন্তোষের নামে শপথ নেব।

এখানে এসে সত্যিই তার কেটে গেল। জগেন যাত্রা দু'জন ভলান্টিয়ারের কোলে চ্যাংদোলা অবস্থায় বাঁ পায়ে মাইকের তার জড়িয়ে ফেলেছে।

অনাথ বেরিয়ে পড়লো। বংশী কাপালির দোকানে পাঁউরুটির লাইন। ওদিকে এখন কথা বলতে যাওয়ার কোন মানে হয় না। একবার ভেবেছিল, জানতে চাইবে উমা কেমন আছে? ওর খাদ্যাখাদ্যের কথা সেদিন কাপালিকে বলে দেওয়া হয়নি। উমার একটু ঠাণ্ডার ধাত আছে।

লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে দুঃসংবাদটা পেল অনাথ। বিন্ধেশ্বরীর বাওড়ের দিককার সেই বুনোপাডার সর্দার মত লোকটা তাকে দেখেই তেলেভাজার দোকান থেকে সরে এলো। চোখ গোল্লা করে হডবড করে বলল, আপনার ছাগোলটো বাবু—সেই ধাডি ছাগোলটো বড সিগন্যালের মুখি এই মাত্তর ট্রেনে কাটা পড়লো। আমি এই দেখে আলাম—

তারপর হা-হা করে হাসলো। গতর নিয়ে নড়তে পারেনি বাবু। বলেন

তো ছালটা ছাড়ায়ে নিই। দাম পাবেন। মাংসোটা কিন্তক আমাদের। বলেন তো আদা পিয়াজ কিনি। আপনারা তো আর ছাগী খান না—

না। বলে খেয়াল হল, চামড়ার দাম করা হয়নি। বললো, চামড়ার জন্যে কত দিবি ?

ওই এক-দর। ন'সিকে। কোথায় চললেন বাবু ? ও বাবু ?

তুমি পেঁয়াজ কিনে আন। আসছি আমি।

রেল লাইন ধরে কয়েক পা এগিয়ে ফিরে এল অনাথ। কী হবে গিয়ে ! কোন লাভ নেই। বুনোদের সর্দারমত লোকটা তখনো দাঁড়িয়ে। নিশ্চয় শুক্লা। আজকাল ভালো করে নড়তে-চড়তে পারে না। বলাই থাকতে এক-একদিন চরিয়ে আনতো। নয়তো কাঁঠালপাতা এনে মুখের সামনে ধরতো। টানাটানির সময় ওর নাতিপুতি বেচে সংসার চলে যাচ্ছিল অনাথের। শুক্লা কাল রাতেও খুব কেশেছে।

বুনোকে ধরে বলল, ছাগলটার দাড়ি আছে ? সাদা মত ?

তা তো দেখি নাই বাবু ! বলেই লাইনের ধারের মুদীকে বলল, আদা দিলি না ?

অনাথ বলল, আমি আর যাচ্ছিনে। মাংসটা কেটে নিয়ে চামড়ার দাম দিয়ে যাবি কিন্তু।

ঝোল

ভোট বলে দু'দিন ছুটি। একদিন রবিবার। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়ে শান্তাকে নিয়ে ফিরে এল অনাথ।

সেই ন'সিকে বুনো দিয়ে যায়নি। মাঠ ভেঙে অনাথ তাগাদায় বেরোলো। মেঘলা আকাশ। বাওড়ের বটতলায় বাজিকরকে পেল না। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। আজ সন্ধ্যেবেলা কালোয়ার ব্যাপারী টিউবয়েলের পাইপ দেখতে আসবে। পছন্দ হলে আগাম দেবে। কাপালির ঘ্যানঘ্যান আর ভালো লাগে না অনাথের। তাই অফিস যাবার পথে হিন্দ্ সিনেমার পেছনে ব্যাপারীটোলার ব্যাপারীদের ঘরে পাইপের একটুকরো স্যাম্পেল নিয়ে গিয়েছিল। পছন্দ হলে কিনে নেবে ওরা। টাকা দিলে আগে বংশীর মুখ বন্ধ করতে হবে। ছোকরা দেখা হলেই সব সময় বকম্ বকম্ করে।

বাওড়ের দক্ষিণ ধার দিয়ে এগোচ্ছিল। বছরের এই সময়টায় ঈশ্বরীতলার জোলো জায়গাগুলো বন্নে শাকে ভরে যায়। পাশ কাটিয়ে ধুতি তুলে হাঁটছিল অনাথ। আরে, এ তো শাক তোলার মেয়ে নয়!

অনাথ দাঁড়িয়ে পড়ল।

প্রথমে ভেবেছিল, পড়তি ঘরের কোন মেয়ে লুকিয়ে শাক তুলতে এসেছে দুপুর দেখে। ট্রেন চলে যাওয়ার শব্দ এদিকটায় এসে আছড়ে পড়লো।

ভালো করে তাকিয়ে অনাথ থমকে গেল। নিজেকে ঢাকবার কোন চেষ্টা নেই রিনির। ঘন বন্নে শাকের থোকাগুলোর ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে। তাকে দেখেও চোখের জল মুছলো না। সারাটা শরীর ফুলে ফুলে উঠছে। চওড়া কালোপেড়ে তাঁতের শাড়ি বন্নে শাকের সঙ্গে ঘষটে গিয়ে অনেক জায়গায় সবুজ ছোপ লেগে গেছে।

অনাথ গিয়ে আস্তে ধরলো। বেশী বয়সের কুমারী।—কোথায় শুয়ে আছো দেখেছো? গাছপালার ভেতর রিনির মুখখানা একদম খসে-পড়া কোন বড় পাতা। চোখ থেকে ক্রমাগত জল গড়িয়ে পড়ে মুখের ওপর অনেকগুলো শুকনো রেখা। আবার তা ভিজে গেল। অনাথের দু'হাতের ভেতর রিনি মুচড়ে মুচড়ে যে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করছিল তা একসময় আ—আ করে গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো।

ও কি হচ্ছে! নিজেকে সামলাতে হবে রিনি। এখানে কারো কোন দয়ামায়া নেই। কেউ ক্ষমা করে না—! বলে বুঝলো, সে বোকার মত এসব বলে যাচ্ছে। রিনিকে কেউ কিছু বোঝাতে পারবে না। কান্নায়, ব্যথায় সুন্দর মুখখানা ক্রমাগত বৃষ্টিতে ঝাপসা দূরের মাঠের চেহারা পেয়েছে।

ওরা ওকে খুন করলো কেন অনাথদা? খুব করে মেরে ছেড়ে দিতে পারতো। আধমরা করে। একেবারে শেষ করে দিলো কেন?

এসব কথার কোন জবাব হয় না। ভারী চুলের ঢাল মাটিতে মাখামাখি। সুন্দর হাত দুখানা কাটা কলাগাছ হয়ে পড়ে আছে কোলে। সারাটা শরীর কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে। কারো কনুই যে এত সুন্দর হয় এর আগে তা দেখেনি অনাথ।—উঠে বোসো। দেখে ফেললে কে কি ভেবে বসবে তার ঠিক নেই।

জানি। এজন্যে আমারই বাবা দায়ী। আমারই বাবা। রোজ ওপরের ঘরে বসে পরামর্শ। কত বারণ করেছি। সন্তোষদা তুমি চলে যাও—চলে যাও। যায়নি।

তোমাদের বাড়িতেই তো খেতো, শুতো।

মঙ্গলবার সারাদিন ধরে কাউন্টিং চললো। সেদিনই রাত আটটায় আকাশ-বাণী কলকাতা থেকে ঈশ্বরীতলা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটের ফলাফল জানা গেল। রেডিওর ঘোষণা জনতার প্রার্থীর বুকে এসে গদাম করে লাগলো। দক্ষিণা চক্কোত্তি পাত্র-মিত্র সহকারে বসেছিল। অন্ধকার বারান্দায়। একটা খালি চেয়ারে ট্র্যানজিস্টার। পরিষ্কার শোনা গেল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী দক্ষিণা চক্রবর্তীকে সাতশো ভোটে পিছনে ফেলে অনাদি ঘোষ জয়ী হয়েছেন। অন্ধকার বারান্দায় আরও গুমোট অবস্থা দাঁড়ালো। কারও মুখে কোন কথা নেই। অনাদি ঘোষ সদর থানার লোক। এখুনি তার বিজয় মিছিল এদিকে আসবে।

দক্ষিণা আস্তে বলল, পাবলিক বেইমান।

তার এক খয়েরখাঁ বলল, আমরা রিকাউন্টিং দাবি করবো।

ঠিক এই সময় বংশী কাপালি তার গুদামঘরে একা। তার এখন প্রায় পাগলের দশা। স্টেশনবাজারে বড রাস্তার ওপর লম্বা ঘরে হোলসেলের দোকান। দোকানঘরের পেছনেই বড তিনখানা ঘর নিয়ে কাপালি স্টোর্সের গোডাউন।

রাত আটটা সওয়া আটটা হবে। বংশী দোকানঘর থেকে বেরিয়ে গুদামে ঢুকেছিল। সাবানের পেটি, বিস্কুটের টিন, তামাকের বস্তাগুলো সাইজমত রাখা হয়েছে কিনা দেখতে গিয়ে বংশী মহা মুস্কিলে পড়ে গেল।

একদিকে স্টেশনারি, মনোহারির মাল। তার উল্টোদিকে তামাকের বস্তার লাট সিলিং অব্দি ঠেলে উঠেছে। মাঝখানে চলাচলের সরু ফালি। দেশলাইয়ের পেটি আর নুনের বস্তা একটু সাবধানে রাখা। ঘরের ইলেকট্রিক বাতি তেমন ঝাঁঝালো নয়।

এক জায়গায় বস্তা ফুঁড়ে তামাক পাতা বেরিয়ে পড়েছে। এমন বাড়তি পাতা দিয়েই সারা বস্তায় ড্যাম্প ধরে যায়। এক বস্তা থেকে সারা লাটে সে ড্যাম্প ছড়ায়। বংশী নীচু হয়ে বাড়তি পাতার আধখানায় টান দিল। ছিঁড়ে বাইরে ফেলে দেবে।

কিন্তু বস্তা থেকে যা হাতে উঠে এল তা দেখে তো বংশীর চক্ষুস্থির! একখানা পঞ্চাশ টাকার নোটের আধখানা। ভালো করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো। তারপর ভেতর থেকে গোডাউন তালাবন্ধ করে দিল। বস্তাটার সুতুলি সেলাই খানিকটা

খুলে নিল। তারপর চিনির বস্তায় স্যাম্পেল বের করার টিনের হাতাখানা এনে সাবধানে তামাকের সেই বস্তায় ঢোকালো। সঙ্গে সঙ্গে একদম ব্যাঙ্কের পিন করা নোটের তাড়া বেরিয়ে আসতে লাগলো।

সেই অবস্থায় বস্তাটা রেখে বংশী বাইরে গিয়ে গোডাউনে তালা দিল। দোকান বন্ধ করতে রাত দশটা। তারপর খাওয়াদাওয়া করে আবার যখন গোডাউনে এল তখন কলকাতার লাস্ট ট্রেন চলে গেছে।

সব ক'টা বস্তায় হাতা ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে দেখলো বংশী। চারদিক থেকে। ডবল ডবল করে। মাথার চুল কপালে এসে পড়েছে। সারা ঘরে তামাকপাতা ছড়ানো। কপাল থেকে ঘামের ফোঁটা নেমে দুই ভ্রূ ভিজিয়ে দিল। নাকের নীচে থাবা গোঁফজোড়াও ঘামে চুলকোচ্ছে। সেই অবস্থায় পয়লা বস্তাখানার সামনে মেঝেতে বসে পড়ল।

তারপর খোলা বস্তার ভেতর হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে জিনিস টেনে আনতে লাগলো। প্রায় সবটাই তামাকপাতা। বস্তাটা ফাঁকা হয়ে গেল। নোটের গোছাগুলো পর পর সাজিয়ে দিয়ে চারদিক থেকে ঘুরে ঘুরে দেখলো বংশী। কাপড় কাচার বার সাবান যেন থাক দিয়ে উঠে গেছে ওপরে। পিন করা একশো টাকার গোছা তিরিশখানা। পঞ্চাশ টাকার গোছা বাইশখানা। কুড়ি টাকার গোছাগুলো দশ-পাঁচের গোছার সঙ্গে মিশে ছিল। দু টাকার নোটের বাণ্ডিল সব চেয়ে মোটা। এক টাকার নোটের গোছা প্রায় তার সমান।

বংশী কাপালি সরু ফালিটায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। হাতঘড়িতে রাত সওয়া তিনটে। ওষ্ট বড় ঘুমকাতুরে। আসবার সময় বলে দিয়েছে, তাড়াতাড়ি ফিরো যেন। তাস পিটতে বসে যেয়ো না।

তামাকের বস্তায় নোটের তাড়া? কোত্থেকে আসতে পারে? মোতিহারীর শুখো পাতার চালান। বড় বড় গদি থেকে মালগাড়িতে ওঠে। কোন মোকামের মালিক হয়তো তামাকের বস্তায় লুকিয়ে রেখেছিল। ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনা নোটের তাড়া। কাগজে দেখেছে বংশী—বড় বড় সব লোকের টাকাকড়ির হিসেব ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখা হচ্ছে। সেরকমই কোন মোকামের মালিক ব্যাঙ্কের টাকা তুলে এনে বস্তাবন্দী করেছিল। তারপর কুলিরা লুকিয়ে রাখা টাকাসুদ্ধ তামাকের বস্তা ওয়াগনে তুলে দিয়েছে। তাদের তো জানবার কথা নয়।

সাবান আর চায়ের পেটির ওপর থেকে দুটি আরসোলা নেমে এসে বংশীর

ফতুয়ার ওপর বসলো। এখন না উঠে আর উপায় নেই। ঘুম আর ক্লান্তি তাকে উঠতে দিচ্ছিল না। তবু উঠে বসলো। বড়বাজার থেকে গস্ত করার দুটো বড় বড় ব্যাগে জিনিসগুলো ভরলো সাবধানে। সকাল সকাল লোক দিয়ে তামাকের বস্তাগুলো ফিরে সাজাতে হবে। এখন বেরোনো দরকার। আর খানিক-ক্ষণের ভেতর মাছের খোটিতে নীলাম শুরু হয়ে যাবে। গোডাউনে তালা দিয়ে বেরোবার সময় দুখানা পা একসঙ্গে থরথর করে কেঁপে উঠলো। আলো ফোটেনি তখনো। বাজারের ইলেকট্রিক আলো থেকে খানিকটা এসে এদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মুখুজ্যেদের ছাইগাদায় দীঘল দুই মানকচুর সবুজ পাতার ভেতর দিয়ে একটা সাদা রঙের পোষা বেড়াল লাফিয়ে পড়লো। অমনি বংশী 'বাবাগো' বলেই চমকে উঠে গোডাউনের বাইরে প্যারাপেটে ভীষণ গুঁতো খেল হাঁটুতে। উঠে বসতে সময় নিল।

সেদিন আর দোকান খোলা হল না বংশীর। জ্বর এল দুপুরে। বিকেলের দিকে মাথার কাছের খোলা জানলা দিয়ে দেখতে পেল বাঁশবন আর চালতা বাগানের ফাঁকটুকু ভরাট করে পাঁচটা কুড়ির সবুজ ইলেকট্রিক ট্রেনটা ধানক্ষেতের ভেতর সাঁতার কাটতে কাটতে চলে যাচ্ছে। সামনে কলকাতা।

রাত দশটা নাগাদ মনে পড়ল না সন্ধ্যেরাতে কি খেয়েছে। মাথার কাছে একবার গুষ্টর মুখখানা দেখতে পেল যেন। আবছা মত। বংশী একবার বলল, গস্ত করার থলে দুটো কোথায় রাখলে? সাবধানে রেখেছো তো?

লেপ-তোশোকের বাক্সে। কোন ভয় নেই। এবার তুমি ঘুমোও তো।

বংশী নিশ্চিন্তে পাশ ফিরে শুলো। খানিক পরে দেখতে পেল, তাদের ঘটকপুকুরের বাপকেলে বাস্তুতে বউ নিয়ে বেড়াতে গেছে বংশী। দুর্গাপুজোর বাজনা সুপুরিবাগানে বেজে ফিরে আসছে। সন্ধ্যেরাতের জ্যোৎস্নায় বাড়ির পুকুরঘাটে আঁচাতে যাবে। মা বেঁচে। হেঁসেল থেকে চেঁচিয়ে মা বলল, সাবধানে পা ফেলিস। পেছল ভীষণ। ঘাটলায় এসে চমকে গেল বংশী। সিমেণ্ট করা বড় চাতালে কাঁচা টাকা, আধুলি, সিকি, হলুদ বিশ পয়সার আণ্ডিল ছড়ানো। মাঝখানটা নৈবেদ্যর ধারা উঁচু। ডান হাতে এঁটো। নীচু হয়ে এক মুঠো তুলতে গিয়ে পিছিয়ে এল। সাদা রঙের বেড়ির ছাপ সারা গায়ে। বেশ লম্বা একটা সাপ আড়মোড়া ভেঙে ধীরেসুস্থে পুকুরে নেমে গেল। ছড়ানো সিকি আধুলির ওপর দিয়ে।

দু-চার দিনের বর্ষার জো পেয়েই সারা তল্লাটে হাল পড়েছে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়—এই তিনটে মাস ঈশ্বরীতলায় অনেকেই জলদি জাতির তেতো পাট দেয়। কেটে নিয়ে আসল বর্ষায় ধান ফেলবে।

দক্ষিণা-গিন্নী দক্ষিণাকে বলল, একবার আবাদে যাও। কোন জমি এবার ফেলে রাখা ঠিক হবে না।

সকালবেলা চায়ের সঙ্গে মুড়ি খায় দক্ষিণা। ভুটি চাইতে এসেছিল ভেতর বাড়িতে। দক্ষিণার চেয়ে তার বউ অনেক বড়ঘরের মেয়ে। এতদিন জনতার প্রার্থী দক্ষিণা চক্কোত্তি তাকে বলে এসেছে, দাঁড়াও না—একবার মন্ত্রী হয়ে কী করি দেখো!

এখন দক্ষিণার দিকে জল নীচু। তাই গিন্নীর কথা শুনতে হচ্ছে। গিন্নী প্রায়ই বলে, তোমার জনতা কোথায় গেল? মুড়ির ধান, খইয়ের ধান, বছরকার খোরাকির ধান—সব বেচে ফেলে ভোটে নামলে। এখন তোমার সংসার দেখবে কে? তিন-তিনটে মেয়ের বিয়ের বয়স বেরিয়ে গেল। খেয়াল আছে কোনদিক?

ভুটি মুড়ি হবে?

গিন্নী জানে, খুকীদের বাপ চায়ের সঙ্গে মুড়ি খায়। তাই আলাদা করে মুড়ি ভাজিয়ে রাখে ফি হপ্তায়। এক খুচি মুড়ি এনে দক্ষিণার প্লেটে দিল।—ভোটের জন্যে কেনা গাড়িটা আগে বিদেয় করো।

দক্ষিণা কিছু না বলে বারান্দায় গিয়ে বসলো। সে জানে, এ গাড়ি বিকোবার নয়। এক যদি পুরনো লোহালক্কড় হিসেবে কেউ কিনে নিয়ে যায়। বাইশ বছর আগেকার গাড়ি। চলে ঠিক। বিগড়ে যায় মাঝে মাঝে। খদ্দের হয় না এসব জিনিসের। স্পোক লাগানো রিংয়ের চাকা আজকাল বড় একটা পথে দেখা যায় না।

প্র্যাকটিক্যাল খাতার ছবি সাঁটবার জন্যে বিকাশ আঠার শিশি খুঁজতে চিলে-কোঠার ঘরে ঢুকেছিল। বেরিয়ে আসতে দেখলো, ছাদের আড়ালমত জায়গায় রেলিংয়ে হেলান দিয়ে রিনি বসে-বসেই বমি করছে।

কি হয়েছে মেজদি? তোর শরীর খারাপ?

রিনি হিক্কা থামিয়ে বলল, কিছু না। তুই নীচে যা—

তোর কি হয়েছে? আমায় বল্ না মেজদি?

তুই নীচে যা বলছি।

বিকাশ নীচে গেলে রিনি প্রাণভয়ে বমি করল। বুকের ভিতরটা কাঁপছিল। সে এখন জানে তার কি হয়েছে। আটকাবার কোন রাস্তা নেই। ছাদ থেকে নেমে আসবার সময় ভাবলো, জল দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে দেয়। কিন্তু জল টেনে তুলবে কে ওপরে! সকালবেলায় রোদে মাথাটা ঘুরে গেল রিনির। সিঁড়ি দিয়ে নামবার মুখে সব অন্ধকার লাগলো। মনে মনেই বলল, যাগ্‌গিয়ে! যে দেখবে সে ভাববে বেড়ালের বমি। সে তো এখন পশু। ভারবাহী পশু মাত্র।

বিকেলে টুকু ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যাল পেরিয়ে একদম লোকালয়ের বাইরে গিয়ে ফাঁকা মাঠে রেলের পাটির ওপর বসেছিল। দু'বার উঠতে হয়েছে তাকে। দুটো ট্রেন গেছে। বিকাশ এল সন্ধ্যে করে। তখন টুকু ফিরে যাচ্ছিল।

দাঁড়াও, যাচ্ছো কোথায়? আমি এসে গেছি!

না। অন্ধকার হয়ে যাবে। আমি চলি।

বাঃ টুকু! এতটা পথ ছুটতে ছুটতে এলাম আর তুমি চলে যাচ্ছো!

আমার মন ভালো নেই।

আমারও ভালো নেই টুকু।

টুকু দাঁড়িয়ে গেল।

রেল লাইন খানিকক্ষণের ভেতর অন্ধকারে মুছে গেল। দু'জনে ঠিক করল হাঁটতে হাঁটতে পরের স্টেশনে চলে যাবে। তারপর ট্রেনে চড়ে ঈশ্বরীতলায় ফিরে আসবে।

জানো টুকু, আমাদের বাড়িটা নয়-ছয় হয়ে গেছে।

ভোটে হেরে গিয়ে তো?

না, সন্তোষদা মরে গিয়ে। বাবা পর্যন্ত ভুলতে পারছে না। রিনিদি আজ যেভাবে ছাদে বসেছিল—

খানিকক্ষণ দু'জনে কথা বলতে পারলো না। হাঁটতে হাঁটতে ছোট নালার ওপর ছোট ছোট ব্রীজ পড়ছিল। সেগুলো পেরিয়ে খানিক সরল রাস্তা। টুকু বলল, আমাদের বাড়ির অবস্থা ভালো নয়। বাবা সব সময় চুপচাপ থাকে। ব্যাঙ্ক চিঠি পাঠিয়ে যাচ্ছে। বাবা না পড়েই ছিঁড়ে ফেলে।

আমার যদি কোন চাকরি থাকতো তাহলে দিদিদের নিয়ে আমি আলাদা বাসা করে উঠে যেতাম। দাদা যে কবে নিজের পায়ে দাঁড়াবে—

আমার তো এখনো কলেজই হলো না। কবে যে বাবার পাশে দাঁড়াতে পারবো! মা ভীষণ খিটখিটে হয়ে পড়েছে।

তোমাকে বিয়ে করার পর আমাদের বাড়িতে তোমার মাকে নিয়ে যাবো।

যাঃ! বলে টুকু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

আর তো এক বছর। গ্র্যাজুয়েট হয়েই আমি চাকরির পরীক্ষা দেব।

চাকরি তোমায় নিতে দেবেন তোমার বাবা?

পাগল হয়েছো। আমি বাবার জমিজমা আঁকড়ে পড়ে থাকবো? সেজন্যে দাদা আছে।

তাহলে তুমি কোথায় থাকবে?

নতুন নতুন জায়গায় ঘুরে বেড়াবো। নতুন নতুন দেশ দেখবো আমরা দু'জনে।

তাহলে ঈশ্বরীতলার কি হবে?

ঈশ্বরীতলা যেমন আছে তেমন পড়ে থাকবে টুকু। এই তো জীবনের নিয়ম।

তুমি ভীষণ কঠিন কঠিন কথা বলছো আজ।

বিকাশ জবাব দেবার সময় পেল না। সামনেই স্টেশনের আলো। হু-হু করে ইলেকট্রিক ট্রেন এসে দাঁড়ালো। আপ ট্রেন। ঈশ্বরীতলা হয়ে কলকাতা যাবে। বিকাশ পড়িমড়ি করে ছুটছে দেখে টুকু বলল, দৌড়োচ্ছো কেন! ডাউন ট্রেনের সঙ্গে ক্রসিং হবে এখানে!

ওরা দু'জন গিয়ে একই কামরায় বসলো। ঠিক করা আছে—ঈশ্বরীতলায় ট্রেন পৌঁছলে ওরা দু'দরজা দিয়ে আলাদা আলাদা নামবে। প্রায় ফাঁকা কামরা।

এক সময় ঘড়ি দেখে আঁতকে উঠলো বিকাশ, কী ব্যাপার? এত দেরি তো করে না ট্রেন!

টুকুও অস্থির হয়ে পড়েছে। অন্ধকারে কোম্পানি বাঁধ দিয়ে তার বাড়ি ফেরা মায়ের পছন্দ নয়।

ওই তো ট্রেন আসছে। গাড়ি এসে পাশের লাইনে দাঁড়ালো। একজন লজেন্সওয়ালা ডাউন ট্রেনের কামরা থেকে ঝুল খেয়ে বিকাশদের কামরায় চলে এল। মাঝবয়সী। কলেজ যাবার সময় বিকাশ লোকটাকে দশ পয়সায় তিনটে বলে কামরায় চেঁচাতে দেখছে।

গাড়ি লেট্ কেন ভাই?

সুইসাইড্! দাদাবাবু সুইসাইড্! বড়ঘরের ব্যাপার! টক লজেন্স দেব—

বিশ পয়সায় ছ'টা নিয়ে বিকাশ একখানা এক টাকার নোট এগিয়ে দিল।

লোকটা ভাঙানি দিতে দিতে বলল, ঈশ্বরীতলায় ঢুকতে ডিসট্যান্ট সিগনালে প্রায় এক ঘণ্টা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। মেয়েছেলের কেস—মাথায় চোট লেগেছে।

খুচরো পকেটে রাখতে রাখতে বিকাশ বলল, মারা গেছে?

বাঁশি দিয়ে ট্রেন ছাড়লো। লোকটা কামরা পাল্টাবার মুখে লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমেই বলল, ভোটে দাঁড়িয়েছিল দক্ষিণা চকোত্তি! তার মেয়ে বাবু—একদম থেঁতলে গেছে।

কি?

ট্রেন তখন দাপাতে দাপাতে ছুটছে। টুকুও শুনতে পেয়েছে। সে একটুও দেরি না করে পেছন থেকে দু' হাতে বিকাশের কোমর জড়িয়ে ধরলো। কামরায় আরেকজন লোক ছিল। ভিখারী মত। মাথা কাপড়ের খুঁটে জড়ানো। কাপড় মাথা থেকে নামিয়ে সে অবাক হয়ে তাকালো। একটা ছেলের কোমর একটা মেয়ে জোর করে জড়িয়ে ধরে আছে। এরকম দৃশ্য সে কোনদিন দেখেনি। ভয়ে উঠে দাঁড়ালো লোকটা। টুকু বিকাশকে ধরে রাখতে পারছিল না। বিকাশ উঠে দাঁড়িয়ে ছুটন্ত অবস্থায় এক পা বাড়িয়েছে, এমন সময় ট্রেনটা একটা লম্বা বাঁশি দিল। তার সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ রিনিদি—ই—ই বলে চেঁচিয়ে গলা চিরে ফেললো। বাঁশি থামতেই নিজের সিটে ধপাস করে বসে পড়লো বিকাশ।

ট্রেন তখন ঈশ্বরীতলায় ঢুকছে।

অঘ্রাণের গোড়ায় উমা বকনা বাছুর দিল।

দুপুরের দিকে অনাথের মুখে খবরটা শুনে শান্তা ঝাঁঝিয়ে উঠলো। আমাদের এখানে থাকলে ঠিক এঁড়ে বাছুর দিত। তোমার যা ভাগ্য।

অনাথ চুপ করে শুনলো। টুকু টেস্ট পেপার নিয়ে নন্দবাবুর কোচিংয়ে পড়তে গেছে। আজকাল লিলিও তার সঙ্গী। অ্যালজেব্রা বুঝতে সেও গেছে দিদির সঙ্গে।

তুমি অফিসে যাবে না?

না।

এখন যদি চাকরিটা খোয়াও তাহলে তো চিত্তির! মাথায় অ্যাতগুলো টাকার দেনা!

অনাথ শান্তার মুখের দিকে না তাকিয়েই বলল, রিনি বেঁচে থাকলে এখন ওর

বাচ্চা হতো, তাই না ?

শান্তা ছিল রণমূর্তিতে। একগাদা কাপড় সেদ্ধ করতে দিয়েছে। আস্তে বলল, না। আরো দু'মাস পরে। পোস্টমর্টেমে ভ্রূণ পেয়েছিল। কর গুনে শান্তা বলল, তা দু'মাস না হোক আরও পাঁচ-ছ' হপ্তা পরে রিনি মা হতো। নাও চান করে এসো। আমার অনেক কাচাকাচি আছে।

কাচাকাচি করে খেয়ে নিও। আমার খিদে নেই।

উঠছো যে ? কোথায় চললে এখন ?

যাই। বাওড়ের বটতলাটা ঘুরে আসি।

বাজিকর ফিরলে তোমার খোঁজ নিতেন। চান করে খেয়ে যাও। আমায় আর জ্বালিও না।

খিদে নেই। বাওড়ে চান করে নেব।

বটতলার গাছের ছায়ায় মহম্মদ বাজিকরকে পেল। পেল জগেন যাত্রাকে। বাজিকর বলল, দেখুন বসুমশায়, স্মৃতি হারিয়ে মানুষ পাগল হয়, হাবা হয়, বোবা হয়। কিন্তু প্রাণ বাঁচানোর ইচ্ছে হারায় না। সে ইচ্ছে সর্ব অবস্থায় জেগে থাকে। পাগল মানুষ, কিন্তু কেমন সাপ খেলাচ্ছে আপনাদের জগেন যাত্রা !

একটা ফণা-তোলা সাপকে অবহেলায় জগেন খেপাচ্ছে, নাচাচ্ছে, দাবড়াচ্ছে।

'বষ নেই বুঝি ?

নেই মানে ! সদ্য সদ্য ধরা। কিন্তু জগেন কেমন শিখেছে দেখুন !

দয়া করে ঝাঁপিতে ভরুন। আমি এসব দেখতে পারি না।

বাজিকর জগেনকে কি ইশারা করলো। অমনি সে ক্ষ্যাপা সাপটাকে ঝাঁপিতে ভরে ফেলল।

জগেন যাত্রা আপনাকে ভুলেছে। ঘর বাড়ি যাত্রাপার্টি ভুলে গেছে। কিন্তু দেখুন বেঁচে থাকার জন্যে নিজেকে রক্ষা করার কায়দাটা ভুলতে পারেনি। সব যায় মানুষের। স্মৃতি যায়—আগুনের সঙ্গে, সাপের সঙ্গে কি ব্যবহার করতে হবে মানুষ তা কিছুতেই ভোলে না।

ঝাঁপিতে সাপটাকে ভরে রেখে জগেন তার ইচ্ছেমত এ গাছ সে গাছের গায়ে হাত বোলাচ্ছিল। দূর থেকে জগেনকে অনাথের এই গাছপালার একজন বলেই মনে হচ্ছিল। এমন আপন মনে ও গাছের গায়ে মাথা ঘষছে, হাত বোলাচ্ছে।

আমি এখানে থাকবো না বাজিকর মশাই।

চলে যাবেন? কি বলছেন? অ্যাতো জায়গা ঘুরে আমি যে শেষকালে ঈশ্বরীতলায় থিতু হয়ে গেলাম ঈশ্বরীতলার মায়ায়।

অনাথ চুপ করে থাকলো। সে প্রায় এগারো বছর এখানে আছে। তার নিজের বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেছে বছর তিনেক। এখানে এসেছিল তিরিশ-একত্রিশ বছর বয়সে। তখন কত আশা ছিল বুকে!

আমার জন্যে চলে যাচ্ছেন না তো?

পাগল!

না। আমিই তো আপনাকে তুনিয়া আবিষ্কারের জন্যে একজোটের চাষে নামতে বলেছিলাম। ধার-দেনায় জড়িয়ে গেলেন—

না না, তা নয়। টিউবয়েল বেচে দিয়ে অনেকটা শোধ হয়ে গেছে। এখন যা আছে. কিস্তিতেও শোধ দিতে পারবো। কিন্তু আসলে এখন আমার আর ভালো লাগছে না।

চলে যান। আবার ঘুরতে ঘুরতে আসবেন। আমি তো কত জায়গার জল খেলাম বসুমশায়! এখান থেকেও হয়তো একদিন পাততাড়ি গোটাবো। নয়তো এই বাওড়ের ধারেই মাটি নেব। গর্ত করে আমায় নামিয়ে দেওয়া হবে ভেতরে। দু'মুঠো করে ধুলো ছড়িয়ে দেবে সবাই।

শীতকালের তুপুরবেলার বাওড। এভাবে বিন্ধেধরীর এই বাওড়কে অনাথ অনেকগুলো শীত হলো দেখে আসছে। একই ভাবে শুয়ে থাকে জলের এই এত বড় আস্তানা—তাকে ঘিরে এত গাছপালার এই বিরাট সমারোহ কতদিনকার কে জানে! গাছ বুড়ো হয়—নতুন গাছকে রেখে যায়। দূর দূর থেকে পাখিরা ওর জলে ভাসতে আসে খেলতে আসে।

জানেন বসুমশাই, আমি এই বাওড়ের তীরে তিরিশ বছর আগে আরেকবার এসেছিলাম।

অনাথ তাকিয়ে থাকলো।

আমাদের পূর্বপুরুষ কেউ হয়তো এখানে কখনো ছিল। ইলমবাজারে যেখে অজয়ের ওপর এখন পোল বেঁধেছে। তখন কিছু ছিল না। শাল জঙ্গলের নেশায় পেয়েছে তখন আমায়। পাথুরে মাটির ভেতর থেকে করাতি, কেউটে, শিয়রচাঁদা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ধরি। সন্ধ্যে হলে আল্লাতলার নাম করি। তখন নাথ-গান খুব গাইতাম। এ গোর, সে শ্মশানে ঘুরে বেড়াই। যদি কিছু শিখতে পারি।

এক জায়গায় তো তিন রাত নদীর ভাসা মড়া তুলে এনে তুকতাক শিখতে গেলাম। যুবতী মেয়েছেলের মড়া। বুকের ওপর বসে চালভাজা, কড়াইভাজা মড়ার মুখে ছুঁড়ে মারি। ঘুটঘুট্টে আঁধার। গোরস্তান জুড়ে একখানা চেরাগও নেই। কাছের গাঁ থেকে ঘিয়েভাজা কুকুরগুলো ডাকছে শুধু। নদীর ধার ধরে বীরভূমের গরীব গাঁ। রাতে কোন ঘরেই আলো জ্বলেনি।

খানিক পরেই দেখি, নদী অস্থি ছড়ানো গোরস্তানে জল উঠে আসছে। যার বুকে বসে আছি তার মুখে আর নিজের বাংলা ছ'নম্বরী খানিকটা দিতেই মালুম হল, মেয়েটি হাসছে আর কড়রমড়র করে কড়াইভাজা চিবুচ্ছে।

তখন নদী থেকে অনেক প্রাণী উঠে এসেছে। শয়ে শয়ে। ঘোমটা দেওয়া। খানিক পরে তারা আবার একজন হয়ে গেল। কী সুন্দরী আপনাকে কি বলব। এখনো চোখে ভাসে: তাকিয়ে দেখি—আরে। ওরই তো বুকে বসে আছি। তখুনি আসন নষ্ট হল।

জ্ঞান হলো পরদিন ভোরে। তখনো আলো ফোটেনি। গোরস্তান থেকে হেঁটে নদীতে গেলাম। জল অনেক দূরে। খুব তেষ্টা গলায়। হেঁটে নদীর বালিয়াড়ি পেরিয়ে জলে সবে মুখ দেব এমন সময় এক ধমক খেলাম।

তুই এখানে কি করছিস? বাড়ি যা! তোর সময় হয়নি এখনো। আমি না থাকলে কাল তো মরতে বসেছিলি। আবার আসনে বসা!

ভালো করে তাকালাম। হিঁদুবাড়ির জ্যাঠামশায় যেমন হয় তেমন চেহারা। লম্বা-চওড়া। পায়ে খড়ম। বালির ওপর রেখে জল নিচ্ছিলেন। বললেন, সময় হলে আসবি। তা তোর বাড়ি কোথায়?

বললাম। শুনে বললেন, চব্বিশ পরগনায় একটা প্রবল নদী আছে। বিদ্যেধরী। নদীটা শুধু নৌকো ডুবিয়ে খেলে।

আমার বাপ-মা নেই বসুমশাই—তা বছর বারো-তের হবে তখন। প্রাণে আর মায়া কিসের! এটা-ওটা শিখে বেড়াচ্ছি। বুক ঠুকে বললাম, চব্বিশ পরগনা চেনেন?

চিনবো না মানে। সে তো বড় জায়গা। বহুকাল যাওয়া হয় না।

তা আমি এখন কি করবো বলে দিন। কোথায় যাবো?

একটা জায়গার কথা বলতে পারি। তা তুই খুঁজে বের করতে পারবি? ঈশ্বরীতলার গা দিয়ে বিদ্যেধরী বয়ে গেছে। দেখবি বড় বড় নৌকো ভেড়ে সেখানে। বাওড় মত। নদীর গা থেকে বেরিয়ে সে জায়গাটা বন্দর হয়ে

গেছে। আমি একখানা বটগাছ বসিয়ে এসেছিলাম। এতদিনে ঝুরি নেমেছে নিশ্চয়—

বলতে বলতে জ্যাঠামশায় কমণ্ডলু হাতে শালজঙ্গলে আবার ফিরে গেলেন। আশ্চর্য! বালিতে ওঁর খড়ম একটুও বসছে না। অথচ আমাদের গোড়ালি ডুবে যায়। তখনই একবার এই বটতলায় এসেছিলাম। কেউ বলে দেড়শো বছরের গাছ। কেউ বলে সওয়াশো বছরের গাছ। খুঁজে দেখুন আশেপাশে আর কোন বট নেই। বটতলা নেই। এই একটিই যা। বন্দরের কথা অনেককে বলেছি। কেউ কিছু বলতে পারে না। একদিন বাওড়ে ডুব দিয়ে মাটি তুলতে গিয়ে হালের ওই মাথাখানা পেয়েছি। দেখুন গে—

অনাথ বাজিকরের হাতের আঙুল বরাবর তার নতুন ঘরের দরজার কাছে গেল।

ওই দরজাই সেই হালের মাথা। তাহলে বুঝুন কত বড় বড় নৌকো এখানে একদিন ভিড়তো। এই বাওড়ে। কত কেনাকাটা ছিল এই বটতলায়!

অনাথ ভালো করে তাকালো। এক কাঠের প্রমাণ সাইজের ঢালের মত কাঠখানা দিয়ে বাজিকর দরজা করেছে। এদেশে অত চওড়া গাছ নেই। বাজিকরকে বলল, তাহলে জ্যাঠামশাইয়ের বয়স কত?

॥ সতেরো ॥

তিন-তিনবার ব্যাঙ্কের রেজিস্ট্রি চিঠি ফেরত দিয়েছে বলে আদালত থেকে অর্ডার নিয়ে ব্যাঙ্কের লোক অনাথের বাড়ির গায়ে নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়ে গেল। তিন-তিনটে কিস্তি দেওয়া হয়নি অনাথের। ব্যাঙ্কের কোন দোষ নেই। সকাল-বেলাতেই তাড়িতে বেশ মৌজ এসেছিল। লোকজন, গোলমাল, বিনে পয়সায় মজা দেখতে আসা পড়শীদের ভিড় অনাথকে ক্ষেপিয়ে দিল। সবাইকে তাড়িয়ে ঘরে এসে যেই বসেছে অমনি শান্তা তাকে ধরলো।

ছোট মেয়েটা মর্নিং স্কুল থেকে ফেরেনি। বড়টা কলকাতার কলেজে ভর্তি হতে গেল। কাজ আছে বলে সঙ্গে গেলে না। ওস্তর কাছ থেকে কাল রাতে আমি নিজে ধার চেয়ে এনে দিয়েছি। টুকু যদি টাকাটা হারায়?

চিন্তা করছো কেন? হারাবে না। মাদুরে বসে অভয় দিচ্ছিল অনাথ।

আজও তো অফিসে যাবে না?

কে বলেছে তোমায়! তারপর হেসে বলল, আমার একদম অফিস যেতে ইচ্ছে করে না শান্তা।

সে তো জানি। ক'দিন হলো অফিসের নামে বেরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াও। কাল বংশীবাবু বলছিলেন।

ও, শান্তা! বংশী আবার কবে বাবু হলো?

মুরোদে বড় হয়েছে ছেলেটি। সবাই বাবু বলে—তাই আমিও বলছি।

তা কত সুদে ধার দিল?

সুদ কোথায়? ওই তার ঘট ভেঙে গুনে গুনে বের করে দিল। কী ভালোই না মেয়েটা! টুকু কলেজে পড়বে শুনে কি খুশী! এমন সময় বংশীবাবু এলেন—

উঃ, আবার বাবু বলছো কেন? কানে লাগে।

সকালবেলা নেশা না করে চান করে এসো তো।

যা বলছিলে বলো। এরপর ভুলে যাবে নয়তো!

ভুলবো কেন? বংশীবাবু তোমায় বড়বাজারের মসলাপট্টিতে অফিস টাইমে ঘুরঘুর করতে দেখেছেন। বললেন, দাদা কি ব্যবসাপাতি করছেন? আমি চুপ করে রইলুম। বংশীবাবু চলে যেতে—

আঃ, আবার বাবু!

শান্তা গায়ে মাখলো না। ওই আমায় দেখে বলল, বৌদিদিমণি তুমি আসবে তা বলে পাঠাওনি কেন? আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিতাম!

যত্ত সব বড়লোকি কথা।

বড়লোকির কি হল? বংশীবাবু তো সন্ধ্যের পর ওইকে নিয়ে গাড়িতে হাওয়া খেতে যান। কোন কোন দিন কলকাতায় ওরা থিয়েটার দেখতে যায়। ফেরে নিজের গাড়িতে। ট্রেনের জন্যে চিন্তা করতে হয় না।

তাও যদি বুঝতাম আমার হাতঘড়িটা ফেরত দিয়ে যেত!

একবার দিয়ে আবার কেউ ফেরত চায়? বাজে জিনিসগুলো আর খেয়ো না। এরপর অফিস যেতে পারবে না। মদন বদন তো আর আজকাল দিয়ে যায় না। ছাইপাশ ভেজাল জিনিস কি খাচ্ছো খেয়াল আছে?

ওদের দু'জনকে দেখলে?

হ্যাঁ। দু'ভাই আমায় দেখে টিপ করে প্রণাম করলে। ওরা তামাকের গোলায় বসে চৌকিদারি করে। বংশীবাবুর ফাইফরমাস খাটে।

কেমন ভগ্নীপতি একবার বোঝো। তাকে আবার বাবু বলছো!

খারাপ কিসের? নিজের লোকজন ডেকে ডেকে বসিয়েছে। একা লোক। কত দিক দেখবে বলতে পারো? আচ্ছা তুমি তো ব্যবসা করলে পারো!

সেই খোঁজেই বড়বাজারে ঘুরছি ক'দিন। কিন্তু অনেক টাকা লাগে।

তার চেয়ে বংশীবাবুর গোলায় বসে শেখো না কিছুদিন।

হাসালে শান্তা!

হাসির কি আছে? ব্যাঙ্কের নোটিশটা পড়ে ছাখো না একবার!

ওই নোটিশে কি লেখা আছে জানি শান্তা। আমার পড়বার দরকার নেই কোন।

কাল সন্ধ্যেবেলা বংশীবাবু বলছিলেন, বৌদি, দাদা তো একটা মহৎ কাজে নেমে আটকে গেছেন। আমরা থাকতে আপনি কোন চিন্তে করবেন না। দেশের কাজের জন্যে অসুবিধেয় পড়লে দেশের লোককেই এগিয়ে যেতে হবে। দাদাকে বলবেন তিনি একা নন। তাঁর মত ভালো লোকের সহায় আমরা। আমরা সবাই তাঁর পেছনে আছি। দাদার গাই দেখুন আমরা কেমন যত্নে রেখেছি!

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা বংশী নিজে এল গাড়ি চেপে। সঙ্গে রোকড় খাতা হাতে ক্যাশিয়ার। অন্ধকারে কোম্পানি বাঁধে বংশী কাপালির গাড়ির আলো অনেক বেশী জোরালো লাগলো। শান্তা গুঁতোগুঁতি করায় অনাথবন্ধু বারান্দায় বেরিয়ে এল।

বাইরে বেরিয়ে অনাথ চিনতে পারলো, আরে এ যে আমাদের জনতার প্রার্থীর গাড়ি!

ক্যাশিয়ার সমেত বারান্দায় উঠে এসে অনাথকে বংশী বলল, এ তো ঠিক গাড়ি নয়। সাইকেলের মত। মাঠঘাট দিয়ে দিব্যি চলে যায়। সিটগুলো ভাঁজ করে দিলে দেড় টন অব্দি মাল বয়ে নিয়ে যায়—

এ গাড়ি এখানকার সবাই চেনে। আগেকার অস্টিন। টিউব ফেটে গেলে খড় গুঁজে চালিয়েছে দক্ষিণা চক্কোত্তি। ভোটের পর ছাঁটাই ড্রাইভার এখন বংশীর পাকাপাকি সারথী। ছেলেটিকে চেনে অনাথ। রাসবাড়ির আদালত-হাটের কাছে বাড়ি। সে বারান্দা অব্দি কাপালি স্টোর্সের প্রোপাইটারকে পৌঁছে দিল।

গাড়িটার জন্যে আগেকার লোকজনের কাছে লজ্জা পায় বংশী। মানে আগে থেকে যারা তাকে চিনতো তাদের কাছে। অনাথবন্ধু সেই আগেকার একজন।

এসব লোকের সামনে তার মুখ দিয়ে আপনাআপনি কৈফিয়ৎ বেরিয়ে আসে। কেউ না চাইলেও সে দিয়ে থাকে।

এই সন্ধ্যেরাতেও তার অন্যথা হলো না।

দক্ষিণা জ্যাঠা ফেলেই রেখেছিলেন। চাকাগুলো কাদায় বসে গিয়েছিল। নগদ সাতশো তিরাশি টাকায় পুরনো লোহার দরে তুলে নিয়ে এলাম।

আবার তিরাশি কেন বংশী?

জ্যাঠামশায়ের সম্মান রাখতে। আমি সাতশো বলেছিলাম। উনি আটশো। টানাটানিতে তিরাশিতে এসে থামলেন। ওঁর দর থেকে আমি সতেরো টাকা কমাতে পেরেছিলাম। তারপর কিছু খরচা গেল। এখন দিব্যি চড়ে বেড়াচ্ছি।

শান্তা দরজা থেকে বলল, ওঁদের এনে ভেতরে বসিয়ে কথা বল।

শান্তার এই আপ্যায়ন অনাথের ভালো লাগছিল না। একবার মনে হল শান্তার সঙ্গে বংশীর কোন যোগসাজস নেই তো! ভাবতেই মাথাটা গরম হয়ে উঠলো। শান্তাকে আগাম বলে-কয়ে আসেনি তো বংশী?

বংশীর আগের দেনা দুটো কিস্তি দিয়ে আর দেওয়া হয়নি। সেজন্যেও একটা অস্বস্তি ছিল অনাথের। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার নিজের মুখে বংশীর জন্যে বিনয়, সম্ভ্রম ফুটে উঠছিল।

বংশীও ভালো ভাবে তাকাতে পারছিল না। সে জানে তার কবজিতে এই অনাথবন্ধুরই হাতঘড়ি। ঘড়িটা বড় পয়া। যে কাজে যায় টাইমে টাইমে যায়। কখনো আগেও না—পরেও না।

সেবারে অসুখের পর অন্নপথ্য করেই প্রথম যা কাজ করেছে বংশী তা হলো, হিসেবপত্র সিজিল মিছিল রাখতে সুবোধ নস্করকে ক্যাশিয়ার করে এনেছে। ব্যাঙ্ক, সেল ট্যাক্স, দোকান-কর—সব কিছু সুবোধ দেখে। ব্যবসা ধাঁধাঁ করে বেড়ে যাওয়ায় বড়বাজারের গদিতে সে এখন টোব্যাকো মারচেণ্ট শ্রীবংশী কাপালি।

কাজের কথা পাড়তে হবে বলে সুবোধকে সঙ্গে এনেছে বংশী।

মাদুরে বসেই কথা হচ্ছিল। বংশী ভূমিকা না করে বলল, বাজার এলাকায় ঘুম হয় না। চব্বিশ ঘণ্টা হই-হট্টগোল। দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি করারও সময় নেই। আপনার বাড়িটা দিয়ে দিন দাদা।

আমি কোথায় থাকবো?

আপনি তো টুকুদিদিকে কলকাতায় কলেজে পড়াবেন। তিনি তো আর এখান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে পারবেন না।

কেন পারবে না? কত ছেলেমেয়ে করছে?

তাতে তো পড়াশুনো ভালো হয় না। বে-নিয়মের ট্রেন দিদিমণির সহ্য হবে না। আপনাকে সেই কলকাতাতেই থাকতে হবে। ছোট খুকীও তো পড়ছে।

তার কলেজ এখনো দেরি আছে।

একদিন তো সেও কলেজে পড়বে!

তাতে কি হয়েছে বংশী? ঈশ্বরীতলাতেও তো কলেজ হয়েছে। পায়ে হেঁটে পড়তে যাবে সেখানে। অন্য ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে না? তাছাড়া—

তাছাড়া কি দাদা?

বাড়িটা তো ব্যাঙ্কের। ওরা টাকা পায়। তাই মর্টগেজ আছে।

ব্যাঙ্কে গিয়ে শুনেছি সে-সব কথা। ম্যানেজারবাবু বললেন, এখনো সুদ তেমন হয়নি। এখনো ছাড়িয়ে নেওয়া যায়।

টাকাই নেই আমার হাতে।

আমার কাছ থেকে নিন। নিয়ে বাড়ি ছাড়ান।

ছাড়ালে সে বাড়ি তুমি ছাড়বে বংশী?

ছাড়ানোর পর আপনাদের যতদিন খুশী থাকুন। এভাবে ব্যাঙ্কের গর্তে বাড়িটাকে যেতে দেবেন না দাদা। ব্যাঙ্ক শোধ করেও আপনার হাতে ভালো টাকা থাকবে—সেভাবেই আমি ভেবেছি।

অনাথ ছেলেটিকে দেখছিল আর অবাক হচ্ছিল। বেশ সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলে। বছর দেড়েক আগেও স্টেশনবাজারে ছোকরার নাম ছিল—বংশী তেলেভাজা। তারপর কিছুদিন বাদে ওকে সবাই বলতে লাগলো—হোলসেলার বংশী। এখন টোবাকো মারচেণ্ট বি. সি. কাপালি। নামের মাঝে চন্দ্রটা যে এতকাল কি করে লুকিয়েছিল! ঈশ্বরীতলায় যাত্রা, থিয়েটার, ফুটবল—সব কিছুতেই প্রধান পৃষ্ঠপোষক এখন বি. সি. কাপালি।

তোমার বড় শালা এখন কোন্ জেলে?

এদিককার কোন আলোচনা বংশীর পছন্দ নয়। আস্তে বলল, বাঁকুড়ায় জেলে আছে। তাহলে আজ উঠছি। আপনি ভেবে দেখুন। আগেকার দরুন হিসেবটা যদি দেখতে চান—তাই খাতাখানা এনেছিলাম।

অনাথ কোন কথা না বলে চুপ করে থাকলো।

বংশীর গাড়ি কোম্পানি বাঁধ কাঁপিয়ে দিয়ে একসময় চলে গেল।

রাতে খেতে বসে অনাথ টুকুকে বলল, তুই তো এবার থেকে কলকাতায় পড়বি। আমরা সবাই মিলে কলকাতায় থাকলে কেমন হয়?

ঈশ্বরীতলা ছেড়ে চলে যাবো আমরা?

যদি যাই।

তা হয় না বাবা।

অনাথ মনে মনে ভাবলো, টুকু আর আগের মত তাকে বাবু বলে না।

কেন হবে না? আমরা তো আগে কলকাতাতেই থাকতাম। তোকে চার বছরের নিয়ে এখানে এসেছিলাম। লিলি ছিল কয়েক মাসের।

তা হয় না বাবা। তুমি কত কিছু করলে এখানে।

কলকাতায় গিয়ে আবার করবো।

মানুষ কি বার বার পারে? না তা হয়?

কথা আর এগোলো না। ইদানীং একটা জিনিসে অনাথ খুব আনন্দ পায়। তার চোখের সামনে টুকু বড় হচ্ছে। গম্ভীর হচ্ছে। সুন্দর হচ্ছে। ছোট-খাটো ইচ্ছে হয় টুকুর। তা অনাথকে বলে। একখানা ধনেখালি শাড়ি দেখেছে গড়িয়াহাটার দোকানে। কিংবা কিছু গন্ধদ্রব্য। সেন্ট কথাটা ভালো লাগে না অনাথের। স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেলেও টুকু সে কথা অনাথকেই বলবে। সে তুলনায় লিলি অত বাবা-ঘেঁষা নয়।

ক'দিনই অনাথ বড়বাজার এলাকায় ঘুরেছে। ঘুরেছে বউবাজারেও। মশলার ব্যবসা করবে? না প্রেস ব্যবসা? লেটার প্রেস। অর্ডার ধরে এনে কাজ করিয়ে ডেলিভারী দেবে। মারজিনটাই লাভ। ছ'মাস ধরে যদি ঘোরাঘুরি করতে পারতো, অফিস থাকতো না।

কিন্তু তা কি করে হয়? সংসার চালানোর রানিং কস্ট্ কোথা থেকে আসবে? আজ যদি তার হাতে কিছু ক্যাপিটাল থাকতো। তাহলে সে ঝাঁপ দেবার সাহস পেত। ধার শোধ দিয়ে বাড়িটা ঠিক ছাড়িয়ে নিতে পারতো।

কথাটা নেহাৎ মন্দ বলেনি বংশী। এভাবে ব্যাঙ্কের গর্ভে বাড়িটাকে যেতে দেবেন না দাদা। টোব্যাকো মারচেন্ট বি. সি. কাপালি তাকে বড়বাজারেই দেখে থাকবে। কাঁচালঙ্কা নতুন উঠলে ঈশ্বরীতলায় এক টাকা কেজি পাওয়া যায়। তাই শুকিয়ে শুকনো লঙ্কা বড়বাজারে দশ টাকা কেজি সাপ্লাই দিতে পারলে মোটা লাভ।

অনেক জিনিসই এমন মনে মনে অঙ্ক কষে দেখে অনাথবন্ধু। কিন্তু শেষ অব্দি বাঁধা মাইনের চাকরিতে হাজিরা দিতে ছোটে রোজ। সাহসে কুলোয় না।

দেখতে দেখতে সতেরোই শ্রাবণ এসে গেল। দেশসুদ্ধ ডোবা, নালা, খাল, পুকুর সবই বর্ষার জলে থই থই করছে। এই রোদ ওঠে। এই বৃষ্টি। মাঠে মাঠে ধানচারা মাথা ঠেলে সেয়ানা হয়ে উঠতে চাইছে। আপ ট্রেন ঈশ্বরীতলায় এসে দাঁড়ালে দেখা যাবে, কামরায় কাদা পায়ে চাষীরাসী মানুষজন পাটাতনে বসে আছে। এই ট্রেনই যে রোজ কলকাতায় যায় তা কেউ বিশ্বাস করবে না। এখানকার চাকুরেরা অফিস টাইমে ট্রেনে উঠে বিরক্তিতে বলে, খামার-গাড়ি!

সতোরোই শ্রাবণ পীরসাহেবের দরগায় সবাই যায়। স্পেশ্যাল ট্রেন চলে। পার্টিশনের আগে দু'একবার ফজলুল হক সাহেব, সুরাবর্দিও গেছেন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সবাই যায়। কলকাতার চীনে খ্রীষ্টানরা তো যাবেই। সিন্নি চড়াবে। মক্কা পুকুরে কাগজের নৌকো ভাসাবে। বড় জাগ্রত। বাবা সাহেব সব কথা শোনেন মাজারের ভেতর শুয়ে। লোকে তো তাই বলে।

অনাথ সবাইকে নিয়ে রওনা দিল। বেলাবেলি। ঘরে ঘরে চাবি দিল। সদরেও দিল। বলাই নেই। বাঘা নেই। শুক্লা নেই। উমা নেই। অরুণ বরুণ নেই। খাসিপাঠা বিক্রি সারা। থাকবার মধ্যে পাঁচটা বুড়ো পাতিহাঁস। ডিমের দেখা নেই। তারা এখন থইথই খালে চরে বেড়াচ্ছে। এ মৌজা থেকে সাঁতরে ও মৌজায় চলে যাচ্ছে।

শান্তার অনেকদিনের ইচ্ছে বড়পীরের দরগায় সিন্নি চড়ায়। ঈশ্বরীতলায় এসে তাদের জীবনটা সুন্দর তালে চলছিল। গত দু'বছরে সব কী রকম ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। ইদানীং অনাথকে সে একটাও ভালো কথা বলতে পারেনি। অথচ এই ঈশ্বরীতলায়—

যাত্রা দেখতে গিয়ে হোল ফ্যামিলি সিজন্ টিকিট কেটে সারারাত একদম সামনে বসে বিষবৃক্ষ, আবুহোসেন, স্বর্ণলতা দেখেছে। শেষরাতে ফেরার পথে অনাথ নীলাম থেকে টাটকা রুই কিনে ফিরেছে।

নতুন বাড়ির দরজায় রঙ হবার সময় মজুরি বাঁচাতে শান্তা নিজে তুলি বুলিয়েছে। উমাকে বরণ করে এই তো সেদিন ঘরে তুললো। বাঘা এসেছিল ছোটটি। সব কি হয়ে গেল আস্তে আস্তে!

দরগায় ভিড় ঠেলে এগোয় কার সাধ্য! লিলি তো ঘেমে অস্থির। তার

ভেতর মাঝে মাঝে বৃষ্টি। আবার ভ্যাপসা গরম। প্যাচপেচে কাদায় জুতোর দফারফা।

ওরা ফিরতি ট্রেন ধরলো বিকেল পাঁচটায়। সে ট্রেন ঈশ্বরীতলায় আসে বিকেল পাঁচটা কুড়িতে।

টুকু বলল, নামো বাবা। আমরা এসে গেছি।

নামতে হবে না। বালিগঞ্জের টিকিট কেটেছি। আজ কলকাতায় বেড়াবো আমরা।

এই ভিড়ে লিলি তো খুব খুশী।—বড় খুড়ীমার বাড়ি যাবো বাবা?

কতবার বলেছি খুড়ীমা বলবে না! কাকীমা বলবে।

ওই হলো। একই তো বাবা।

বালিগঞ্জে এসে অনাথবন্ধু ট্যাক্সি নিল।

শান্তা বলল, ফিরে গিয়ে আমি কিন্তু রাঁধতে পারবো না।

রাঁধতে হবে না।

শান্তা ভাবলো, অনাথ তাহলে হোটেলে খাওয়াবে আজ।

ট্যাক্সি এসে শ্রীমোহন রোডে একটা দোতলা বাড়ির সামনে থামলো। একতলায় গ্যারেজের ভেতর লণ্ড্রী। পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে অনাথ বলল, এসো।

শান্তা নেমে বলল, কাদের বাড়ি! শাড়িটাড়ি ভিজে একদম ময়লা হয়ে গেছে। এ অবস্থায় কেউ বেড়াতে আসে? তোমার যেমন বুদ্ধি!

চলোই না।

ওপরে উঠে শান্তা দেখলো, বেশ চওড়া লাল বারান্দায় নিওনের আলো জ্বলছে। পাশের দরজায় আরেকটি ফ্ল্যাট।—কাদের বাড়ি গো?

ভেতরেই এসো না।

কোথায়? কেউ তো নেই!

অনাথ বলল, বসো।

কেউ নেই, বসবো কি?

একটি ছেলে বেরিয়ে এল, এসে গেছেন! আমি জলটল সব তুলে রেখেছি।

অনাথ বলল, বাজারটা ভাই আজ তোমায় করে দিতে হবে।

শান্তা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে। লিলি-টুকুরও সেই অবস্থা।

এটা আমাদের বাড়ি টুকু। ভাড়া বাড়ি। ঘুরে দেখে এসো। তিনখানা ঘর। দুটো বাথরুম। কিচেন। স্টোররুম। কমপ্যাক্ট ফ্ল্যাট।

শান্তা বসবার সোফায় বসে পড়লো। এসব খাট-পালঙ্ক, সোফাসেট, আলমারি—এসব কাদের?

কিনতে হয়েছে। নাও একটু বিশ্রাম করে নাও। বাজার এলে আমি তোমায় হেল্প করবো। স্টোভ, কেরোসিন সবই আছে।

লিলি সারা বাড়ি এক চক্কর ঘুরে এসে বলল, সুন্দর বাড়ি বাবা! এ সব আমাদের?

সব।

এতক্ষণ টুকু কোন কথা বলেনি। এবারও বললো না। শান্তা বলল, টাকা পেলে কোথায়? প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে তুলেছো নাকি?

পাগল! দুটো মেয়ে আছে না আমাদের? তোমার কথামত ভবিষ্যৎ?

তবে?

রহস্য ঘনিয়ে তুলতে অনাথ বলল, শুধু কি ফার্নিচার? সেলামিই তো দু'হাজার টাকা দিতে হলো। এমন সুন্দর পজিশনের বাড়ি কি সহজে জোটে? বিউটিফুল লোকালিটি। টুকু তুই ইচ্ছে করলে এখান থেকে হেঁটেই কলেজে যেতে পারবি।

আমার বইখাতা বাবা? আর যা বলতে পারলো না টুকু—তা হল তার পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে বিকাশদার কয়েকখানা চিঠি আছে। আছে একটা সাদা হাড়ের বেলফুল। বিকাশদা উপহার দিয়েছিল। গতবার দোল-পূর্ণিমার রাতে। একবেণী করে তাতে গুঁজে রাখে টুকু। সন্ধ্যের দিকে। আলো পড়লে ঠিক ফুল মনে হবে।

কাল-পরশু লরিতে সব নিয়ে আসবো।

আমরা আর ঈশ্বরীতলায় যাবো না বাবা?

না।

এ বাড়িটা টুকুর পরের বাড়ি লাগছিল। বেড়াতে বেরিয়ে এমন বাড়ি-ছাড়া হওয়ার কথা কে কবে শুনেছে!

বিছানাপত্র ছিঁড়ে গিয়েছিল, সব নতুন করিয়েছি। কেমন হয়েছে শান্তা? খাটগুলো অবিশ্যি ভাড়া। ঈশ্বরীতলা থেকে মালপত্র এনে ফেরত দিয়ে দেব। ক'দিন ধরে ঘুরে ঘুরে সব করিয়েছি। সুইচ টিপে পাখাও চালিয়ে দিল অনাথ।

পাখা তিনটেও ভাড়ায় এনেছি। বাথরুমে গিয়ে চান করে এসো না। নতুন সাবান তোয়ালে সবই আছে। রান্নাঘরে এক মাসের মত গুঁড়ো মশলা, টুকিটাকি, বঁটি, চিনেমাটির প্লেট সবই রেখেছি। কম ঘুরতে হয়েছে আমায়!

শান্তা ঠাণ্ডা গলায় বলল, কবে এ-সব করলে?

মাসখানেক ধরে। অফিসের পর একটু একটু করে কেনাকাটা করে গুছিয়ে রেখে গেছি। লণ্ড্রীর ছেলেটি খুব সাহায্য করেছে।

যাকে বাজারে পাঠালে?

হ্যাঁ। এই তো এসে গেছে। কি মাছ পেলে বিনোদ?

তখনো শান্তার হকচকানো ভাবটা কাটেনি। আজও সকালে ছাদে উঠে গুঁড়ো কয়লার গুল দিয়ে রেখেছে সে। পাছে ভিজে যায় তাই চিলেকোঠার কার্নিশের আড়ালে সাজিয়ে রেখে তবে শান্তা নীচে নেমেছে। চুলোর আঁচ ধরানোর পাখাখানা জানলার শিকে বাঁকা করে গোঁজা আছে।

কই এনেছি সাতশো। সস্তায় পেলাম।

যাও। তোমার ছুটি ভাই। অনেক করেছো।

ছেলেটিকে দরজা অব্দি এগিয়ে দিয়ে এসে অনাথ বলল, চিন্তা নেই কোন। গ্যাসও আনিয়ে রেখেছি। আমাদের অফিসের ডেসপ্যাচের নীরেন এ-পাড়ায় থাকতো। সে-ই এ-বাড়ির খোঁজ দিল। গ্যাসের ব্যবস্থা করে দিল। এখন বেচারা আচমকা আসানসোল অফিসে বদলি হয়ে গেছে। ফ্যামিলি রেখে গেছে অবশ্য। ওর গিন্নীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব তোমার, ভালো লাগবে।

আমি কারও সঙ্গে আলাপ করব না। ঈশ্বরীতলায় আমরা কখন যাবো বল? লাস্ট ট্রেনে? এই লিলি? ঘুমোস নে—

আমরা আর কোনদিন যাবো না শান্তা। ঈশ্বরীতলায় আর কখনো যাবো না।

কেন বাবা?

টুকু আরও কিছু বলতো। তুই থাম্—বলে টুকুকে চুপ করিয়ে দিয়ে শান্তা জানতে চাইলো, কেন? পরিষ্কার করে বলো। অ্যাতো টাকাই বা তুমি পেলে কোত্থেকে? খুলে বল!

আগে রান্না চাপাও তো। পরে রাতে শুয়ে শুয়ে বলবো'খন।

না। আমরা ঈশ্বরীতলার বাড়ি গিয়ে শোব। লাস্ট ট্রেনে গেলেও যাবো।

তখন তো রিকশা পাবে না শান্তা। অতোটা হাঁটতে পারবে?

রিকশার পরোয়া করে কে! সেটা আমাদের নিজেদের বাড়ি। সেখানে আমাদের সব পড়ে আছে—আর কিছু বলতে পারলো না শান্তা। মাথা নীচু করে ফেললো। কান্নায় তার গলা বন্ধ হয়ে এসেছে। চোখ ঝাপসা। একটা অপরিচিত জায়গায় সে শোবে কি করে? কি করে রান্না করবে? খাবেই বা কি করে?

আজও দুপুরের রান্না সে-বাড়িতে শান্তা রেঁধেছে। গণেশের মায়ের কাছ থেকে তিনপো দুধ নেওয়া আছে। চারদিক থেকে বন্ধ থাকলেও বেড়াল ঢুকতে পারে বাগানের দিকের জানলা দিয়ে। ছিটকিনি দেওয়া হয়নি, এখন মনে পড়ল শান্তার।

আরও মনে পড়ল, বিছানায় ওঠার আগে যে পাপোষে পা ঘষে মেয়েরা, মেয়েদের বাবা বিছানায় আসে—সেটা আজই সকালে সে রোদে শুকোতে দিয়েছে। ভেবেছিল বিকেলে তুলে আনবে।—তুমি কোত্থেকে অ্যাতোগুলো টাকা পেলে? বলতেই হবে তোমাকে। আজ ক'মাস না ব্যাঙ্কের কিস্তি দিয়ে তোমার হাত একদম ফর্সা।

বংশী দিয়েছে।

আমাদের বংশী? ওষ্টর বর বংশী কাপালি? আবার এত টাকা ধার করলে তার কাছ থেকে? টুকুর কলেজে ভরতির দরুন আমি টাকা এনেছি ওষ্টর কাছ থেকে।

ধার না শান্তা। টোব্যাকো মারচেণ্ট বংশী কাপালি আমাদের বাড়ি কিনে নিয়েছে।

শান্তা উঠে দাঁড়ালো, কিনে নিয়েছে? যাঃ! তুমি সত্যি কথা বলছো না

হ্যাঁ, সত্যি।

দলিল হলো কবে?

এখনো হয়নি। হবে। তুমি সই দেবে। আলিপুর রেজিস্ট্রী অফিসে গিয়ে আমি দিচ্ছি নে।

না দিয়ে উপায় নেই শান্তা। বংশী ব্যাঙ্কের দেনা সব শোধ করে দিয়েছে। তাছাড়া এসব বংশীর টাকাতেই। আমাদের মালপত্র লরিতে চাপিয়ে ও নিজে আসবে বলেছে।

এ তুমি কি করলে বাবা?

টুকুর মুখে আর কিছু এল না।

বড়পীরের দরগায় ভ্যাপসা গরমে ঘোরাঘুরি। তারপর ট্রেনের ভেতর ভিড়ে লাদাই হয়ে যাতায়াত। সবারই গায়ে ঘাম শুকিয়ে ঘাম দিয়েছে ক'বার। চোখের

নীচে কালি। মাথা উসকোখুসকো। সেই সঙ্গে খিদে। এবং এত বড় একটা ধাক্কা। লিলি সব না শুনেই ঘুমিয়ে পড়েছে সোফায়। শান্তা মাথা নীচু করে বসে। টুকু দাঁড়িয়ে উঠেছে।

অনাথ বলল, এ ছাড়া আমি কি করতে পারতাম টুকু? বংশীর টাকা দিয়ে আমি আরেকবার জীবন শুরু করবো ভেবেছি। অফিসের দেনাও সব শোধ। এ মাস থেকে পুরো মাইনে পাবো। ঈশ্বরীতলায় আমাদের বিছানাপত্তর, জামা-কাপড়ও ছিঁড়ে গিয়েছিল। কাল তোর মাকে নিয়ে বেরোবি। তোদের দরকারী শাড়িটাড়ি কিনে নিবি। রেকর্ড-প্লেয়ারটা এলে কিছু নতুন রেকর্ড কিনতে হবে। বংশী হয়তো মালপত্র নিয়ে কালপরশু এসে যাবে।

তবু ঈশ্বরীতলা ভালো ছিল বাবা।

না, ছিল না। দেনায় আমাদের বাড়িটা সুদের নীচে তলিয়ে যাচ্ছিল। এরপর পে অ্যাটাচ্ হতো। তখন?

তুমি তো একটা ভাল কাজ করতে গিয়েই আটকে গিয়েছিলে বাবা।

সে কথা কে বুঝলো বল্। ব্যাঙ্ক? ঈশ্বরীতলার মানুষজন? কেউ এগিয়ে এসেছিল? বংশী নূতন বড়লোক। ঝোঁক হয়েছে বলে কিনলো। নইলে অন্যত্র ক এ টাকাও আমি পেতাম।

তুমি খেটে রোজগার করে কি ও টাকা ফেরত দিতে পারতে না? ওখানে যে আমাদের অনেক কিছু বাবা!

দ্যাখ্ তো, তোদের জন্যে নতুন নেটের মশারি টানিয়ে রেখেছে বিনোদ।

শান্তা এবারে পরিষ্কার চোখে তাকালো।—তাই বলে তুমি বেচে দেবে? ওটা আমাদের প্রথম জীবনের বাড়ি!

আবার বাড়ি হবে শান্তা।

আবার ও-রকম খাটতে পারবে? রিস্ক নিতে পারবে? সে বয়েস আর আছে তোমার আর বাড়ি হলেও ওরকমটি আর হবে না দেখো। বলতে বলতে শান্তার মনে পড়লো, ইদানীং রাতের দিকে উমার ফাঁকা গোয়ালের দরজার জায়গাটা খানিক অন্ধকারে ভরাট হয়ে তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তখন খেয়াল হয়, উমা তো আর নেই। সে কথা ভেবে শান্তার বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠলো।

ঈশ্বরীতলার চেয়ে অনেক ভালো বাড়ি হবে আমাদের, দেখে নিও।

ওরকম আর হবে না—তুমি একবার জানালে না পর্যন্ত!

কাউকে জানাইনি। বংশীর বারণ ছিল। ও চুপেচাপে কিনতে চেয়েছিল। আমারও ইচ্ছে ছিল না কেউ জানুক।

সে-রাতে রান্নাও হল। লিলি বাদে তিনজন খেতে বসলো। খেলো শুধু অনাথ, বাকী দু'জন নাড়াচাড়া করে উঠে গেল।

শুয়ে শুয়ে শান্তা নিজেকে দেখতে পেল। কোন নতুন জায়গায় কার বা ঘুম আসে! তখনো কোম্পানি বাঁধে রাস্তা বানিয়ে উঠতে পারেনি অনাথ। রিকশা সাইকেল এবড়োখেবড়ো মাটির ওপর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে এগোচ্ছিল। অনাথ লাফিয়ে নেমে বলল, এই জায়গাটা কিনেছি শান্তা। কেমন খোলামেলা, তাই না?

এখানে বাড়ি করে অফিস করতে পারবে?

কত লোক করছে না। খুব পারবো।

নিজেকেও দেখতে পাচ্ছিল শান্তা। তার মুখখানা তখন কত ফ্রেশ ছিল। চুলে কপাল অনেক বেশী ঢাকা থাকতো তখন। আজকাল আয়নায় নাকের দু'দিকে যে ভাঙা দাগ দুটো দেখতে পায় তা একদম ছিল না। অনাথ তো রীতিমত যুবক।

ঘুম সব সময় ক্লান্ত, বিষণ্ণ প্রাণীদের শাসন করতে ভালোবাসে। কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে শান্তা টের পেল না।

বেশী রাতে উঠে অনাথ মেয়েদের ঘরে গেল। লিলি কিছুই টের পায়নি। মড়ার মত ঘুমোচ্ছে। কাল সকালে উঠে সবটা বুঝতে পারবে।

টুকু কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়ে আছে। রাস্তার আলো ঢুকে পড়েছে ওদের মশারিতে। অনাথ ঝুঁকে পড়ে দেখলো, মেয়েটার চোখের নীচে কান্নার শুকনো দাগ। কিচ্ছু করার নেই। ঘরের আলো জ্বেলেছিল, নিভিয়ে দিল অনাথ।

টুকু তখন সন্তোষ টাকির সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে চরের সবজি চাষের জায়গা দেখতে বেরিয়েছে। শীতকালের সকালবেলা।—সন্তোষদা একটু দাঁড়াও! তোমাদের ছোট্ দাদাবাবু পিছিয়ে পড়েছে। দু'জনে একসঙ্গে পেছনে ফিরে তাকালো।

বিকাশ ধুতি পরে অ্যাতোটা পথ চোরকাঁটা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে আসছিল তাই পিছিয়ে পড়েছে। সন্তোষ টাকি মুখে এক রকমের আওয়াজ করলো। অনেকটা—আবা—আবা—আ—আ—

চরের জায়গা, ধানক্ষেত, কোম্পানি বাঁধ, রেল লাইন—সব জায়গায় সে-ডাক ছড়িয়ে পড়লো। কাঁপতে কাঁপতে। লম্বা হয়ে। থামতে চায় না।

টুকু ভয় পেয়ে মাটিতে বসে পড়লো।

কী হলো টুকুদি? ওঠো। এ কি! কাঁদছো কেন?

তোমার চিৎকারে বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। ও কি ডাকের ছিরি!

হাঃ হাঃ করে হাসলো সন্তোষ টাকি।—ডাকাতি করে ফেরার পথে মাঠের ভেতর পড়েই এই আওয়াজ দিতাম। গেরস্থদের বুক কেঁপে উঠতো।

কতদিন তুমি ডাকাতি করো না সন্তোষদা?

তা অনেকদিন হয়ে গেল। কায়দাটাই ভুলে গেছি। এখন ডাকাতি করতে গেলে ধরা পড়ে যাবো টুকুদি।

কেন?

একদম অভ্যেস নেই যে দিদি।

বিকাশ এসে পড়ায় ওরা তিনজন ছুটতে ছুটতে এগোতে লাগলো। আর মাইলটাক গেলেই সবজি-চাষীদের ঘর। ফাঁকা মাঠে এক থোকা সবুজ জায়গা এতদূর থেকেও চোখে পড়ছে।

টুকু তিনজনকেই দেখতে পাচ্ছিল। সে নিজে, বিকাশ, সন্তোষ টাকি। ধানকাটা মাঠের ওপর দিয়ে তিনজন ছুটেছে। যেন কোন অ্যাড্ভেঞ্চারে বেরিয়েছে। শীতের সকালের আরামের রোদে ওরা চান করতে করতে ছুটছিল।

অনাথ চুপচাপ এসে শান্তার পাশে শুয়ে পড়লো। ঘুম তাকে ছুঁয়েও দেখলো না।

শুয়ে শুয়ে অনেক কথাই তার মনে এল। বংশী বলেছে, দাদা আপনি নিশ্চিন্তে চলে যান। জিনিসপত্র সব কিছু আমি লরি বোঝাই করে পৌঁছে দেব। তেলের শিশির মুখটিও পড়ে থাকবে না।

সেলামি দেবার সময় অনাদের সঙ্গে বংশী নিজে এসে এ-বাড়ি দেখে গেছে।

বিক্রিবাটা নিয়ে গত ক'মাস ধরেই বংশীর সঙ্গে কথা হয়েছে তার। সে যা বুঝেছে তা হল বংশী এমন বাড়ি একটা কেন দু'দুটো বানাতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরীতলায় বসে অনাথবন্ধু বসুর বসতবাড়ি কেনায় যে নামডাক হওয়ার চান্স আছে তা টোব্যাকো মারচেন্টের কাছে কম নয়। তাই ও বাড়ি কিনতে বংশী কাপালির অত ঝোঁক।

অনাথ বৃষ্টির রাতে কোম্পানি বাঁধে দুটো জলন্ত নীল মার্বেলের ছুটে আসা দেখতে পাচ্ছিল। মনে মনে দু'বার ডাকলো, বাঘা! বা—আ—ঘা—আ—

জোরে ডাকার উপায় নেই। শহর কলকাতার ভাড়া বাড়ি।

তবু খুব ইচ্ছা হল একবার বুকভরে ডাক দেয়। বৃষ্টির ভেতর বিদ্যুৎ

চমকালে বাঘার ছুটে আসা দেখতে পাওয়া যেত। নিরুদ্বেগ দুলকি চালে ও আসতো। একদম কোন স্টেটের নায়েব মশায়দের হাঁটা-চলা রপ্ত করেছিল বাঘা।

ভাদ্র মাসের দশ তারিখ ওষ্টর খোকা হল। মহা ধুমধামে আটকড়াই ফুট-কড়াই গেল। কোম্পানি বাঁধের আগাগোড়া বংশী কাপালি টুনি ডুম ঝুলিয়ে দিল সন্ধ্যেবেলায়। অনাথদের গোয়াল সাফ করে বংশী সেখানে উমাকে রেখেছে। তার গলাতেও একটা টগরের মালা পরিয়ে দিল।

ঈশ্বরীতলায় সবাই বললো, বংশী কাপালির কপাল! একই বছরে বকনা বাছুর, মাগের কোলে খোকা, তারপর অমন ছবির মতন বাড়ি। আহা রে! অনাথবাবু লোকটা ভালো ছিল। বিক্রিবাটা করে একবস্ত্রে কলকাতা চলে গেল।

আশ্বিনের গোড়ায় ওষ্ট উঠে বসলো। উঠেই এক কথা, হোলসেলার! এবার তুমি নতুন বাড়িতে দুর্গোৎসব লাগাও।

পাগল নাকি? হাতে বিশ দিনও সময় নেই। এত অল্প সময়ে দুর্গাপুজো হয় নাকি? ক্ষেপেছো!

না হোলসেলার, দুর্গোৎসব তোমায় করতেই হবে। ঈশ্বরীতলার ভালো ভালো লোকজনকে আমি ডেকে খাওয়াবো।

তাহলে তো অনাথদাকেও ডাকতে হয়। তোমাদের বাড়ির এমন উপকারী বন্ধু।

না। সে মানুষটাকে আর এখানে ডেকো না। শুধু শুধু কষ্ট দিয়ে লাভ কি!

গ্রামদেশে মানুষ না খেয়ে মরে না। কিছু না হোক, পুকুরপাড়ে ঢেঁড়সের দানা ছড়িয়ে দেয়। মানকচু বসায় ছাই দিয়ে, মজুত করে। বর্ষার ভাসা মাছ ধরে খায়। আধপেটা, সিকিপেটা খেয়েও বেঁচে যায়।

এক চালির মূর্তি এল। ওষ্টর মা গরদ পরে বারান্দায় বসে থাকলো সপ্তমীর সারাটা দিন। বড়লোক জামাইয়ের অর্ডার। তদারকির দুই মাস্টার—মদন আর বদন। ঢাকীরা ঢাক বাজালো সন্ধিপুজোর সকাল থেকেই। ভটচাজ পেল মোটা সিধে।

ভাসানের পরদিন ঈশ্বরীতলা ঝেঁটিয়ে লোক এল। বংশী ভিয়েন বসিয়ে আর-না আর-না করে খাওয়ালো। ব্রাহ্মণরা একটি করে কাঁচা টাকা দক্ষিণা নিল।

ভিড়ের ভেতর মদন একবার ছোট বোনকে বলল, অনাথবাবুকে বললে পারতিস।

না। এলে শুধু শুধু কষ্ট পেতেন।

বৌদিদি, খুকী দু'জনকে অন্তত বলা যেত।

তাঁরা আসতেন না।

খাওয়াদাওয়া চুকবার মুখে মহম্মদ বাজিকর এসে হাজির। তখন গভীর রাত।

কই গো, ওষ্টরানী কোথায়? আমি কিন্তু একা আসিনি। সঙ্গে জগেন আছে।

ওষ্ট এখন গিন্নীবান্নি মানুষ। তবু লাল বারান্দায় ছুটে এল। বসুন বসুন। আপনাকে খবর দিয়ে উঠতে পারিনি। আপনি নিজে এসেছেন দয়া করে, খুব ভালো হলো।

নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালো দু'জনকে। পরিবেশন করল মদন বদন।

তোমার চিন্তা কিসের? এমন রাম-লক্ষ্মণ ভাই।

ওষ্টর চোখ ছলছল করে উঠলো, বড়দা এখন কেষ্টনগর জেলে বদলি হয়েছে। ছাড়া পেতে আরও পাঁচ মাস।

অন্ধকার কোম্পানি বাঁধে লম্বা ছায়া ফেলে বাজিকর চলে গেল। এই লোকটা একদিন দুপুরে তাকে বাওড়ের জল থেকে তুলেছিল। নইলে ওষ্ট খানিক বাদে ভেসে উঠতো।

কার্তিকের শেষদিকে ধানে দুধ এল। কার্তিকশালী ধান তো—দানা শক্ত হয়ে পেকে উঠেছে। খাল, বিল, ডোবার জলে টান ধরলো। ওষ্টর খোকা এখন হাসালে হাসে। তার দেখাশোনার ডিউটি পড়েছে মদনের ওপর। বদন থাকে তামাকের গোলায়। বংশীর নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। বালিগঞ্জ রেলগুদাম থেকে মাল উঠছে টেম্পোতে। ফিওয়াগনে গুদামবাবুকে পান খাওয়াতে হচ্ছে।

ঈশ্বরীতলা স্টেশনে বেলা একটা উনবাটের ডাউন ট্রেন এসে থামলো। কোলে মার্কেটে সবজির বোঝা নামিয়ে দিয়ে যারা ফেরার তারা ট্রেন থেকে নেমেই তড়িঘড়ি ঘরে ছুটলো। নাইতে হবে খেতে হবে।

স্টেশনবাজারে দোকানপাট খোলা থাকলেও এখন সবাই প্রায় দোকানে

বসে ভাত-ঘুমের ঢুলুনি ঢোলে। অনাথের দিকে কেউ ফিরেও তাকালো না। একজন লিডার মরে যাওয়ায় আজ সকাল সকাল অফিস ছুটি হয়ে গেল।

কোম্পানি বাঁধে উঠে অনাথ অবাক। আবার কে এ মাঠে চাষ করলো? ক'জন কামলা নিড়েন দিচ্ছিল। দেখে বুঝলো এখানকার লোক নয়। অভাবে পড়ে জন খাটতে এসেছে। একজনকে ডেকে বললো, কার চাষ গো?

কাপালি মশায়ের।

অনাথ মুখ তুলে তাকালো। তার বাড়িটাকেও চেনা যাচ্ছে না। কলি ফিরিয়েছে বংশী। বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখল খালের জলে দুর্গা প্রতিমার কাঠামো ভেসে উঠছে জল শুকিয়ে যাওয়ায়। মনে মনে বলল, এখানে আজকাল ভাসান দিচ্ছে লোকে! বাহা রে!

মুরগির ডাকে তার ঘোর কেটে গেল। এবার সত্যি তার চমকে ওঠার কথা। মুরগির ঘরে সাদা একপাল লেগহর্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘর মেরামত করে কাপালি একদম নতুন করে ফেলেছে। বাচ্চাগুলো সবে তিন মাসের হবে। বেশ ডাঁটো। নিজের একটু গর্ব হল অনাথের। আমি তাহলে একসময় বংশীর স্বপ্নের মানুষ ছিলাম!

তখন উমা তাকে ডাকছিল। অনাথবাবু, ও অনাথবাবু, হরিতকিতলায় ছায়ায় এসে দাঁড়াও। রোদ লাগছে খুব।

অনাথ জানতো এখানে উমা আছে। সে চারদিকে তাকালো। বাড়িটা এখন বংশী কাপালির। ভেতর থেকে সব দরজা-জানলা বন্ধ। বড়লোকের গিন্নী ওষ্টরানী এখন ঘর অন্ধকার করে ঘুমোচ্ছে। খোকাটি ছোট। রাতে হয়তো একদম ঘুমোতে দেয় না। ভাদ্রের মাঝামাঝি একবার বংশীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ক্যানিং স্ট্রীটে।

অনাথ গলা মোটা করে মাথাটা এগিয়ে দিয়ে ডাকলো, হাম্বা—আ—আ—

উমা শুনলো, ধন্যবাদ।

অনাথ আর দাঁড়ালো না। বাঁধ মাড়িয়ে সিধে মাঠে গিয়ে পড়ল। এবার আল ধরে ধরে বিশ্বেশ্বরীর বাওড়ের দিকে যাবে। দু'ধারে মাঠভরতি ফলা ধান। গাছ নুয়ে পড়েছে। মাথার ওপরের আকাশ পরিষ্কার। উমাকে খুব রোগা লাগলো যেন আজ। বটতলা এখনো এক ক্রোশ রাস্তা।

॥ সমাপ্ত ॥